১১

Mo-Tung Oil Fields

P. O. Aratoon

Burma

২৫শে-২৭শে অগস্ট

মিনি,

জানি না তুই আমাকে কী ভাবছিস, কি আমার কথা ভাবছিস কিনা। তোর বালিশের তলায় ছোট্ট একটা চিঠি রেখে এসেছিলুম—সত্যি বল্, খুব কি রাগ করেছিলি আমার উপর? কিন্তু এ ছাড়া আর তো উপায় ছিলো না আমার। বলতে পারিস, সবুর করলুম না কেন, সগু-বাপ-মরা মেয়ে কেমন ক'রে এ-কাজ করতে পারে—অনেকেই হয়তো ঘৃণায় শিউরে উঠবে। তুইও কি আমাকে ঘৃণা করছিস, মিনি? কিন্তু কিসের ভরসায় সবুর করি, বল্? আমার মনের কথা কে বুঝতো? আমার মুখের দিকে কে তাকাতো? ভীষণ দুঃখের ঐ বাড়িটার মধ্যে বোবা হ'য়ে ব'সে-ব'সে পাথর ব'নে যেতুম—তা ছাড়া আর কী হ'তো? আমি তো তবু পালিয়ে এসে বাঁচলুম—তুই কেমন ক'রে আছিস?

কোথায় কলকাতা আর কোথায় মো-টুং জঙ্গল! এ আমার পক্ষে এতই অচেনা যে নিজেকেই প্রায় অচেনা লাগছে। তিন দিকে জঙ্গলে ঘেরা এই তেল-খনির বসতি। আর-একদিকে চীন সীমান্তের পাহাড়,

ধ্বক শব্দে মাল-বোঝাই লরি যায়—তোকে বলবো কী, ঐ একটু চেনা শব্দের জন্য কান পেতে থাকি। আর-সব শব্দই অচেনা। পাখির ডাক বিকট, রাত ভ'রে গুম্‌গুম্ গাঁ গোঁ কতরকম আওয়াজই যে হ'তে থাকে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে একটা হয়তো কানে আসে, আর ভয়ে ফুলে ঢোল হ'য়ে যাই। এমন অন্ধকার, রাত্রে আলো নেবাতেই মনে হয় কেউ যেন জ্যান্ত কবর দিয়েছে।

এ-বিয়ে হ'তোই। আর-কেউ না জানুক, তুই তো জানিস্ যে বাবাই এ-বিয়ে ঠিক করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো—থাক্‌গে, সে-কথা ব'লে আর লাভ কী? তিনি তাঁর কথা রাখতে পারলেন না, আমি রাখলুম। এতে দোষ হয়েছে তোরা যদি বলিস মানবো না তোদের কথা। তবু তো তাঁর একটা ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো আমাকে দিয়ে। এইটুকুই আমি জানি। মিনি, আজ বলতে বাধা নেই, বাবাকে এবার বড়ো কষ্ট দিয়েছিলেন মা। তুইও দিয়েছিলি। দাদার কথা আর কী বলবো। কেন এ-রকম করলি তোরা সবাই মিলে, তোদের মা-মহামায়া কী-মন্ত্রই জপালেন তোদের কানে!

মা এখন কেমন আছেন রে? আমি তো তাঁকে বড়ো ভালো দেখে আসিনি। শেষটায় কি তিনি পাগল হ'য়ে বেঁচে থাকবেন! তাঁর চিকিৎসা করানো হচ্ছে তো? দাদা যদি ডাক্তার-টাক্তার না ডাকেন, তুই খবর দিস নীরদ ডাক্তারকে, তিনি যে-রকম বলেন সে-রকম ব্যবস্থা যেন হয়ই। এ-বিষয়ে প্রাণ থাকতে অবহেলা করিসনে তুই, দাদাকে দিয়ে কোনো ভরসা নেই, তোকেই সব করতে হবে। ভালোরকম চিকিৎসা হ'লেই মা সেরে উঠবেন, দেখিস। মহামায়ার দয়ায় দাদার ছেলেটা তো গেলো—মা-র বেলাতেও সে-ভুল করিস না।

আর বাবার কথাই বা কী! তাঁকেও তো মহামায়াই মারলেন। অত রাত্তিরে উঠে বাবা রিভলভর সাফ করছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করা

শক্ত। তোর কি কিছু মনে হয় না? তারপর তোর মনে আছে বাবা একবার বললেন, 'এ করলে কী!' কাকে বললেন? কে করেছিলো ও-কাজ? আমরা যখন গেলুম ঘরে তো মা ছাড়া আর-কেউ ছিলেন না, আর তাঁর হাতে কী ছিলো ওটা—তুইও তো দেখেছিলি! এ-ভয়ানক কথা কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দেয়, কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি. এ ছাড়া আর-কিছু হ'তে পারে না। বাবা কোনো কারণে আত্মহত্যা করেছেন এ একেবারেই অসম্ভব। ঝোঁকের মাথায় এ-রকম কিছু করবার মতো মানুষ তো তিনি ছিলেন না। দাদার ছেলেটা ম'রে যাওয়ার পর একটু মন-মরা হ'য়ে ছিলেন তা ঠিক—কিন্তু অমন ধৈর্য, অমন স্নেহ, অমন ক্ষমা যাঁর মধ্যে, তিনি যে নিজের ইচ্ছায় আমাদের সকলকে ছেড়ে যাবেন তা ভাবা যায় না। সেদিন বিশেষ ক'রে অনেকদিন পর তাঁর মধ্যে সেই পুরোনো ফুর্তির ভাবটা দেখেছিলাম —আমার বিয়ে ঠিক হওয়ায় আমার চেয়ে তাঁরই যেন আনন্দ বেশি। এত কি ভালোবাসতে পারে আর-কেউ, না কি জগতে এমন-কিছু আছে যা এ-ভালোবাসার চেয়ে বড়ো! মা এ কী করলেন! নিজের হাতে এ-কাজ ক'রে তারপর পাগল হ'য়ে না-গিয়ে তাঁর কি উপায় ছিলো! হয়তো ভালোই হয়েছে, নয়তো তিনি কেমন ক'রে সইতেন!

আমার মনের কথাটা তোকে লিখলুম—এ তো আর-কাউকে বলবার নয়! বাইরের লোক সকলেই জানে রিভলভার সাফ করতে গিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিলো। নিরঞ্জনও তা-ই জানে। আসল ব্যাপারটা কী আমি ওকে বলিনি—কোনোদিন বলবো না। আমার এই একটি কথা চিরজীবন স্বামীর অজানা থাকবে—আমার জীবনে এও একটা বোঝা বড়ো কম নয়।

সেই রাত্রি আমি সারাজীবনেও ভুলবো না। ঘুমের মধ্যে যে-শব্দটা —ছিলাম সমস্তই যাচ্ছ পাড়ে রাকের কলকজ্জা আর যেন চলে না

সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীটাই কেন ধ্বংস হ'য়ে গেলো না? মনে হয়েছিলো আমিও ম'রে যাবো—কিন্তু এই তো ত্যাখ, স্বামীর সঙ্গে দিব্যি সুখে আছি। কিন্তু মিনি, মিনি, বাবাই তো চেয়েছিলেন আমাকে সুখী করতে, বাবাই তো চেয়েছিলেন। তিনি যদি না-ম'রে পারতেন, কিছুতেই মরতেন না, শুধু আমাকে সুখী করবার জন্যই যে-কোনো-রকমে বেঁচে থাকতেন।

দাদা পরের দিনই বাহাদুরকে তাড়িয়ে দিলেন কেন রে? বাবার এতদিনের প্রিয় চাকর, বুড়ো হয়েছে, না-হয় বাকিটা জীবনও কাটাতো। আমি যদি পারতুম ওকে নিয়ে আসতুম। এখানে আমাদের এক মগ্ চাকর আছে, তার নাম বংগং। নাক নেই চোখ নেই দাড়ি নেই গোঁফ নেই, অথচ একটি হাসি আছে। কথা বলে, তাতে 'ম' 'ত' আর 'ল'ই বেশি, হিন্দি বলে, বাংলাও বলে কিন্তু সব একরকম শোনায়। সব কাজই করে, মাংস রাঁধতেও ওস্তাদ—কিন্তু রান্নাটা আমি নিজের হাতেই রেখেছি, সব ওর হাতে ছেড়ে দিলে একদম ফতুর হ'য়ে যাবো যে। আর রান্নাও ভারি—কিছু কি পাওয়া যায় এই মড়া-পোড়া দেশে! এখান থেকে রোজ দু'বার আরাটুনে লোক যায়—একবার ডাক আনতে, একবার ডাক দিয়ে আসতে—ডাকটিকিট থেকে আদা-পেঁয়াজ পর্যন্ত যা-যা দরকার সব তাদের ব'লে দিতে হয়। আনে তো কচু—হায়রে, সত্যিকারের একটু কচুও যদি আনতো! আলু, মাংস আর ডিম ছাড়া কিছু চোখেই দেখলুম না এখন পর্যন্ত। ভাতগুলো কী মোটা-মোটা, তোকে একটা ছুঁড়ে মারলে তোর মাথা ফুটো হ'য়ে যাবে। বংগংকে একদিন পাঠিয়েছিলুম সাইকেলে চাপিয়ে আরাটুনে—ব'লে দিয়েছিলুম মাছ আনাই চাই। এক টাকার শুঁটকি মাছ নিয়ে এসে একগাল হেসে বললে—'আচ্ছা! কূব বালো!' ইচ্ছে হয়েছিলো মাছগুলো ওর মাথায় ছুঁড়ে মারি, কিন্তু লাগলে বড্ড চোট পেতো ব'লেই

মারতে পারলুম না। ও তো মাছ নয়, এক-এক টুকরো তক্তা। সামনের রোববার নিরঞ্জনের ছুটি আছে—ভাবছি ওর সাইকেলের পিছনে চেপে আমিই যাবো আরাটুনে, আমি গেলে কিছু খুঁজে পাবোই। ওদের আবার রোববারেও পুরো কাজ হয়, তবে মাসে দুটো ক'রে রোববার পালা-করা ছুটি জোটে। এ-রকম নিশ্ছিদ্র বিচ্ছুটি চাকরিও যে হ'তে পারে তা আমি ভাবতেও পারতুম না এর আগে। দাদার সেই একশো-কুড়ি টাকা কোম্পানি দু'মাসে ওর মাইনে থেকে কেটে নেবে, তারপর ও বলছে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরবাইক কিনবে, তখন পঁয়ষট্টি মাইল দূরে মুংটিতে যাওয়া যাবে ছুটির দিনে। সে নাকি মস্ত শহর, সব পাওয়া যায়, দুটো সিনেমা পর্যন্ত আছে।

দাদারও ভক্তির ভাব দেখে এসেছিলুম, এখন বোধ হয় তা আরো বেড়েছে। বৌদিকে আনাননি নিশ্চয়ই? ঐ ভাবেই কাটবে নাকি বৌদির জীবন? বাবা থাকলে কখনো তা হ'তে দিতেন না। বাবা সকলের জন্যই ভাবতেন—এক মুহূর্তেই কি সব ভাবনার সমাধান হ'লো? কী হয় রে মানুষের ম'রে গেলে? তুই তো জপ-তপ করিস —তুই বলতে পারিস।

বৌদির চিঠিপত্র পাস্? দাদা কি এখনো রোজ মায়া-মন্দিরে যাচ্ছেন? ছাখ, দাদার সঙ্গে মহামায়ার এই মাখামাখিটা আমার ভালো লাগে না। বলতে পারিস আমার পাপী মন, তাই পাপ কথা ছাড়া মনে আসে না। কিন্তু আমি তো ভাবতে পারি না ঐ আস্তানায় এমন-কী আকর্ষণ যাতে দাদা তাঁর নানারকম আমোদপ্রমোদ ছেড়ে দিয়ে ওখানেই প'ড়ে থাকেন। রাগ ক'রে বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েও দাদা তো ঐ মায়া-মন্দিরেই ছিলেন? খুব অদ্ভুত, না? নিরঞ্জন ওর টাকা ক'টার জন্য ওঁর খোঁজ করতে কম করেনি, কোনো পাত্তাই

ঘাপটি মেরে ছিলেন—তা-ই না? তোরা আমাকে কিছুই বলতিস না, কিন্তু সবই বুঝতে পারি। এটা শুধু বুঝি না যে যে-মানুষ নিজের স্ত্রীর দিকে একবার তাকায়নি, মুমূর্ষু ছেলেটার কথা ভাবেনি, অমন স্নেহশীল বাপকেও সইতে পারলে না যে-মানুষ, সে কেমন ক'রে অতগুলো দিন মায়া-মন্দিরে কয়েদি হ'য়ে কাটিয়ে এলো, যদি না ওখানেও তার পছন্দমতো আমোদপ্রমোদের সন্ধান পেয়ে থাকে। তোরা বলবি, দাদা আর সে-মানুষ নেই, মা-মহামায়া রাতারাতি লোহাকে সোনা করেছেন। তা-ই যদি হ'তো, তার চেয়ে সুখের কথা আর-কিছু ছিলো না। কিন্তু দাদার কোনোরকম বদল হয়েছে ব'লে আমার তো মনে হয়নি। ছেলেটা অমন বীভৎসভাবে মরলো—তাতেও কি কোনো ছাপ পড়লো ওর মনে? বৌদির প্রতি ভালোবাসা দূরের কথা—করুণার ভাবও দেখেছিস কখনো? বৌদি বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়ায় আমার তো মনে হ'লো দাদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তারপর বাবার মৃত্যু দাদার পক্ষে অবশ্য কোনো দুর্ঘটনাই নয়। দেখলি না, পরের দিন থেকেই কেমন একটা কর্তাগিরির ভাব ফুটে উঠলো ওঁর চোখে-মুখে। লাখ টাকার মালিক হলেন—আর ভাবনা কী! শুনতে যতই খারাপ হোক, আমি নিশ্চয়ই বলবো দাদা এতে খুশিই হয়েছেন। কিন্তু ওঁর হাতে লাখ টাকাই বা ক'দিন টিঁকবে! বাবার সারা জীবনের অত পরিশ্রমের সঞ্চয় কোন্ কান্ রাস্তায় উধাও হবে ভাবতে শিউরে উঠি। বৌদির সব নিয়েছে, মা-র তো সব নেবেই, বাড়িখানা যে রাখতে পারবে এমন ভরসাও হয় না। তখন মা-র, তোর, কী উপায় হবে? তার উপর মা-র এই অবস্থা! কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে এ-অসুখ সারে! দাদা কি কিছু করছে? আমি তো দেখে এলুম মা-র সেবাতেই তোর দিন কাটছে। আশ্চর্য তোর সেবা করার ক্ষমতা, কিন্তু এ-ভাবে চললে তোর শরীরই বা

টি‌ঁকবে কেন? আমাদের বাড়িতে কারো সর্দি হ'লেও 'বড়ো ডাক্তার এসেছে—পয়সা রোজগার করে অনেকেই, কিন্তু বাবার মতো হৃদয় কার! কী সুখে, কী যত্নে তিনি আমাদের রেখেছেন, বাকি জীবন কাটবে একটু-একটু ক'রে তা-ই বুঝতো। তুই জোর ক'রে মা-র জন্য নার্স রেখে নিবি—দরকার হ'লে ঝগড়া করবি দাদার সঙ্গে—যত টাকা লাগে দিতেই হবে ওকে, সব তো বাবার টাকা, ওর কী! মা-র একটু অসুখ করলে বাবা পাগল হ'য়ে যেতেন, এমন বাড়াবাড়ি করতেন যে আমাদেরই রাগ হ'তো। শুধু মা কেন, আমাদের সকলের কথাই ভেবে ছাখ্। এই শেষ টাটার অসুখে কী এলাহি কাণ্ড করলেন দেখলি তো। তাঁর একটা কুসংস্কার ছিলো যত বেশি টাকা খরচ হবে, রোগ সারবার সম্ভাবনাও তত বেশি। নীরদ ডাক্তার তাঁর বন্ধু, ভিজিট নিতে চাইতেন না, কিন্তু প্রতিদিন পুরো ভিজিট জোর ক'রেই গছিয়ে দিতেন। তোর পায়ে পড়ি, মিনি, মা-র জন্যে যা-কিছু করবার সব তুই করাবি, বাবা থাকলে যেমন হ'তো ঠিক তেমনি যেন হয়। টাকার তো অভাব নেই—ও-টাকা দিয়ে আর কী-ই বা হবে?

বল্ তো মিনি, মহামায়ার মৎলবটা কী? ঘটনাগুলো পর-পর এমন মিলে যাচ্ছে যে কেমন যেন সন্দেহ হয় আমার। মহামায়ার কাছে দাদার আনাগোনা শুরু হ'তে-হ'তেই তো আমাদের এ-সর্বনাশ হ'লো। এটা হয়তো দৈবাৎ মিলেছে—কিন্তু একটা কথা কি তোর মনে আছে? বাবা বলেছিলেন—আমার একটা উইল ছিলো, খুঁজে বের কোরো। সে-উইল কাউকেই তো খুঁজতে দেখলুম না, মা-র ও-রকম হওয়ায় কথাটা আরো চাপা প'ড়ে গেলো। বাবা কি ভুল বলেছিলেন—কিন্তু ভুলই বা বলবেন কেন? তখনো তো একেবারে স্বাভাবিক জ্ঞান ছিলো। না কি আমি ভুল শুনেছিলুম? কী জানি!

ও-কথাটা মা' কি শুনেছিলেন? মা কি বাবার শেষ কথাগুলোর কোনোটাই শুনেছিলেন? যে-মানুষ নিজেই প্রকৃতিস্থ নয়, সে আর কী বলবে? এখন তারই সুযোগ নিয়ে দাদা যা খুশি তা-ই করে বেড়াবে—যদিও নিজের ভাই, তবু বলছি যে এমন কোনো কুকর্ম নেই ওকে দিয়ে যা সম্ভব নয়। উইলটা হয়তো বেমালুম লোপাট ক'রেই দেবে।

কত কথা যে মনে হয় আমার তোকে বলবো কী, মিনি! ভাবতেও গা কাঁটা দিয়ে উঠে। যা-ই বলিস তুই, মহামায়া মানুষটা ভালো নন, ওঁর চোখের তাকানোটা বড়ো ভয়ানক, যেন মানুষের সমস্ত মনের কথা ছিপ ফেলে টেনে তুলছেন। দাদার মতো যারা গোঁয়ার, বুদ্ধি তাদের কমই থাকে, মহামায়া কী প্যাঁচে ফেলে ওকে দিয়ে কী কাণ্ড করাচ্ছেন কে জানে। আমার বড়ো ভয় করে। সব লুটে নিলেও তো দাদা কিছু টের পাবে না। তোরা মানুষটাকে ভক্তি করিস, এ-সব বলা হয়তো আমার উচিত না—কিন্তু এখন কি চক্ষুলজ্জার সময়! এক তুই-ই তো ভরসা। সাবধানে থাকিস—স্থির বুদ্ধি নিয়ে সব লক্ষ্য করিস। নিজের কথাও ভাবিস মাঝে-মাঝে—তোর জীবন কী-ভাবে কাটবে এ-কথা কি কখনোই মনে হয় না তোর?

আমার মনে হয় বাবা বুঝেছিলেন মহামায়া কেমন মানুষ। বাবা যা বুঝতেন, তা-ই ঠিক; তাঁর চেয়ে বেশি আর বুঝতো নাকি কেউ! সবই বুঝতেন, কিন্তু বাইরে অমন হৈ-হৈ ফুর্তি করলেও ভিতরটা ছিলো তাঁর অত্যন্ত চাপা, কিছু বলতেন না। তাছাড়া কারো মনে কষ্টও দিতে চাইতেন না। সকলকে আড়াল ক'রে রেখে নিজে যে মনে-মনে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আমি তো জানি। শেষের দিকে তোরা তো তাঁকে ত্যাগই করেছিলি! সব চুপচাপ, ফিসফাস, তাঁকে কিছু বলবি না, তাঁকে এড়িয়ে চলবি! অথচ তোরাই তাঁর প্রাণ! আমার

পর্যন্ত মনে হ'তো তাঁর বিরুদ্ধে একটা অলক্ষ্য ষড়যন্ত্র বাড়ির মধ্যেই যেন গ'ড়ে উঠছে। কী যে রাগ হ'তো এক-এক সময় মা যখন তাঁর সঙ্গে কথা না-ব'লে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতেন! ইচ্ছে করতো ও-সব ধর্ম-কর্ম ভেঙে চুরমার ক'রে দিই। কিন্তু আমি কী পারি, কতটুকু আমার শক্তি! যদি পারতুম, নিশ্চয়ই বাবাকে বাঁচাতুম।

বাবা যদি চুপ ক'রে অত না-সইতেন তাহ'লেও সর্বনাশটা হ'তো না। ছেলেবেলা থেকে তাঁকে আমরা একটা রাগি বদনাম দিয়ে আসছি, কিন্তু অবাক হ'য়ে গেলুম তাঁর ধৈর্য দেখে। তাঁর ভালো-বাসায় তো এতটুকুও মেকি ছিলো না। এত ভালোবাসতেন যে ভালোবাসার জন তাঁকে যে আঘাত করতো সেটাও তাঁর ভালো লাগতো। কিন্তু ঐ ধৈর্যই কাল হ'লো। তিনি যদি জোর ক'রে মা-কে ছিনিয়ে আনতেন, নির্মম হাতে ভাঙতেন মহামায়ার মোহ, সমস্ত বাড়িটিকে অত্যাচারীর মতো শাসন করতেন, তাহ'লে এ-সব কিছুই হ'তে পারতো না, দাদাও হয়তো পথে আসতো। তাতেই সকলের সুখ হ'তো শেষ পর্যন্ত। মানুষটা তিনি মেজাজি ছিলেন, কিন্তু জবরদস্তি তাঁর ধাতে ছিলো না, এতটুকু নিষ্ঠুরতা তাঁকে দিয়ে হবার নয়। সেইজন্যই সব ডুবলো।

ছ্যাখ, উইলের কথাটা বোধ হয় ঠিকই। বাবা কি কিছু টের পেয়েছিলেন, না কি তাঁর মনে হয়েছিলো যে তাঁর আর বেশিদিন নেই? হয়তো ভয় করেছিলেন তিনি না-থাকলেই লুটপাট শুরু হবে; আর-কিছু না—শুধু এটাই চেয়েছিলেন আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই কষ্ট না পাই। দাদাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই—কে জানে হয়তো মহামায়ার উপরেও তাঁর সন্দেহ ছিলো। তুই একবার ভেবে দেখিস, মিনি, মহামায়া এ-পর্যন্ত মা-র কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন। বৌদির সেই পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মায়া-মন্দিরের মার্বেল পাথর কিনতে

গেছে। বাবা পছন্দ করেননি কোনোদিনই, কিন্তু গ্রাহ্যও করেননি, যে মন-ভোলা দিল-খোলা মানুষ, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন সব; কখনো কল্পনাও করেননি যে ঐ রাস্তা ধ'রেই সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। এই এবারেই তিনি দেখলেন ব্যাপার গুরুতর। হয়তো মনে হয়েছিলো উইল ক'রে রাখি, কে জানে কখন কী হয়। মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমি জানি কিছুদিন ধ'রে তিনি উকিল সর্বানন্দবাবুর বাড়ি ঘন-ঘন যাতায়াত করছিলেন। কী হ'লো তবে উইল? আমি হ'লে সোজা সর্বানন্দবাবুর কাছে গিয়ে সব জেনে নিতুম। তুই কি ও-সব পারবি?

চিঠি ভীষণ লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার কত কথা যে বলবার আছে তোকে, কিছুই বলা হ'লো না। মনে হয় তোর সঙ্গে কথা বলছি, ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। টপসি কেমন আছে রে? ওকে ওরা খেতে-টেতে দ্যায় তো? চিঠি লিখবি আমাকে? তুই আর আমি ছেলে-বেলায় একই ছিলুম, কেউ আমাদের আলাদা ক'রে দেখতো না। তারপর সেদিন তুই আমার দিক থেকে মুখ ফেরালি। প্রথমে অসহ্য লাগতো, কান্না পেতো, ক্রমে সহ্য করতে শিখলুম। মনে ধারণা ছিলো আমিও তোর উপর খুব রাগ করেছি। কিন্তু ভোরের আবছা আলোয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরঞ্জনের পাশে যখন ট্যাক্সিতে বসলুম, হঠাৎ তোকেই মনে পড়লো, মনে পড়লো দু' দিকে-দু' খানা খাট-পাতা যে-ঘরটি এইমাত্র ছেড়ে এলুম। ট্যাক্সি ছুটলো হু-হু ক'রে, আমিও হু-হু কাঁদতে লাগলুম। আগের দিন দুপুরে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো নিরঞ্জনের হোটেলের ঘরে। রেজিস্ট্রারকে বলতে হয়েছিলো আমার বয়স আঠারো। মিথ্যেটা খুবই ছোটো, কিন্তু এ নিয়ে মামলা ক'রে দাদা আমাকে অনেক লাঞ্ছনা দিতে পারেন ইচ্ছে করলেই। তবে

জেনে-শুনেই সব করেছি, এখন আর কোনো বিপদকেই বিপদ মনে করিনে। বেশ তো, দাদা যদি প্রমাণ ক'রে দেন এ-বিয়ে বিয়ে হয়নি, কিছুদিন বাদে আবার বিয়ে করলেই হবে। আর কয়েক মাস পরেই তো আঠারো পুরবে আমার।

বাবাকে জন্মের মতো হারালাম এ-কথা যেই বুঝলুম তক্ষুনি মন স্থির ক'রে ফেললুম। মনের মধ্যে কেবল একটা কথাই শুনতে পেলুম —এখানে আর নয়, পালাও, পালাও! বাবার কথা-মতো নিরঞ্জন সেদিন যাচ্ছিলো চাকরিতে ইস্তফা দিতে, কিন্তু সকালের কাগজে খবরটা দেখেই ছুটে এলো আমার কাছে। আমি বললুম—আর দেরি না, রোববারেই রওনা, আর-একটা টিকিট কেনো। নিরঞ্জন স্তম্ভিত। ও প্রথমটায় ঠিক সাহস পায়নি, আমি দিয়েছি সাহস, মরীয়া হ'য়ে যা-যা করেছি স্বাভাবিক অবস্থায় তা ভাবাও যায় না। মন যে কখনো দুর্বল না হয়েছে এমন না, কিন্তু যখনই ভেবেছি এখন না-হ'লে কখনোই বিয়ে হবে না, তখনই কেটেছে সব সংশয়। একটা শাঁখ বাজলো না, একটা পাত পড়লো না, হাঁকডাক জাঁকজমক কিছু হ'লো না, হ'য়ে গেলো বিয়ে। ব্যর্থ হ'তে দিলুম না আমার জীবন; বাবার এই একটা ইচ্ছা অন্তত পূর্ণ করবার মতো শক্তি যে নিজের মধ্যে পেয়েছিলুম, এ আমার অনেক ভাগ্য।

এখানে এসে যা দেখছি তাতেই অবাক হচ্ছি। মাইলের পর মাইল জুড়ে চলেছে খনি খোঁড়ার কাজ, কত যন্ত্র, কত সরঞ্জাম, আর মানুষই বা কত! ভোরবেলা বাঁশি বাজতেই পিঁপড়ের মতো পিলপিল ক'রে মানুষের জাঙাল বেরিয়ে আসে, তারপর সারাদিন বিচিত্র তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যস্ত শব্দ, সন্ধে হ'তেই সব চুপ, সে-চুপ-হওয়াটাও বড়ো সাংঘাতিক। অন্ধকার নামতেই লোকগুলো সব যে যার কুঠুরিতে দরজা বন্ধ করে। সারি-সারি চলেছে কাঠের বাড়ি, মাইনে অনুসারে বড়ো ছোটো মাঝারি,

রাত আটটা অবধি জানলায়-জানলায় লণ্ঠনের মরচে-পড়া আলো দেখা যায়, তার পরেই নিফাঁক ঘুটঘুট্টি। তখন আকাশের দিকে তাকালে, সত্যি বলছি তোকে, রীতিমতো ভয় করে। তারাগুলো যেন ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে—মারবে না খাবে। জোনাকিগুলোর পর্যন্ত কী তেজ! ঝাঁকে-ঝাঁকে এমন ঠাসবুনোনে জ্বলে যে আমি তো প্রথম চিনতেই পারিনি, ভেবেছিলুম সমুদ্রের তলার কোনো আজগুবি জানোয়ার বুঝি হঠাৎ ডাঙায় উঠে এলো।

এ-ক'দিন অবশ্য শুক্লপক্ষ ছিলো, তা এখানে জ্যোছনাও সুখ দেয় না। আকাশটা যেন পাগল হ'য়ে গিয়ে সমস্ত রাত চ্যাঁচায়। অন্ধকারে তবু নাক-চোখ বুজে থাকা যায়, কিন্তু চাঁদের আলোয় তাকাতে লোভ হ'লেও মনে ভয় থাকে—কী যেন কী দেখে ফেলি। পূর্ণিমার রাত্রে একটা দাঁতে-দাঁত-লাগানো, গায়ের-লোম-খাড়া-করা শব্দ শোনা গেলো—নিরঞ্জন বললে নেকড়েরা নাকি ও-রকমই ডাকে জ্যোছনা রাত্রে। ভারি আহ্লাদি জানোয়ার তো! মাঝে-মাঝে ওরা আমাদের পাড়ায় হাওয়া খেতে আসে না এ কি বিশ্বাস হয়? সেদিন রাত্রে স্পষ্ট দেখলুম দুটো চকচকে চোখ আমার দিকে গনগন ক'রে তাকিয়ে দেঁতো হাসি হেসে মিলিয়ে গেলো। নিরঞ্জন অবশ্যি বললে ও আমার চোখের ভুল, কিন্তু তা-ই যদি হবে তাহ'লে পরের দিন কেন দেখা গেলো যে ক্রীক সায়েবের কুঠিতে বারান্দায় বাঁধা বুল্-টেরিয়রটার শুধু গায়ের ছালটা আর শক্ত শেকলটা প'ড়ে আছে?

এখানে সবই তাজ্জব। মশাগুলো মাকড়শার মতো, [illegible] প্রায় বাচ্চা কুমির, জোঁকগুলো ঠিক সাপ। প্রায়ই কুলিদের জোঁকে ধরে—আর সে কি একটা, একসঙ্গে দশটা-বারোটা ছেঁকে ধরে, এত রক্ত শোষে মানুষটা ধড়াম ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যায়। সাপের কথা আর কী বলবো—এ-অঞ্চলটা নাকি খাশ কোব্‌রার জন্য সারা

পৃথিবীতেই বিখ্যাত। স্বয়ং কিং কোব্রা এখানে বিরাজ করেন, আর তা ছাড়া একরকম ছোটো সাপ আছে, লাফিয়ে উঠে হাঁটুর নিচে কামড়ায়, আর কামড়ালেই হরিবোল। চোখে এখনো দেখিনি, দেখতে চাইও না। একদিন নিরঞ্জনের জুতো ঝাড়া দিতেই এক বিছে বেরুলো—কালো কুচকুচে লিকলিকে চকচকে, যেমন লম্বা তেমনি মোটা, কোন অংশে যে উনি সাপের চেয়ে কম তা তো বুঝলুম না। ওর ফোঁসফোঁসানি শুনেই আমার রক্ত জল। নিরঞ্জন দস্যি কম না, ওটানে হাঁড়ি চাপা দিয়ে চিমটেতে তুলে বোতলে পুরলে, তারপর এখন শুনছি উনি নাকি শিগগিরই কলকাতা রওনা হবেন, মস্ত শৌখিন ল্যাটিন নামের উনি নাকি একটি বিরল-হ'য়ে-আসা নমুনা, বিলেতযাত্রাও হ'তে পারে।

এ ছাড়াও জায়গাটির গুণ অনেক। প্রচণ্ড গরম, আর বৃষ্টি আরম্ভ হ'লে আকাশ থেকে যেন জলের ইঁট পড়ে। জানোয়ারদের স্বাস্থ্য তো নিদারুণ, এদিকে মানুষের জন্য অদৃশ্য যমদূত সর্বদাই নাকি ওৎ পেতে আছে। কলেরা, বসন্ত আর টাইফয়েডের টিকে না-নিয়ে এখানে কেউ ঢুকতে পারে না। সপ্তাহে একদিন কুইনিন খেতে হয় সকলকে, একটা বীজাণু-মারা ওষুধও চাইলেই পাওয়া যায়। এক রকম জ্বর আছে হ'লে তিন দিনের বেশি বাঁচে না, এরই মধ্যে সাতজন কুলি মারা গেছে শুনলুম। ডাক্তারবাবু সেদিন এসে সবিস্তারে বুঝিয়ে গেলেন কী-কী করা উচিত আর কী-কী উচিত না। মনে রাখবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সব গোলমাল হ'য়ে গেছে, আবার এলে ভালো ক'রে বুঝে নিতে হবে।

এই সব কারণে এখানে স্ত্রী নিয়ে কেউই আসতে চায় না। আমাদের ব্লকটায় তেত্রিশ বাসিন্দা, তার মধ্যে স্ত্রীলোক আমি ছাড়া মাত্র আর-একজন, তিনি আবার মান্দ্রাজি। তাঁর সঙ্গেই ভাব জমাবার চেষ্টা

করছি, কিন্তু কিছু হিন্দি কিছু ইংরিজি কিছু অঙ্গভঙ্গি মিশিয়ে আলাপ বেশিক্ষণ চলে না। এই তো ব্যাপার, তার উপর আমার কাজ কিছু নেই। বাড়ি বলতে তো দুটি ঘর, আসবাবপত্র নামমাত্র, বাড়ির বাইরেও কোথাও যাবার নেই, অনেক মাথা খাটিয়েও কাজ আবিষ্কার করতে পারি না। অনেক সময় ঘরের জানলা বন্ধ ক'রে চড়ুইপাখি ধরবার চেষ্টা করি, কি বংগংকে দিয়ে এক বালতি এঁটেল মাটি আনিয়ে এমন সব মূর্তি গড়ি নিজেরই তাক লেগে যায়। পেন্সিলে বংগং-এর অনেকগুলো স্কেচ্‌ও ক'রে ফেলেছি—ওকে আঁকা খুব সোজা, চোখের জায়গায় দুটো ফুটকি, নাকের জায়গায় আরো দুটো, ঠোঁটের জায়গায় আরো চারটে, এ-রকম বসিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু ওর মুখের হাসিটি ফোটানো খুব শক্ত, অনেক চেষ্টাতেও আসছে না।

নিরঞ্জনের কাজটা ভাগাভাগি ক'রে নিতে পারলে দু' জনেরই লাভ হ'তো, ওর আবার সারাদিনই কাজ। একেবারে ছ'টা থেকে ছ'টা—মাঝে দু' ঘণ্টা খাওয়ার ছুটি। আমরা উঠি ভোরের আলো ফুটতেই। নিরঞ্জন দাড়ি কামায় স্নান করে, আমি স্টোভ ধরিয়ে চা করি রুটি সেঁকি ডিম ভাজি (ডিম ভাজা ও খুব ভালোবাসে)। চা খেতে-খেতে গল্প জ'মে উঠতে চায় কিন্তু পারে না, কারণ তার আগেই ওর সময় হ'য়ে যায়। খাকি শর্ট্‌স্‌, শার্ট, পায়ে বুট আর হাঁটু অবধি চামড়ার পট্টি (জোঁকের, আর সেই দারুণ বিষওলা ছোটো সাপগুলোর জন্য), মাথায় শোলার টুপি, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌ (গগ্‌লশ বললেই ভালো হয়—কিন্তু ও ছাড়া চলেও না, রোদ যা চড়া !), হাতে বর্ষাতি (যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে, কাজ তো আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে)—এই বেশে ও তো যায় বেরিয়ে, এখন আমি কী করি ? খান পাঁচেক বই সম্বল, রেঙ্গুনে কেনা, পাছে শেষ হ'য়ে যায় পাতা ওল্টাতেই সাহস হয় না। দশ-দিনের-বাসি কলকাতার খবরের কাগজই একটু একটু ক'রে চাখি। নিরঞ্জনের

একটা ভাঙা ঘ্যাড়ঘেড়ে গ্রামোফোন আর খান দশেক পচা পুরোনো পোকা-পড়া রেকর্ড আছে, তার একটা গান শুনলেই জীবনের মতো গান শোনবার ইচ্ছা চ'লে যায়। যা-ই হোক্, কোনোরকমে দশটা বাজে, তখন নিজে স্নান ক'রে নিয়ে আবার স্টোভ ধরিয়ে রান্না চাপাই। দুপুরবেলা রোদে-পোড়া কালো ভূত হ'য়ে নিরঞ্জন ফেরে—এত ঘামে যে একটা শার্ট না-কেচে দু' বার পরা যায় না। খেয়ে-দেয়ে আধ ঘণ্টাও জিরোতে পারে না, আবার ঐ অসম্ভব পোষাক প'রে বেরিয়ে যায়—তা মাথা-ফাটা রোদ্দুরই বা কী, আর ঢল্-নামা বৃষ্টিই বা কী! আমি আর কী করি—প'ড়ে দিই লম্বা ঘুম, জেগে উঠে স্নানে প্রসাধনে কিছু সময় যায়। ভাগ্যিস আমরা এখনো বিলেতের দেখাদেখি চুল ছেঁটে ফেলিনি, তাহ'লে চুল বাঁধবারও বালাই থাকতো না—করতুম কী? এই সময়ে মাঝে-মাঝে মান্দ্রাজি মহিলাটি আসেন, তাঁর কাছে খোঁপা বাঁধবার নতুন-নতুন কায়দা শিখি! তাঁর পরনের শাড়িগুলোও ভারি নতুনরকমের। ব্যাঙ্গালোরে তাঁর বাপের বাড়ি, সেখানে সব কেনা। তাঁকে বলেছি আমাকে খানকয়েক আনিয়ে দিতে। তুই যদি চাস তোকেও পাঠাতে পারি।

যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে, বাবার একখানা ছবি ছাড়া বাড়ি থেকে আমি কিছুই নিয়ে আসিনি। কী-রকম একটা জেদের মাথায় এটা করলুম, আসলে বোকামি হয়েছে। যদি পারিস আমার শাড়িগুলো পাঠিয়ে দিস—অন্তত যে-ক'টা বাবার দেয়া। আর বাংলা কবিতার বই ক'টা। দু' দিনের জন্য তো আর বেড়াতে আসিনি, এর মধ্যেই যেটুকু পারি গুছিয়ে বসতে হবে। কবে আবার কলকাতা দেখবো কে জানে। কলকাতা ব'লে যে কোনো জায়গা এ-জগতে আছে এখানে ব'সে তা কল্পনা করাই শক্ত। এখানে এলে বোঝা যায় কাকে বলে জীবনসংগ্রাম। প্রকৃতির সঙ্গে অনবরতই লড়াই চলেছে, এখন পর্যন্ত

প্রকৃতিরই জিৎ। বাড়ির চারিদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছিটিয়ে, ঘরের কোণে লাঠিসোটা জড়ো ক'রে কোনোরকমে আছি। সায়েবদের বন্দুক আছে, মাঝে-মাঝে রাত্তিরে ফাঁকা আওয়াজ করে তারা, একদিন নাকি দল বেঁধে শিকারেও বেরোবে। চারদিকে মশারি গুঁজে, বিছানার দু' পাশে দুটো টর্চ নিয়ে, খাটের তলা, বালিশের তলা ইস্তক টেবিলের দেরাজ তল্লাস ক'রে তবে তো রাত্তিতে শোয়া। একটা পোকা ঘরে ঢুকলেই ভয় হয় বুঝি কোনো ভীষণ রোগ উপহার দিতে এলো। এখানে সবই মানুষের শত্রু, এ যেন একেবারেই আর-এক রাজত্ব, এখানে আমরা কেউ নই। বিনা নিমন্ত্রণে ঢুকেছি, আর চারদিকে সব হৈ-হৈ ক'রে মারতে উঠেছে। দিনের বেলায় তবু মানুষের ক্যারদানি কিছু টের পাওয়া যায়, কিন্তু রাতগুলো এমন বিশাল যে বুকের উপর চেপে ধরে, আমি আছি ব'লেই আর মনে হয় না। মানুষের আস্পর্ধার সীমা নেই—এখানে এসেও পৃথিবীর পেট চিরে তেল বার করছে! এই তেলে যাদের গাড়ি চলবে তারা কি স্বপ্নেও কখনো ভাববে মো-টুং জঙ্গলের কথা! কিন্তু মনে হচ্ছে মানুষেরই জিৎ হবে, দেখতে-দেখতে জায়গাটা শহর হ'য়ে উঠবে, ইলেকট্রিসিটি এসে এক হাতে ভয় তাড়াবে আর-এক হাতে সুখ বিলোবে, আর তখন নাকি আমাদের কপালে বাগান-ওলা বাংলো জুটবে, গোরুর দুধ থেকে রেডিও পর্যন্ত কিছুরই অভাব থাকবে না। অত সুখের কথা ভাবতেও পারিনে এখন।

যদিও টিনের দুধ টিনের মাখন খেয়েই আপাতত জীবনধারণ, তবু এখনকার অবস্থাটাও মোটের উপর মন্দ লাগছে না। সব চেয়ে ভালো লাগে সন্ধের একটু আগে নিরঞ্জন যখন ফেরে। স্নানের পর পরিচ্ছন্ন ফিটফাট হ'য়ে ও যখন এসে বসে ওকে দেখায়ও বড়ো সুন্দর। চা ক'রে সেই স্টোভেই রাত্তিরের ভাত চড়িয়ে দিই, অন্য সব জিনিস সকালেরই

রান্না করা থাকে, খাবার আগে একটু গরম ক'রে নিলেই হয়। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ভারি ভালো লাগে। রোদের নানারকম রং-বদল হয়, দূরের পাহাড়গুলো অন্যরকম দেখায়, এমনকি মো-টুং জঙ্গলকেও রঙের কারিগরিতে কয়েক মিনিট গল্পে-গড়া কোনো জায়গা ব'লে ভুল হয়। কাল রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ যেতেই আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম—ঠিক মনে হ'লো জঙ্গলে আগুন লেগেছে। একটু পরে দেখি মস্ত হোঁৎকামুখো কোণ-ভাঙা একটা চাঁদ টলতে-টলতে উঠে এলো। কী বিশ্রী দেখলুম চাঁদটাকে, চড়-খেয়ে-চেপ্টে-যাওয়া চেঁদো ভূতের-মতো, এদিকে লাল কী—যেন মুখ ভ'রে হামের গুটি উঠেছে।

নিজের কথাই সাত কাহন! আমার খবর পেতে কতই যেন ব্যস্ত তুই! তবু গ্যাখ্, এই চিঠি লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে কতদিন পর তোর সঙ্গে মন খুলে কথা বলছি, কতদিন পর তোকে যেন ফিরে পেলুম। তিনটি লম্বা গরম স্যাঁৎসেঁতে দুপুর ভ'রে ব'সে-ব'সে এই চিঠি তোকে লিখলুম—চিঠিটা লম্বা হ'লো, হয়তো কিছু স্যাঁৎসেঁতেও হ'লো, কিন্তু আশা করি এর কোনো অংশই তোর গরম ঠেকবে না। লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে কেঁদেছি, কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়েও পড়েছি, ঘুম থেকে উঠে আবার লিখতে বসেছি। এই চিঠি দিয়ে এ তিনটি দিন যেন ভরা ছিলো, কী ভালো লেগেছে—কী ভালো লাগ্‌ছে লিখতে তা বলতে পারবো না। কিন্তু তাই ব'লে চিরকাল ধ'রে তো আর একই চিঠি লেখা যায় না—কোনোখানে থামতেই হয়। আমার কথাও ফুরিয়ে এলো।

তোর খবর কী বল্ দেখি। এখনো কি জপে-তপে ডুবে আছিস? আমার উপর যত রাগ করতে চাস কর্, কিন্তু একটা কথা তোকে বলি—নিজের জীবনটা নষ্ট করিসনে। দূরে ব'সে-ব'সে এই শুধু আমার ভয় হয় যে মা-র পরিচর্যায় দাদা যে তোর হাত-পা বাঁধলেন

সে-বাঁধন তুই বুঝি আর খুলতে পারবি না। তুই যে-রকম মানুষ, হয়তো আত্ম-ত্যাগের নেশায় নিজেই বুঁদ হ'য়ে যাবি। আমি তো বুঝি না কাকে তোরা বলিস ত্যাগ। ম'রে যাওয়াটাই কি ত্যাগ, বাঁচবার জন্যেও কি অনেক-কিছু ছাড়তে হয় না? ঐ বাড়িটার মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে কতকাল তুই কাটাতে পারবি? ম'রে যাবি যে। নিজেকে মারবারও একটা নেশা আছে, পায়ে পড়ি তোর, সে-নেশার ফাঁদে পা দিসনে। দুঃখকেই পুজো করতে শুরু করিস যদি, তাহ'লে মা-র অসুখ সারাবার কোনো তাগিদ তোর ভিতরেও আর থাকবে না, মা-কে শেষ করবি, নিজেও শেষ হবি। আমি যা বললুম সেইরকম যদি করিস তাহ'লে মা নিশ্চয়ই ভালো হ'য়ে যাবেন—আর মা ভালো হ'লে তোর লাভই সব চেয়ে বেশি।

মা কিছু বলেন নাকি রে আমার কথা? জানি না আমার বিয়ের কথা বাবা মা-কে জানাবার সময় পেয়েছিলেন কিনা। সারাটা দিন বাবা এ-ঘর ও-ঘর করছিলেন সেদিন—কখন মা আসবেন—আমি বুঝতে পারছিলুম এ-কথাটা বলবার জন্যেই ছটফট করছিলেন। মা সারা দিনেও ফিরলেন না। তারপর···থাক, তার পরের কথা আর কেন?

মা হয়তো এখন কিছুই বুঝবেন না, তবু এ-কথাটা তুই তাঁকে বলিস যে আমার বিয়ে বাবাই দিয়ে গেছেন। আর-একটা কথা তোকে চুপে-চুপে বলি—তুই কি ব্যথা পেয়েছিস মনে? কিন্তু তুইও তো অনেক ব্যথা দিয়েছিস আমাকে—এ তো কারোই দোষ নয়। আমি মনে রাখিনি, তুই পারবিনে ভুলতে? তোকে কি কখনো ব্যথা দিতুম আমি, যদি না-দিয়ে পারতুম? কিন্তু উপায় ছিলো না।

মিনি, কেমন আছিস তুই?

বুলি

১২

যে-পূর্ণিমার রাত্রে বুলি নেকড়ের চকচকে চোখ দেখেছিলো—বুলি জানতো না, কিন্তু সেটি ঝুলন-পূর্ণিমা।

মায়া-মন্দিরে ঝুলন-পূর্ণিমার উৎসব এইমাত্র শেষ হ'লো। রাত্তির প্রায় বারোটা। আজ অসম্ভব ভিড় হয়েছিলো, সমস্ত লোক চ'লে যেতে-যেতে আরো আধ ঘণ্টা কাটলো। যাদবপুরের নির্জন রাস্তায় মোটরের একটি স্রোত ব'য়ে চললো। ও-রাস্তায় অতক্ষণ বাস্ চলে না, কিন্তু আজ দুটি বাস্ দশটা থেকেই মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে, যেমন থাকে থিয়েটরের দরজায়। দলে-দলে লোক মা-র কথা বলাবলি করতে-করতে বেরিয়ে এসে কেউ বাস্ ধরলো, কেউ ছুটলো রেল-ইষ্টিশানের দিকে, কাছাকাছি যারা থাকে তারা অনেকে হেঁটেই রওনা দিলে ফুটফুটে জ্যোছনায়।

তারপর লীলা-মঞ্চের সব আলো একে-একে যখন নিবলো, কোলাহল গেলো ডুবে, সমস্ত জায়গাটিতে পূর্ণিমার অতল প্রশান্তি ছাড়া কিছু আর রইলো না, তখন সেতুবন্ধের দোতলায় ছোটো ঘরটিতে আলো জ্ব'লে উঠলো। অরুণ হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে বললে, 'ইস্, আলোটা আবার কেন?'

মহামায়া তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুই তাহ'লে চ'লে যাসনি?'

'না। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছো।'

'থাকলি কেন ব'সে?'

জবাব না-দিয়ে অরুণ মহামায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। আজ একেবারেই ছবির রাধা সেজেছেন। টকটকে লাল সাটিনের ঘাঘরা পরনে, গায়ে হলদে রঙের খাটো আঁটো রেশমি জামা, অঙ্গ-ভঙ্গির সঙ্গে-সঙ্গে নাভিটি কখনো ভেসে ওঠে কখনো ডুবে যায়। হলদের তলায় দেখা যায় কাঁচুলির গোলাপি আভা, সুরক্ষিত সুসম্পূর্ণ যৌবনের মদির উচ্ছলতা। এতই সুন্দর, সমস্ত দেহটি এমনি লাবণ্যের ঢেউ-তোলা যে মনে হ'তে পারতো বিশ্বের প্রেয়সী কোনো নর্তকী।

অরুণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে মহামায়া তক্তাপোষে বসলেন। অরুণের ব্যবহৃত টেবিল, চেয়ার, তক্তাপোষ তেমনি আছে। অরুণ চেয়ারে ব'সে, তার চেহারাটাও লক্ষ্য করবার মতো। জাঁকিয়ে বাপের জন্য শোক করছে। দাড়ি-গোঁফে ওর ঠোঁটের আর থুতনির দুর্বল ডোল ঢাকা প'ড়ে মেকি পৌরুষ দেখা দিয়েছে। কোরা মোটা শাদা ধুতি পরনে, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, খালি পা, পাশে একটি কুশাসন পর্যন্ত আছে। হবিষ্যান্ন করে, ঘি আর আতপ চাল আসে মায়া-মন্দির থেকে, ফলে এই দশদিনেই অরুণ যেন আরো একটু মোটা হয়েছে।

মহামায়ার চোখে একবার চোখ পড়তে অরুণ বললে, 'তুমি ওগুলোই প'রে থাকবে নাকি?'

'তোর চোখে না সয় তোকে দেখতে হবে না,' মহামায়া উঠে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। জ্যোছনায়, জ্যোছনার মধুর আভায় ঘর ভ'রে গেলো। লাল ঘাঘরাটা বেগ্‌নি হ'য়ে উঠলো, নাচের রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ আলো বদ্‌লালে যেমন হয়।

একটু পরে মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঠিক করলি?'

'তুমি কী বলো? সারবে?'

মহামায়া চিন্তিত স্বরে বললেন, 'অনেকবার জিগেস করেছি তাঁকে, তিনি তো কিছু বলেন না।'

অরুণ জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি তুমি কৃষ্ণকে দেখতে পাও?'

'পাই না! চোখ বুজলেই দেখি। কখনো-কখনো তিনি আবার অভিমান করেন, হয়তো পুরো একটা দিন তাঁকে না-দেখে কাটে। তখন বড়ো কষ্ট হয়।'

'তাহ'লে তোমার মনে হয় এ আর ভালো হবার নয়?'

মহামায়া মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইলেন।

'কত পাপ ওর জমা ছিলো, তাই এই শাস্তি। ওর কথা ভাবতে বুক ফেটে যায়। এখন কেমন আছে রে?'

'দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে! কাল থেকে তো ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে হচ্ছে।'

'কী বলে? কী করে?'

'তুমি যেদিন গিয়েছিলে নিজের চোখেই তো দেখলে।'

'আমাকে চিনতেও পারলে না! মানুষের কপালে এও থাকে! আহ্!' মহামায়া ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তুমি চ'লে যাওয়ার পর কী বলছিলেন জানো? আমার কাছে এসে খুব চুপি-চুপি বললেন, "শোন খোকা, তোর বাবা আবার বিয়ে করেছেন বুঝি? তোর নতুন-মা দেখতে কিন্তু বেশ," ব'লে মুচকি হাসলেন।'

অরুণ একটু হেসে উঠলো।

'আসল কথাটা কী জানিস? ওর আত্মাই এখনো পবিত্র হয়নি, ভিতরে চাপা ছিলো বাসনা কামনা। নয়তো ওর মতো ভক্তিমতীর এমন দুর্দশা হবে কেন? জানিস তো, সত্যিই যে ভক্ত তার কোনোদিন সামান্য অসুখও করে না?'

'কোনোদিন না? ধরো, তার শরীরে যদি আগে থেকেই কোনো রোগের বীজাণু থাকে?'

'তাও সেরে যায়। আমার তো কবেই যক্ষ্মায় ম'রে যাওয়ার কথা ছিলো। ডাক্তারের হাতে থাকলে হয়তো হ'তোও তা-ই।'

'সব অসুখ সারে?' অরুণ 'সব' কথাটায় বিশেষ একটু জোর দিলে।

'রোগ একটাই—এক-এক অবস্থায় এক-এক রকম চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। তাঁকে ভুলে' থাকি, তাঁকে হারিয়ে ফেলি, মানুষের এই একটাই তো ব্যাধি। এ-কথা যারা বোঝে না তারাই বলে এটা জ্বর ওটা যক্ষ্মা সেটা ক্যানসার। তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারিস যদি, মূল ব্যাধিই সারে, ছোটো-ছোটোগুলোর জন্যে তাই আর ভাবতে হয় না।'

মহামায়ার এ-কথা শুনে অরুণ মনে-মনে ভারি আরাম পেলো।

'কিন্তু সবার আগে চাই নিজের আত্মাকে পবিত্র করা। তোর মা-র সেখানে একটু খুঁত ছিলো, তাই এমন যে অপূর্ব ভক্তি, তাও ওকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলে না। ধর্ না—খুব দামি মদ কেউ কি মাটির ভাঁড়ে ক'রে খায়? তার জন্যে চাই স্ফটিকপাত্র। তেমনি, তাঁকে যে তুই পাবি আধারটা তাঁর যোগ্য হবে তবে তো। সে আধার কী? তুই নিজে। নিজেকে নিখুঁত আধার ক'রে তোল, একদিন দেখবি আপনা থেকেই তাঁর প্রেম তোর মধ্যে ঝরছে। তিনি নিজে এসেই ভ'রে তুলবেন তোকে। এ-ই তো সাধনা। বুঝেছিস কথাটা?'

অরুণ হয়-তো ঠিক বুঝলো না, কিন্তু কথাটা, বিশেষ উপমাটা, তার পছন্দ হ'লো।

একটু কাটলো চুপচাপ, তারপর মহামায়া আবার বললেন, 'তাছাড়া এত বড়ো একটা আঘাত তো পেয়েছে। বাস্তবিক, কী-একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো তোদের বাড়িতে! তবু ভাগ্যিস পুলিশের হাঙ্গামা-টাঙ্গামা কিছু হয়নি।'

'বাবা নিজ মুখেই ব'লে গিয়েছিলেন যে রিভলভর সাফ করতে গিয়ে তাঁর বুকে গুলি লেগে গিয়েছিলো। কেউ কোনো সন্দেহও করেনি—কেনই বা করবে? যা-ই বলো, মরতে-মরতেও বাবা বেশ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গেছেন।'

অরুণের দাড়িগোঁফ-ঢাকা মুখে বাঁকা একটা হাসি ফুটে উঠলো।

মহামায়া ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে' বললেন, 'মহাপ্রাণ পুরুষ ছিলেন তিনি—তোদের কোনো বিপদে ফেলে তিনি কি আর যেতে পারেন! উইলের ব্যাপারটা যে ও-রকম হ'লো তাও জানবি তাঁরই ইচ্ছায়! তোর বাবাকে আমি বেশি দেখিনি, কিন্তু অল্প দেখেই বুঝেছি তাঁর মধ্যে দেবত্বের অংশ ছিলো। সাধারণ সাংসারিক জীব ছিলেন না তিনি। হৈমন্তী তাঁকে ভুল বুঝেছিলো। ও তাঁকে বলতো কামাতুর, বলতো অসুর—কিন্তু জীবনকে প্রবলভাবে যারা ভালোবাসতে পারে ঈশ্বরের তাঁরাই তো প্রিয়। এত বড়ো একটা জীবনকে অযাচিত-ভাবে পেয়েও যারা হেলায় হারায়, ঈশ্বরের অপার মহিমার তারা কী বুঝবে! দুর্বল দেহ-মন তাঁকে কী ক'রে ধারণ করবে—তার জন্য চাই তেজ, চাই বীর্য, চাই উদার প্রাণ। যাই বলিস, ভক্তির পথ আধ-মরাদের জন্য নয়।'

অরুণ মুগ্ধ হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'সত্যি, কী চমৎকার কথা বলো তুমি!'

'তাছাড়া তোর বাবার মধ্যে দেবত্বের বীজ যদি না-ই থাকবে তাহ'লে তোর মতো দস্যু আজ এখানে কেন? তাঁর বীজেই তো তোর জন্ম, তোর দেহে-মনে তিনিই আজ এখানে উপস্থিত।'

অরুণ বললে, 'এটা কিন্তু ঠিক বললে না। আমি এখানে এসেছি তোমারি টানে, শুধু তোমারি জন্যে—আর-কোনো কারণ নেই।'

'কোনটার কী কারণ তুই সব কথাই জানিস কিনা! মস্ত পণ্ডিত হয়েছিস!'

অরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মা-কে নিয়ে মহা ফ্যাশাদ হ'লো দেখছি। হয়তো সারবেনও না, আর এ-রকম হ'য়ে কত কাল বেঁচে থাকবেন কে জানে!'

'যতদিন ওর অন্তরের পাপ সম্পূর্ণ ঝ'রে না পড়ে ততদিন এ সইতেই হবে। আচ্ছা দ্যাখ, একটা কথা জিগেস করি। সত্যি কি তোর মা-ই...'

'আহা, তুমি তো সবই জানো, কেন আর ছলনা করো?'

অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে মহামায়া বললেন, 'আমি? আমি কিছুই জানি না। আমি এখনো দেখছি, শিখছি। নিজের অন্তরে ওর যে-অপবিত্রতা ছিলো এইবার হবে তার শোধন। কিন্তু কী ভীষণ উপায়!'

'কার কথা বলছো?'

'তোর মা-র কথা বলছি। তুই কি ভাবিস এ-জন্মে আমি ওকে দোষ দিচ্ছি? না রে, না। যার প্রবৃত্তি যাকে যেদিকে চালায় সে সেদিকেই যাবে, তাকে ঠেকাবে কে? প্রবৃত্তির সাপকে পোষ মানাতে পারে কি কেউ? তাকে জীর্ণ করতে হয়, ক্লান্ত করতে হয়। তার পরেই মুক্তি। ভাবিসনে, তোর মা-রও মুক্তি হবে।'

'কবে?'

'সে-কথা কেমন ক'রে বলি?'

অরুণ আব্দারের সুরে বললে, 'না, না, তুমি একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। এ-ভাবে মা যদি বেশিদিন বেঁচে থাকেন সেটা কারো পক্ষেই সুখের হবে না। তিনি বাবার সঙ্গে পুনর্মিলিত হ'লেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

মহামায়া শান্ত স্বরে বললেন, 'ছি, ও-কথা মনে আনতে নেই।'

অরুণ ছেলেমানুষি সুরে ব'লে উঠলো, 'বলো না তোমার কৃষ্ণকে কিছু-একটা করতে—তিনি তো সবই পারেন।'

'সব পারেন ব'লেই তো তিনি কিছুই করেন না। সব ছাখেন আর মুচকি হাসেন।'

'নাঃ, তুমি আমাকে কেবল ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি কি জানি না যে তুমি সব জানো, সব পারো! বাবার যে এ-রকম হবে তা তো তুমি আগেই জানতে—জানতে না?'

'জানতুম বলতে পারি না, তবে কী-রকম মনে হয়েছিলো বলেছি তো তোকে। তোর ছেলেকে দেখতে যেদিন গেলুম, তোর বাবার সঙ্গে দেখা হ'তেই চমকে উঠলুম। স্পষ্ট দেখলুম তাঁর মুখের উপর অমঙ্গলের ছায়া। কাকে আর কী বলবো—তোকে শুধু বললুম বাবার উপর একটু নজর রাখতে।'

অরুণ বললে, 'তুমি ও-কথা বললে, তারপর আমারও মনে হ'তে লাগলো বাবার মুখ যেন কেমন অস্বাভাবিক দেখছি। আড়াল থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতুম। সেই রাত্তিরে—'

অরুণ হঠাৎ থেমে গেলো।

মহামায়া স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'বল্।'

'সেই রাত্তিরে আমি আমার ঘর থেকে দেখলুম তিনি শোবার আগে কী-একটা কাগজ বালিশের তলায় রাখলেন। তক্ষুনি আমার মনের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠলো। কী কাগজ ওটা? আর বালিশের তলায় রাখবারই বা কারণ কী? হয়তো ঐ কাগজটাই অমঙ্গলের সূত্রপাত। ছটফট করতে লাগলুম। তারপর তুমি তো জানো।'

'সত্যি, কী সর্বনাশই হ'লো তোদের। তবু এর মধ্যে এটুকুই ভালো হয়েছে বলবো। তাঁর আত্মার শান্তি হবে অন্তত। কী মনে ক'রে ও-রকম করেছিলেন, এক-এক সময় কত অসম্ভব কথাই তো মানুষের মনে হয়। বেঁচে থাকলে নিজেই দু'দিন পরে ঐ কাগজ আগুনে দিতেন। পুত্রকে বঞ্চিত করা কি সোজা কথা রে! ছেলে

আমার নাম রাখবে, আমার জীবনের সমস্ত পরিশ্রমের ফল ওকে দিয়ে যাবো, ইহজীবনে যা-কিছু আমার ছিলো, তার ভিতর দিয়ে মরণের পরেও সব ভোগ করবো—এই জন্যেই তো মানুষ পুত্রকামনা করে। নয়তো ছেলেও সন্তান, মেয়েও সন্তান—তফাৎ কী, বল্? তফাৎ শুধু এই যে মেয়েকে উত্তরাধিকারী ক'রে গেলে সব পরের হাতে চ'লে যায়, নিজের নামটুকু পর্যন্ত মুছে যায় দু' দিন পরে। জীবের ধর্মই এই যে নিজের আত্মাকে সব চেয়ে ভালোবাসে, মানুষ তাই এটাই সব চেয়ে বেশি ক'রে চায় যে সে যখন থাকবে না তখনো তার নামটুকু থাকবে। তাই ছেলে না-থাকলে লোকেরা ভাইকে, ভাইয়ের ছেলেকেও বিষয় দিয়ে যায়, কি পোষ্যপুত্র নেয়, তবুও মেয়েকে দেয় না। ছেলেও যা মেয়েও তা-ই, এ-কথা যারা বলে খোঁজ নিয়ে দেখবি তাদের কিছুই নেই। অপুত্রক হবার দুঃখ বুঝতে হ'লে ধনী হ'তে হয়। পূর্ব-পুরুষের পুণ্য-ফলে এ-জন্মে যা পেয়েছি তা কি আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই পরের হাতে চ'লে যাবে! আমি তোকে বলছি, এ সইতে পারে না কেউ। কাটে না ইহকালের মায়ার বন্ধন, যতই না সুকৃতির জোর থাকুক, আবার জন্মাতে হয়, সইতে হয় জীবের দুঃখ। তাই আমাদের শাস্ত্রে ব'লেই দিয়েছে অপুত্রকের মুক্তি নেই, তাই পুত্রের জন্য তপস্যা। পুরাণে দেখবি কত সব বড়ো-বড়ো মুনিঋষিদের সারা জীবনের সাধনা সফল হয়নি, যতদিন না তাঁরা পুত্রের পিতা হয়েছেন। ছেলেও তো চাইলেই পাওয়া যায় না! সকলেরই কি ছেলে হয়, না হ'য়ে বেঁচে থাকে! ছেলে পেতে হ'লেও পুণ্য লাগে। সেই ছেলে, সর্বস্বই যার, তার স্বত্ব কেড়ে নিতে কেউ পারে নাকি কখনো! ওতে অধর্ম হয়। ভালোই করেছিস তুই—তাঁর আত্মার এতেই তৃপ্তি হবে। মহৎ হৃদয় ছিলো তোর বাবার, তাঁর ইচ্ছাই তুই পূর্ণ করলি। কাগজটা কোথায় রেখেছিস?'

অরুণ বললে, 'পুড়িয়ে ফেলেছি। আর-কেউ দ্যাখেনি।'

'আর কেউ জানেও না?'

'কাণ্ডটা হ'য়ে যাবার পরে বাবা বোধ হয় বলেছিলেন মা-কে। ত
মা তো—'

মহামায়া ব্যথিতস্বরে বললেন, 'সত্যি কি হৈমন্তী পাগল হ'
গেলো?'

'—তা ছাড়া আর কী বলবে? তাঁর ধারণা বাবাকে ষড়যন্ত্র ক'রে আমিই মেরেছি—বাড়িতে যে যায় তাকেই বলেন ও-কথা।'

অরুণ শব্দ ক'রে একটু হেসে উঠলো।

'আ—হা!' অনুকম্পায় মহামায়ার গলা ভিজে এলো।

'আবার কখনো-কখনো তাঁর ধারণা হয় বাবা মারাই যাননি, তাঁর উপর রাগ ক'রে আবার বিয়ে করেছেন।'

অরুণ আরো একটু জোরে হেসে উঠলো। একটু পরে বললে, 'জানো তো, মা বিধবা হননি। শাদা কাপড় কিছুতেই পরবেন না, আর তাঁকে নিরিমিষ খাওয়ায় কার সাধ্য! সারা দিন রঙবেরঙের জমকালো শাড়ি প'রে থাকেন, আর মাছ-মাংস ছাড়া ভাত মুখেই তোলেন না।'

মহামায়া একটু ভেবে বললেন, 'তাতে আর দোষ কী! বৈধব্যটা মনের বিকার ছাড়া তো কিছু না। জগতের যত নারী, কৃষ্ণই সকলের স্বামী, আর তাঁকে তো কখনো হারাতে হয় না। তা ডাক্তার টাক্তার দেখিয়েছিলি নাকি?'

'নীরদ ডাক্তার দু'দিন এসেছিলেন—নিজে থেকেই এসেছিলেন। লম্বা-চওড়া বুলি ঝাড়লেন অনেক। রাঁচিতে কে নাকি সায়েব ডাক্তার আছে, মনের অসুখ সারায়। যত সব বাজে কথা! ডাক্তার আবার পারে নাকি পাগল সারাতে! সারবার হ'লে আপনিই সারে। এদিকে মা সারাক্ষণ আবোল-তাবোল বকছেন, একে ধমকাচ্ছেন ওকে শাসাচ্ছেন, বাবাকে লম্বা-লম্বা চিঠি লিখছেন এও তো আর সওয়া যায়

না। বাড়িতে কেউ এলে তাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেন যে সে হয় পাগল হ'য়ে যাবার জোগাড়। আমি তাই মিনিকে বলেছি মা-কে ঘর বন্ধ ক'রে রাখতে।'

'মিনি তার মা-র খুব যত্ন করে, না রে? লক্ষ্মী মেয়ে!'

'হ্যাঁ, মিনিই সব করে। আর-কেউ তো কাছেও যায় না। মা-র পেয়ারের ঝি ছিলো মোতির মা, তাকে একদিন একটা কাচের গ্লাশই ছুঁড়ে মেরেছিলেন।'

'এত দাসদাসীর তোদের দরকারই বা কী এখন?'

'সে তো ঠিকই। বাবা চ'লে গেলেন—আমাদের আর রইলো কী? ঐটুকু নেড়ে-চেড়েই তো কাটাতে হবে। খরচ না-কমালে চলবে কেন? বাহাদুরকে জবাব দিয়েছি পরের দিনই, মোতির মা জোয়াত আলিকেও ছাড়িয়ে দেবো। খামকা প'ড়ে প'ড়ে খাচ্ছে।'

'এতদিন আছে—তুলে দিতেও মায়া হয়। কিন্তু না-দিয়েই বা উপায় কী?'

'আমাদের এখন এক ঠাকুর চাকরেই চলা উচিত। যা-ই বলো, মা-র দেখাশোনা মিনি ছাড়া কাউকে দিয়ে হবার নয়। মিনিও চায় না আর কারো হাতে দিতে। পারেও আশ্চর্য সেবা করতে। বড়ো ভালো মেয়ে।'

'সেদিন এসেছিলো—ওর মুখে কী-রকম একটা জ্যোতি দেখলুম কী বলবো। ধন্য মেয়ে—এই বয়েসেই তপস্বিনী হ'লো। আর আসে না কেন রে?'

'সময় কোথায় ওর? মা-র সঙ্গে-সঙ্গেই আছে সব সময়। তাছাড়াও কত কাজ যে করে কী বলবো তোমাকে। ওকে দেখে-দেখে অবাক লাগে। চুল ছেঁটে ফেলেছে, পরনে সরু পাড় ধুতি, সারাদিনের পর সন্ধেবেলায় একবার মাত্র খায়, রাত্রে ঘুমোয় মেঝেতে

মাদুর পেতে। মুখে কথা নেই, ছায়ার মতো মিলিয়ে আছে। বুলি চ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এ-সব অদ্ভুত পরিবর্তন দেখছি ওর। ধন্য শিক্ষা তোমার—নয়তো এমন ধৈর্য, এমন সংযম, এমন পবিত্রতা ওর মধ্যে কোত্থেকে এল? সত্যিই সন্ন্যাসিনী হ'য়ে গেল—এ কি সোজা কথা? আর ওরই বোন হ'য়ে বুলি কী কাণ্ডটাই করলে!'

একটু চুপ ক'রে থেকে মহামায়া বললেন, 'ও কোনো চিঠি লিখেছে?'

'না, লেখেনি। চাইও না ওর চিঠি পেতে।...তবে লজ্জা ব'লে কোনো জিনিস তো ওর নেই, হয়তে ঢং ক'রে লম্বা-চওড়া কাঁদুনে চিঠিও লিখবে।

'কার সঙ্গে না গেছে?'

'নিরঞ্জন বোস ব'লে বাজে এক ছোকরা—আমার সঙ্গে কলেজে পড়তো। ঐটুকু মেয়ে, দেখতে-শুনতে দিব্যি ভালোমানুষ—তার পেটে কত শয়তানি বুদ্ধি! পালিয়ে গিয়ে বিয়ে! নভেল হচ্ছে! এ-সব মেয়েকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাবকালে ঠিক হয়।'

মহামায়া বললেন, 'ছি, ও-রকম বলতে নেই। তোরই বোন তো।'

'আবার তেজ আছে! বাড়ি থেকে কিছু নেয়নি, এক কাপড় প'রে বেরিয়ে গেছে। যাক্‌গে, চুলোয় যাক্‌, খেতে না-পেয়ে মরুক্‌, ওর সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।'

'তুই এ-কথা বললেও জগতের লোক তো মানবে না। কী আর করবি—সহ্য কর্‌।'

অরুণ ফুঁসে উঠে বললে, 'ওহ্‌! কী কলঙ্ক! আমাদের পরিবারের মান-মর্যাদা সব গেলো। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না! এই বাবা গেলেন—এত বড়ো একটা শোক—বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড—আর ও কিনা এরই মধ্যে চম্পট দিলে! শ্রাদ্ধটা হ'য়ে যাওয়া পর্যন্তও সবুর সইলো না! অথচ বাবা আমাদের মধ্যে ওকেই সব চেয়ে ভালো-

৮

লীলামঞ্চে যখন ঝাড়ে-ঝাড়ে ইলেকট্রিকের আলো জ্ব'লে উঠেছে, বেদীতে গুচ্ছ-গুচ্ছ ধূপকাঠির সুগন্ধি ধোঁয়া মা-র আধো-চোখ-বোজা, ঈষৎ-হাসি-ফোটা মুখের সামনে দিয়ে পেঁচিয়ে উঠে চিকচিকে কালো চুলে যাচ্ছে মিলিয়ে, আর একটি তরুণী তাঁর পায়ের কাছে ব'সে হার্মোনিয়ম সহযোগে গান ধরেছে, 'মেরি ব্রজকিশোর নন্দদুলাল—', এমন সময় নিরঞ্জন সাত নম্বর অশোক রোডের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাতদিন এ-বাড়িতে সে আসেনি, আর আসবে না এ-রকম একটা সংকল্প করতে-করতেও থেমে গিয়েছিলো। দু' দিন পরে যাচ্ছে কোন দূর বিদেশে, কবে আবার কলকাতায় আসে কে জানে, নেহাৎ অর্থহীন এ-রকম সংকল্প, ছেলেমানুষি। দু'বছর লাহোরে কাটিয়ে এলো, আর এ ক'দিন ও-বাড়িতে না-গেলে তার চলবে না এমন নয়। মিনি? মিনিকে সে ভুলবে। রেঙ্গুনের জাহাজে একবার উঠতে পারলেই হয়। জাহাজ যেই সমুদ্রে পড়বে, শুধু যে কলকাতা পিছনে প'ড়ে থাকবে তা নয়, ক্ষীণ-নীল তটরেখার মতোই মিলিয়ে যাবে তার সমস্ত পুরোনো জীবন। ঢিল হবে গ্রন্থি, খ'সে যাবে। এ-কথা ভাবতে কেমন-একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'লো তার মনে, যাওয়ার দিনটির উৎসুক অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিনির প্রত্যাখ্যানে নিরঞ্জন এলিয়ে পড়েনি, বরং এই ধাক্কায় তার মনের গূঢ় একটা শক্তির উৎসই যেন খুলে গিয়েছিলো। ছেলেবেলা থেকেই তার মা নেই, ছেলেবেলা থেকেই তাই সে আত্ম-নির্ভর।

হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছে, বি. এ. পাশ ক'রেই মরীয়া হ'য়ে চাকরি খুঁজেছে, যা পেয়েছে, তাই নিয়ে চ'লে গেছে দূরে—যেখানে রুটি জুটবে, সেখানেই যাবো, এর উপর আর কথা কী! আত্মীয়স্বজনের স্নেহের বেড়ি তাকে পঙ্গু করেনি। বাপ থাকেন বিমাতা নিয়ে দেশের বাড়িতে—ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে, এক দিদি আছেন ঢাকায়, তিনিই যা-একটু খোঁজখবর নেন মাঝে-মাঝে, পুজোয় কাপড় পাঠাতেও ভোলেন না। হাতে তো অনেক সময় আছে, কোনো কাজও নেই, নিরঞ্জন ভাবছিলো এ-ফাঁকে দিদির সঙ্গে, বাবার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে এলে মন্দ হয় না—সিনেমা আর কত দেখা যায়।

যক্ষুনি মনে হওয়া, তক্ষুনি চ'লে যাওয়ার কোনো বাধা ছিলো না, তবু মিছিমিছিই আরো কয়েকটা দিন কেটে গেলো। বালিগঞ্জের ওই বাড়িটা যেন সময়ে-অসময়ে তাকে টানে। কী যে আকর্ষণ এখনো ওখানে র'য়ে গেছে তা নিজেই ভালো বুঝতে পারে না।

তাছাড়া সেই টাকাটাও ফেরৎ পাওয়া দরকার। ভেবেছিলো অরুণ নিজে এসেই দিয়ে যাবে, ক্রমেই সে-আশা কমছে। পুরোনো বন্ধু-মহলের দু' চারজনকে খুঁজে বার করলো, আশা ছিলো অরুণের দেখা সে-সব আড্ডাতেই পাবে, হতাশ হ'তে হ'লো। অরুণের খোঁজ করতেই তারা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, টাকা ধার দাওনি তো?' তারপর যা-সব বললে তা শুনে অরুণের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো।

একশো-কুড়ি টাকা তার পক্ষে সামান্য নয়। তার মধ্যে একশোই কোম্পানির—নিজের পকেট থেকে নগদ দিতে হবে। টাকাটা উদ্ধার করবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। হয়তো ওরা সব কথা ঠিক বলেনি—অন্যদের ঠকালেও তাকে হয়তো অরুণ ঠকাবে না, হয়তো সত্যি এমন-কিছু ঘটেছে যার জন্য কথা রাখতে পারেনি, সুবিধে হ'লেই আসবে—এই রকম সব আশা নিয়ে—দুরাশা জেনেও—সে মনে-মনে

খেলা করতে লাগলো। আরো দু'দিন গেলো। অরুণের দেখা নেই।

আর ব'সে থাকা যায় না, ওর বাড়ি গিয়েই খোঁজ করতে হবে। কথাটা ভাবতেই তার মনটা একটু যে খুশি হ'য়ে উঠলো নিজের কাছেও সে তা লুকোতে পারলে না।

একটু ইতস্তত ক'রে নিরঞ্জন ফটক ঠেলে ঢুকে পড়লো। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার, চুপচাপ। কেউ নেই? শিথিল পায়ে কম্পাউণ্ড পার হ'লো, সেদিন বুলি যেখানে শুয়ে ছিলো সেখানে আবছা দেখা গেলো বুড়ো মালী কী যেন করছে। বারান্দায় উঠলো, এদিকে তাকালো, ওদিকে তাকালো, কোথাও কারো সাড়া নেই। বাড়ির সব লোক একজোটে বেরুলো কোথায়?

নিরঞ্জন ভাবলে চাকরদের ডাকাডাকি ক'রে বসবে, না একটু ঘুরে আসবে। একা ঘরে ব'সে অপেক্ষা করা ক্লান্তিকর, বরং বেড়িয়ে আসাই ভালো। কাছেই লেক, একটু গিয়ে বসলে পারে ওখানে। এও মনে হ'লো যে ভুল সময়ে এসেছে, একটু রাত ক'রে এলেই অরুণকে পাওয়ার সম্ভাবনা—খাওয়ার সময়ে তো অন্তত থাকবেই।

নিরঞ্জন ফিরতি পথ ধরলে।

ফটক ছাড়িয়ে যেই রাস্তায় পড়েছে, পিছন থেকে একজন লোক বললে, 'আপনাকে ডাকছেন।' নিরঞ্জন চমকে ফিরে তাকালো।

'কে ডাকছেন?'

'দিদিমণি।'

'দিদিমণি? কোন্ দিদিমণি?'

'ছোটো দিদিমণি। আপনি চ'লে যাচ্ছেন দেখে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—'

এবার বারান্দার, বসবার ঘরের আলো জ্বালা, বুলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই বললে, 'পালাচ্ছিলেন যে?'

'ভাবলুম কেউ বাড়ি নেই—'

'কেউ আছে কি নেই তার একটা খোঁজ তো করতে হয়। বেশ লোক!'

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'ছাতে। প্রকৃতির শোভা দেখছিলুম। ভাগ্যিস আপনাকে চোখে পড়েছিলো! চলুন।'

ড্রয়িংরুমে গিয়ে দু' জনে বসলো। নিরঞ্জনের হঠাৎ মনে হ'লো বুলির কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। কথাবার্তায় চালচলনে তেমনি স্বাধীন, কিন্তু মুখ-চোখের ব্যঞ্জনাটা যেন অন্যরকম।

'এতদিন আসেননি কেন?'

'বাঃ, রোজই আসতে হবে নাকি? আমার আর-কোনো কাজ নেই?'

'আমি তো আরো ভাবছিলুম আপনার খোঁজ নিতে কাউকে পাঠাবো।'

'কেন বলো তো?'

'কেন আবার কী!'

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়ির আর সব কোথায়?'

'বাবা কোথায় গেছেন জানিনে, মা মিনি বৌদি মায়া-মন্দিরে।'

'তুমি যাওনি যে?'

'ও-সব ভক্তি-টক্তি আমার আসে না।'

'একেবারে একা আছো বাড়িতে?'

'তা একরকম একাই বলতে পারেন। একা থাকতে ভালোই লাগে আমার।'

'তাহ'লে তো বড়ো অন্যায় করলুম। তোমার নির্জনতা নষ্ট হ'লো।'

'—ভালো লাগে মানে খুব খারাপ লাগে না আরকি,' বুলি হেসে বললে। 'একা থাকতে হ'লেই অনেকে হাঁপিয়ে ওঠে তো, আমার একরকম সময় কেটে যায়।'

'নভেল প'ড়ে তো ?'

'প'ড়েও—না-প'ড়েও। চুপচাপ ব'সে থাকতেও নেহাৎ মন্দ লাগে না।'

'তোমার মুখে এ-কথা খুব নতুন শোনাচ্ছে।'

'তাই ব'লে কি গল্প করার মতো আর-কিছু ! আমাদের বাড়িতে আগে কী-রকম হৈ-চৈ হ'তো জানেন তো—এখন একদম চুপচাপ। সন্ধেবেলাটা প্রায়ই আমার একা কাটে—মাষ্টারমশাইও তো আসেন না।'

নিরঞ্জন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'অরুণ কোথায় ?'

বুলি চুপ ক'রে রইলো।

'অরুণ কোথায় গেছে জানো নাকি ? কখন ফিরবে ?'

'দাদার সঙ্গে এর মধ্যে আপনার আর দেখা হয়েছে ?'

'না তো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বুলি বললে, 'আমাদেরও হয়নি।'

'তার মানে ?'

'সেই আপনি যেদিন প্রথম এলেন সেদিন রাত্রে দাদা বাড়ি ছেড়েছেন, আর ফেরেননি।'

'আর ফেরেনি !'

না। সেদিন আপনি বলছিলেন দাদার সঙ্গে বিশেষ কী দরকার. কথাটা তাই আপনাকে জানিয়ে দেয়াই ভালো মনে করলুম। আমাদের বাড়িতে অবশ্যি সকলেরই চুপ-চুপ ভাব।'

নিরঞ্জন মিনিটখানেক চুপ ক'রে রইলো।

'কী, কোনো ঝগড়া-টগড়া ক'রে বেরিয়েছে?'

'কী যেন একটু বচসা হয়েছিলো বাবার সঙ্গে। আসলে, দাদা—' বুলি হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো।

নিরঞ্জনও কিছু বললে না। তার বুকটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো, যেন হৃৎপিণ্ড ভালোমতো চলছে না। তার একশো-কুড়ি টাকা সত্যি তাহ'লে গেলো।

তার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে বুলি বললে, খুব দুঃখিত হলেন খবরটা শুনে, মনে হচ্ছে?'

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বললে, 'দুঃখেরই তো কথা। তা কোনোরকম খোঁজখবর নেয়া হয়নি?'

'খোঁজ আর কী! বাবাকে তো চেনেন না—প্রাণ গেলেও জেদ ছাড়বেন না। দাদার নাম পর্যন্ত আনেন না মুখে। আর মা বলেন দু' দিন পরে ফিরবেই. মিছিমিছি হৈ-চৈ কেলেঙ্কারি ক'রে লাভ কী!'

শেষের কথাটা নিরঞ্জনের যুক্তিসঙ্গত মনে হ'লো। অরুণ সেদিন সকালে যখন তার হোটেলে গিয়েছিলো তখনই তো সে বাড়ি ছেড়েছে। অরুণের বয়সে ও-রকম সুন্দর মুখ নিয়ে অমন নির্লজ্জ প্রতারণা কেউ যে করতে পারে—বিশেষ, একজন বন্ধুর সঙ্গে, এটা তার ধারণা ছিলো না। তা ও-ক'টা টাকায় ক'দিন আর চলবে, ওর ফিরতেই হবে বাড়িতে।

মুখে বললে, 'তাহ'লে তোমাদের বাড়িতে তো ভারি গোলমাল।'

'কী যে বিচ্ছিরি হ'য়ে গেছে বাড়িটা, আমার আর ভালো লাগে না। তার উপর দাদার ছেলের অসুখে আরোই খারাপ লাগছে।'

'অরুণের ছেলের অসুখ নাকি?'

'হ্যাঁ, খুবই তো অসুখ। সব সময় নর্স থাকে।'

'বলো কী! এতই! কী অসুখ?'

'তা তো জানি না—বড্ড ভুগছে। কী-রকম সব ঘা হয়েছে গায়ে—চোখে দেখা যায় না।'

'অরুণ তো জানে অসুখের কথা?'

'জানে না! কবে থেকেই তো শুরু। আচ্ছা সেদিন সকালে দাদা আপনার কাছে কেন গিয়েছিলেন?'

'এমনি।'

'কী কথা হ'লো বলবেন?'

'বলবার মতো কিছু না।'

'আসল কথা, বলবেন না। তবে আমাদের কাছে লুকোবার কিছু নেই আমরা সকলেই জানি যে দাদা জাহান্নমে গেছেন।

নিরঞ্জন কী বলবে ভেবে পেলো না।

'আর কার কী—বৌদির জীবনটাই নষ্ট। বিলেতের মতো নিয়ম হ'লে বেশ হ'তো, বৌদি আবার আর-একজনকে বিয়ে করতে পারতেন। আমার এমন কষ্ট লাগে ওঁর জন্য!'

বুলির এ-সব কথায় নিরঞ্জনের একটু চমক লাগলো। বুলির যে-মূর্তিতে সে অভ্যস্ত তা চঞ্চল, এমনকি উদ্দাম, হৈ-চৈ হুল্লোড় ছাড়া আর-কিছু মানায় না তাকে। সে যে একজন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও যে সব ছাখে, বোঝে ও অনুভব ক'রে, এবং কিছু-কিছু ভাবেও তা সে এইমাত্র আবিষ্কার করলে। এদিক থেকে বুলির সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা।

বুলির নিঃসঙ্গতা তার নবযৌবনের কল্পনা নয়, সত্যি আজকাল বাড়িতে সে একা। তার চিরকালের সঙ্গী মিনি তাকে ত্যাগ করেছে। মা নিয়েই ও মত্ত। মা-র ছবির সামনে চোখ বুজে যখন পুজো-টুজো করে বুলির তখন ঘরে ঢোকা বারণ। বুলি সারা বাড়ি ঘোরাঘুরি করে,

একটু রেডিও শোনে, আলমারি থেকে মস্ত ছবির বই নামিয়ে পাতা ওল্টায়, লন্-এ গিয়ে ব'সে আকাশ নিরীক্ষণ করে, রান্নাঘরের পিছনে জোয়াত আলি মুরগি পোষে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মুরগিগুলোর র দেখে একটু সময় কাটায়। সন্ধে হ'তেই মিনি ছোটে মায়া-মন্দিরে তার ফেরা পর্যন্ত বুলি প্রায়ই জেগে থাকতে পারে না। এরই মধ্যে যখনই ফাঁক পায় গল্প জমাবার চেষ্টা করে, কিন্তু মিনির কাছ থেকে কোনো উৎসাহই পায় না, ওর ভাবটা এইরকম যেন ওর একটা কথা দাম লাখ টাকা। 'এতও বাজে বকতে পারিস তুই', ব'লে হয়তো সেখান থেকে চ'লে যেতে থাকে, বুলি তার পিছনে ধাওয়া ক'রে বলে, 'তো হয়েছে কী বল্ তো, মিনি, বোবা হ'য়ে যাচ্ছিস নাকি?' আসলে মিনি বাকসংযম অভ্যাস করছে, এবং তার এই মহৎ উদ্যমের প্রধান অন্তরা বুলিকে সে যথাসাধ্য এড়িয়েই চলে।

মিনিটা তো ভূত হ'য়ে যাচ্ছে দিন-দিন, আর বৌদির সঙ্গে গ করবার তো কথাই ওঠে না। একে তো টাটার এই ভীষণ অসুখ, তা উপর দাদার কাণ্ড—বৌদি কি আর মানুষ আছেন! অথচ বৌদি প্রথম যখন বাড়িতে এলেন বুলির কী ফুর্তি! ভাবলে এবার খা আড্ডা জমবে! যে-রকম ভেবেছিলো কিছুই হ'লো না, সব কী-রকম গোলমাল হ'য়ে গেলো। মা-ও আর মা নেই। এই সেদিনও তাদের নিয়ে কত বেড়াতেন, গল্প করতেন, তাদের সঙ্গে তাস খেলতেন, তাদের দিয়ে নাটক করাতেন—দাদাও তখন এ-রকম ছিলো না—সে-সব দিনগুলির কথা ভাবলে বুলির মন কেমন করে। মা-কে তো সে কবেই হারিয়েছে —থেকেও তিনি নেই।

তবু ভাগ্যিস বাবা এখন বাড়িতে আছেন। কিন্তু তাঁরও মনটা সে-রকম ভালো নেই তা বেশ বোঝা যায়, যতই লুকোবার চেষ্টা করুন না তিনি। কেমন ক'রেই বা থাকবে! মুখে কিছু বলেন না, বুলিকে

কাছে পেলে তেমনি হো-হো করেন, কিন্তু তাতে বুলির তেমন স্ফূর্তি লাগে না, বরং কেমন একটু কষ্টই হয়। মনে হয় বাবা যেন চেষ্টা করছেন তাকে খুশি করতে। বলতে ইচ্ছে করে, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে? আমাকে তোমার মনের কথা বলো।' কিন্তু এ-সব কথা মনে-মনেই ভাবা যায়, মুখে ঠিক ব'লে ওঠা শক্ত।

মোটের উপর, বুলির দিনগুলি বড়ো নিঃসঙ্গ কাটছে। ইচ্ছে করলে সে অবিশ্যি বাবাকে নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে, সিনেমা, রেস্তোরঁ, ডায়মণ্ডহারবর, শাড়ি, কিছুতেই আটকায় না। কিন্তু তার নিজেরই তেমন যেন মন নেই ও-সবে। এই বাড়িটায় কেমন একটা অলক্ষুনে হাওয়া এসেছে, সব আনন্দ মূলেই শুকিয়ে যায়। যে-কোনো আমোদের কথাই বুলি ভাবে, মন আর সে-রকম সাড়া দেয় না। 'কাঁদতে হবে! একদিন কাঁদতে হবে তোকে!' মিনির এই কথা থেকে-থেকে যেন হাওয়ায় বেজে ওঠে। মিনির সঙ্গে কতদিন কত ঝগড়া সে করেছে, রাগ ক'রে দু' তিনদিন কথা বলেনি, কিন্তু সেই জ্যোছনামাখা মাঝ-রাত্তিরের কথাগুলো এমন যে তা নিয়ে রাগ করাও যায় না, আবার ভোলাও যায় না।

তাছাড়া বাবা দু'তিন দিন ধ'রে রোজই সন্ধেবেলা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছেন, এ-সময়টায় বুলি একেবারেই একা। একা থাকলেই মানুষ ভাবে, বুলিও ভেবেছে নানা কথা। আজ হঠাৎ নিরঞ্জনকে সঙ্গী পেয়ে সে তাই অনেক কথা ব'লে ফেললো, হয়তো একটু বেশিই ব'লে ফেললো।

নিরঞ্জনকে মাঝে-মাঝে মনে পড়েছে তার। সত্যি হয়তো মিনি কিছু বলেছে তাকে, সেইজন্যেই তার দেখা নেই। এ ক'দিন রোজই ভেবেছে আজ নিশ্চয়ই নিরঞ্জনবাবু আসবেন, রোজই নিরাশ হয়েছে। মিনি এ-রকম একটা আজগুবি ব্যবহার কেন করতে গেলো?

কী ক'রে জানলো ও, নিরঞ্জন লোক ভালো নয়? এমন সাংঘাতিক খারাপ কী হ'তে পারে যে সে বাড়িতে এলেই বিপদ? আর সোজা মুখের উপর ব'লে দিলে—ওর সঙ্গে মিশতে পারবিনে! কেন পারবো না? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই মিশবো। আমার যদি ভালো লাগে আমি ঘাবড়াবো নাকি কারো কথায়! মিনির তো মাথা-খারাপ—মা-মা ক'রে যা মেতেছে! আমাকে দলে টানতে পারেনি, তাই তো এত রাগ!

কিন্তু আর কি কোনো কারণ নেই এ ছাড়া?

বুলি স্বভাবমিশুক মানুষ, যে-বাড়িতে আসে তার সঙ্গেই আলাপের ফোয়ারা ছোটায়। নিরঞ্জনকেও বাদ দেয়নি। খুব সহজে যারা আলাপ করে, সহজেই তারা ভোলে। বুলিরও নিরঞ্জনকে ভুলতে দেরি হ'তো না, সে যে তাদের বাড়িতে আর আসছে না তা হয়তো তেমন লক্ষ্যই করতো না, যদি না নিরঞ্জন সম্বন্ধে মিনিই তাকে অত্যন্ত সচেতন ক'রে দিতো। প্রথমত, যে-মানুষকে গভীর কালো রঙে আঁকা হয়, তার সম্বন্ধে কৌতূহল ও-বয়েসের মেয়েদের স্বাভাবিক। তাছাড়া, মিনির কাছে সে এমন ডাহা হেরে যাবে তা অসহ্য। মিনি যখন বারণ করেছে তখন তাকে আরো ভালো ক'রে মিশতেই হবে নিরঞ্জনের সঙ্গে। ঠিকানা জানে না, নয়তো নিশ্চয়ই চিঠি লিখতো। হোটেলে আছে জানে, কোন্ হোটেল জিজ্ঞেস করা হয়নি। মিনি হয়তো জানে, কিন্তু মনে-মনে ছটফট ক'রেও মিনির কাছে কথাটা পাড়তে পারেনি। একে-একে দিন যাচ্ছে, এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝি নিরঞ্জন চ'লে যাবে বর্মায়। কথাটা যতই ভেবেছে ততই অশান্ত হ'য়ে উঠেছে বুলি।

আজ তাই ছাদ থেকে যখন তার চোখে পড়লো নিরঞ্জন তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চাকর পাঠিয়ে

দিলো ডেকে আনতে। বুকটা তার একটু ঢিপঢিপ করছিলো, বোধ হয় অত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্যেই। লম্বা ছিপছিপে নিরঞ্জন যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো বুলির মনে হ'লো যেন মস্ত দামি একটা জিনিস সে হারাতে-হারাতেও ফিরে পেলো।

বুলি আগেই ব'লে রেখেছিলো, চাকর এসে ট্রেতে ক'রে চা দিয়ে গেলো, আর কয়েকখণ্ড বিস্কুট।

চা ঢালতে-ঢালতে বুলি বললে, 'আপনি আর ক'দিন আছেন কলকাতায়?'

'কালকে যাবো ভাবছি।'

'কালই!' বুলির হাতের টী-পটটা কেঁপে গেলো, গোল ব্রাউন একটা দাগ ফুটে উঠলো ট্রের উপরকার শুভ্র কাপড়ে। 'এই না আপনার এক মাস ছুটি?'

'হ্যাঁ, ছুটি আরো কিছু হাতে আছে, তাই ভাবছি একবার ঢাকা ঘুরে আসি।'

'ঢাকা কেন?'

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরঞ্জন বললে, 'এই—আত্মীয়-টাত্মীয় আছেন।'

'কবে ফিরবেন?'

'তা তো ঠিক করিনি। জাহাজ ছাড়বে একুশে, তার আগে ফিরলেই হয়।'

'কবে যাবেন তাও বোধ হয় ঠিক করেননি?'

'কী ক'রে বুঝলে?'

'মনে হ'লো আপনার কথা শুনে।'

'সত্যি, যাওয়ার কথা ভেবে-ভেবেই এ-ক'টা দিন কাটলো। এবারে যা হোক্ মন স্থির করতেই হবে। কালই যাবো।'

'কাল আপনার যাওয়া হবে না,' বুলি গম্ভীরভাবে বললে।

'যাওয়া হবে না? কেন?'

বুলি হেসে ফেলে বললে, 'কালই না-হয় না গেলেন। আছে তো মাসখানেক সময়।'

'একমাস আর কোথায়! আর দিন কুড়ি।'

'মোটে!'

'আমার চাকরিতে এর চেয়ে লম্বা ছুটি হয় না।'

'আর তাও আপনি কলকাতার বাইরে গিয়ে নষ্ট করতে চান!'

'কলকাতার বাইরে গেলেই বুঝি নষ্ট হয়?'

'আমার মতে তো হয়।'

'কলকাতায় কী আছে—কিচ্ছু না। এবার ভালোই লাগছে না এখানে।'

'কেন, ভালো লাগছে না কেন?'

নিরঞ্জন একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'এ-বিষয়ে তোমাকেই তো অনুকরণ করছি।'

বুলি কপাল কুঁচকে বললে, 'তার মানে?'

'বাঃ, তুমি না সেদিন বললে নাগপুর চ'লে যাচ্ছো বাবার সঙ্গে? কলকাতা ভালো লাগলে কি আর যেতে চাইতে?'

'ওহ্, সেই কথা! কলকাতা আমার ভালো লাগে না তা তো নয়, তবে এখানে মাঝে-মাঝে দম আটকে আসে তা ঠিক।'

'এখানে মানে?'

'মানে আমাদের এই বাড়িতে। নাগপুরে যাবো, ভাবতে বেশ ভালোই লাগছে। তা আজই তো আর যাচ্ছি না।'

চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে নিরঞ্জন বললে, 'এবার তাহ'লে উঠি।'

'খাওয়ার পরে ভদ্রতা ক'রেও দু' চার মিনিট বসতে হয় তাও জানেন না?'

'তা বসছি। কিন্তু একটু পরেই উঠবো।' নিরঞ্জনের মনে কেমন একটা ভয়, পাছে মিনির সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়।

'এত তাড়া কিসের?'

'কেউ নেই বাড়িতে—' নিরঞ্জনের মনের কথা ঠিক এটা নয়, কিন্তু এ-কথা তো আর বলা যায় না, 'ওরা সব এসে পড়বার আগেই পালাই।'

'আমিই তো আছি। একদিন না-হয় আমার সঙ্গেই গল্প করলেন।'

বুলির চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিরঞ্জন বললে, 'তুমি হঠাৎ এ-রকম ভদ্র হ'য়ে গেলে কেমন ক'রে?'

'তার মানে? আমি কি অভদ্র নাকি?'

'ভদ্রতা যে জানে না সে অভদ্র। তার সঙ্গ কষ্টকর। কিন্তু ভদ্রতা যে মানে না তাকে আমার তো বেশ পছন্দই হয়। তুমি সেইরকম—ছিলে।'

'ছিলুম?'

'তোমার চোখের তাকানোটা পর্যন্ত বদ্‌লে গেছে।'

'আগের চেয়ে ভালো না মন্দ?

'তা বলতে পারিনে,' ব'লে নিরঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে আরামের ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিলে। ওঠা হ'লো না, গল্পে জ'মে গেলো। কেমন ক'রে ন'টা বেজে গেলো বুঝতে পারলে না।

ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো বাইরে। বুলি বললে, 'বাবা এলেন।'

অরিন্দম বসার ঘরের দরজায় একটু দাঁড়ালেন, ঢুকলেন না। দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চ'লে গেলেন উপরে।

নিরঞ্জন বললে, 'এখন তাহ'লে যাই, কী বলো?' যাবার সময় তার মনে হ'লো সময়টা চমৎকার কেটেছে।

বুলি বারান্দা পর্যন্ত এলো।—'কাল আসবেন?'

'কালই আবার আসবো?' ভুলেই গেলো কাল তার ঢাকা যাবার কথা।

এবার বুলি বললে, 'কাল আসবেন।'

'রোজ-রোজ আসাটা কি ভালো দেখাবে?'

বুলি মৃদুস্বরে হেসে উঠলো—'আপনিও দেখি মিনির মতো কথা বলছেন।'

নিরঞ্জন চট ক'রে একবার বুলির মুখের দিকে তাকালো, বুলির নির্ভীক উজ্জ্বল দৃষ্টি মিললো তার চোখে। আর-কোনো কথা হ'লো না।

অরিন্দম দোতলায় উঠেই বারান্দার ইজি-চেয়ারে ব'সে পড়লেন। কাপড় ছাড়লেন না, আলো জ্বাললেন না। শূন্য বাড়ি। দোতলাটা অন্ধকার, শুধু উজ্জ্বলার ঘরে ম্লান নীল আলো জ্বলছে। ঐ ঘরের মধ্যে রোগ, আসন্ন মৃত্যু, শাদা কাপড় পরা নর্সের নিঃশব্দ পরিচর্যা। একবার ভাবলেন রোগীর খোঁজ নিয়ে আসেন, কিন্তু ঐ মৃত্যুর-ছায়া-পড়া ঘরটায় ঢুকতে ইচ্ছে করলো না।

খোঁজ নিয়েই বা কী হবে, ও তো মরবেই। নীরদ ডাক্তার মুখ ফুটে এ-কথা না-বললেও বেশ স্পষ্টই বুঝতে দিয়েছেন। এখন আর-কিছু না; যদ্দিন টিঁকিয়ে রাখা যায়।

হৈমন্তীর কথাই ঠিক। ডাক্তার না-ডাকলেও ও যেদিন মরবার মরতোই। মিথ্যে টাকা ঢালা। যে-দুর্দান্ত রোগের বীজ রক্তে নিয়ে জন্মেছে, নিস্তার ছিলো না ওর। দু' দিন আগে কি দু' দিন পরে মরা—তাতে এমন-কী এসে যায়। বেঁচে থাকলেও হ'লো কি খোঁড়া কি হাবা হ'য়ে থাকতো। তার চেয়ে মরা ভালো।

ভালোই হয়েছে যে প্রথম থেকেই চিকিৎসা হয়নি, তাহ'লে হয়-তো রাস্তার বীভৎস বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো ও-ও থাকতো বেঁচে, খোকা,

টাটা, টাটু, লীলাকমল সরকার, পিতা অরুণকুমার, পিতামহ অরিন্দম সরকার। আমারই রক্ত ও, আমারই মাংস, ওর এই বিকট রোগ আমারই রক্তে বিষ ঢালে, আমারই মাংস পচায়। ও মরবে ব'লে দুঃখ নেই, কিন্তু কী নিষ্ঠুর অপমান! প্রতিদিন চোখের উপর এই দৃশ্য দেখা, কেউ যেন হাতে-পায়ে বেঁধে চাবকাচ্ছে। মুখে থুতু ছিটোচ্ছে। পুত্র নাকি নরক থেকে বাঁচায়, আমাকে ডোবালো নরকের নর্দমায়। এত বড়ো মূঢ়, নিজের চিকিৎসাটা পর্যন্ত করায়নি! একটা শিশুকে পচিয়ে-পচিয়ে মারলে, রটালে নিজের লাম্পট্য, তারপর নিজের শরীরে কালসাপের মতো যে-রোগ পুষে রেখেছে, তা হঠাৎ একদিন ছোবল মারবে মাথায়, পাততাড়ি গুটোতে হবে। আত্মহত্যা যদি করতেই হয়, বিষ আছে, পিস্তল আছে, এ বীভৎস উপায় কেন?

FOOL!

নাতিকে শুধু নয়, ছেলেকেও অরিন্দম খরচের খাতায় লিখে রেখেছেন। ও গেছে আপদ গেছে, আর যেন না ফেরে। আর যেন ওর মুখ আমি না দেখি। গেছে সাতদিন হ'লো, কোনো খবর নেই। শুয়োরের মতো পাঁকে গড়াচ্ছে, সুখ বলতে ঐ তো বোঝে ও। সুখে আছে। থাক্‌, যতদিন রক্তের বিষ মাথায় না চড়ে, তখন আর-কিছু ভাবতে হবে না। কেউ ফেরাতে পারবে না ওকে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। চেষ্টা করতে গিয়ে তো এই হ'লো। ভুল হয়েছিলো? মিষ্টি কথায় ফেরানো? ভালোবাসায় ভোলানো? চব্বিশ বছরের ছেলে, সদ্য-বিয়ে-করা বৌয়ের ভালোবাসায় যে মজলো না, সে ভুলবে মা-বাপের ভালোবাসায়? ভুল হয়েছে এই যে একবার হাতের কাছে পেয়েও পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবকানো হয়নি। তাহ'লে হয়তো কিছু ফল পাওয়া যেতো।

গেছে, যাক্‌। কী হবে ওর জন্য ভেবে? হৈমন্তী নিশ্চিন্ত, আমি কেন ভেবে মরি? ঈশ্বরই বোধ হয় হৈমন্তীর স্বামী-পুত্র (যদিও একই

ব্যক্তি কী ক'রে একাধারে স্বামী এবং পুত্র হ'তে পারেন তা ধারণা করা শক্ত), তাই তার কোনো ভাবনাই নেই। স্ত্রীর সঙ্গে অরিন্দমের এ ক'দিন কথাবার্তা হয়েছে খুব কম। ছেলের নাম মুখে আনেননি কেউ। শুধু সেদিন হঠাৎ হৈমন্তী বললে, 'খোকার জন্যে ভেবো না, ও ভালোই আছে।' স্বপ্নে আদেশ-টাদেশ পেয়েছে বোধ হয়। না কি সে কোনো খবর পেয়েছে, আমার কাছে লুকোচ্ছে? অরিন্দমের মুখে প্রশ্ন উঠে আসছিলো, চেপে গেলেন। ও ভালো আছে এ-খবর ভালো না। শুনতে চাই অনাহারে পথে-পথে ঘুরছে। শীর্ণ মুখ, ছেঁড়া কাপড়। এই একটিমাত্র সরু রাস্তা আছে ওর বাঁচবার। ও জানুক ও বড়োলোকের ছেলে নয়, ওর বাড়ি নেই, বাঁধা খাওয়া নেই; বাপের কথায় যেমন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, বজায় রাখুক ওর জেদ, নামুক কুলি হ'য়ে খনিতে, খালাসি হ'য়ে সমুদ্রে ভাসুক, সারাদিন খেটে একবেলা ডাল-ভাত জোটাক, তবে তো বুঝি তেজ। দু'দিন পরেও অরুণ যখন বাড়ি ফিরলো না, ঐ-রকমই একটা আশা হয়েছিলো অরিন্দমের মনে। থানায় খবর দিলেন না, হাসপাতালে খোঁজ নিলেন না, খবরের কাগজে ফিরে আয় ব'লে করুণ বিজ্ঞাপন ছাপালেন না, মনে-মনে শুধু বললেন ও যেন এমন কষ্ট পায় যে প্রাণ থাকে কি যায়। যদি যায় তবে তো গেলোই—এমনিও যাবে; কিন্তু টিঁকে গেলে সে-প্রাণ হবে মানুষের বহন করার যোগ্য।

পাছে তাঁর নামের সুবিধে নিয়ে অরুণ তার দুঃখের পথে বিঘ্ন ঘটায় সেজন্য অরিন্দম আজ কলকাতার সব ক'টা দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছেন যে তাঁর ছেলের কোনো ঋণের জন্য তিনি আর দায়ী নন। আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন বেরুবে, সকলেরই চোখে পড়বে আশা করা যায়। অরুণ দেখবে নিশ্চয়ই। সঙ্গে-সঙ্গে দেখবে কলকাতার বাজারে তার খাতির অনেক ক'মে গেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই মাথা ঠাণ্ডা হ'তে দেরি হবে না।

কিন্তু এ আশা অতি ক্ষীণ, তাও অরিন্দম জানেন। হয়তো তিনিই সেজন্য দায়ী। বাপের উপর নবাবি করবার বাঙালি ছেলের যে-মজ্জাগত ঝোঁক, অরিন্দম তার অবাধ প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। কলেজে পড়বার সময় হাত-খরচই নিয়েছে মাসে সত্তর-আশি টাকা। সুখে, বিলাসিতায় লালিত হয়েছে জন্ম থেকে। কোনো খেয়ালে বাধা পায়নি। একদম নরম'প্যাচপেঁচে হ'য়ে গেছে, ভিতরে কোনো শক্ত শাঁসই নেই। দুঃখ চেতিয়ে তুলবে ভিতরে কিছু থাকলে তো! প্রথম ধাক্কাতেই নেতিয়ে পড়বে, আর উঠতে হবে না। তারপর রাস্তায় শুয়ে প'চে-প'চে মরবে।

অরিন্দমের হঠাৎ মনে পড়লো অরুণ যখন ছোটো। প্রথম শিশু এলো ঘরে। কোথায় থাকে সে-ভালোবাসা, একটি শিশু এসেই কূল ছাপিয়ে জাগায়? আগে জানিনি, কিন্তু শিশু দিনে-দিনে বাড়ে আর মনে হয় এ না হ'লে কেমন ক'রে বাঁচতুম? ঝাঁকড়া চুল, চোখ চকচকে, টুকটুকে ঠোঁট, এখনো মনে পড়ে। টাটার মুখে কিছু আদল ছিলো। লীলাখেলা দেখে কত সময় কাটিয়েছেন, মাঝরাত্তিরে আলো জেলে ঘুম ভাঙিয়ে খেলা করেছেন, নিজেই আবার ঘুম পাড়িয়েছেন। 'ভারি মেয়েলি স্বভাব তোমার', বলেছেন হৈমন্তী। স্নেহে অন্ধ বরাবরই। কি স্ত্রী, কি ছেলে, কি মেয়েরা—যার যা খুশি তা-ই করেছে, সেটাই লেগেছে ভালো। ওরা সুখী হবে, এর উপর আর কথা নেই। যখন যা চায়। যখন যা ভালো লাগে। ওদের খুশিতেই অরিন্দম মুগ্ধ। টাকা রোজগার করেছেন ঢের, দু' হাতে উড়িয়েছেন, সব চেয়ে যে ক'টি মানুষকে ভালোবাসেন তাদের ইচ্ছাপূরণে অর্থাভাব বাধা হয়নি, বড়ো চাকরি করার এই প্রধান সার্থকতা তাঁর পক্ষে।

ভুল করেছিলেন। আজ এতদিন পরে, পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পরে এ-কথাও তাঁকে বুঝতে হ'লো! নতুন শেখা বাকি ছিলো।

যদি তা না হয়? সেইজন্তেই এ-সব ব্যবস্থা, উকিলের সঙ্গে ব'সে ব'সে তিনি ঠিক সে-সব দিনেরই নক্সা আঁকছেন, যে-দিনে তিনি আর নেই। সে-ঘটনা খুব কাছেও হ'তে পারে, রোজই তো কেওড়াতলার রাস্তায় দু'চারজন যাচ্ছে। কাছে মনে ক'রেই উইল করা, আজ তিনি মরলে কাল থেকেই যাতে তাঁর উপার্জ্জিত টাকা তাঁর ইচ্ছেমতো বিলি হ'তে পারে, তাই তো এত ভাবনা।

এমন দিন আসবে যখন তিনি আর থাকবেন না এ-কথা এত স্পষ্ট ক'রে এর আগে আর ভাবেননি। নিজেকে বাদ দিয়ে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাড়ি, টাকাকড়ি, কিছুরই ভালো ধারণা হয় না; যদিও ধ'রে নিচ্ছি আমি নেই, সেই আমিই রয়েছি প্রচ্ছন্ন, আমার চোখ দিয়েই সব দেখছি। নয়তো সবই মিথ্যে। এই উইল ব্যাপারটাও যেন খানিকটা অবাস্তব; আমি নেই অথচ আর সবই আছে, সবই চলছে, এটা কাগজে-কলমে লিখলেও উপলব্ধি করা সহজ নয়। তবু—যা করবার করতেই হয়। মৃত্যু যে-কোনো দিন আসতে পারে এ-কথা ধ'রে নিয়েই এখন থেকে চলতে হবে। অসাবধান হ'লে চাইকি অরুণ দু'দিনেই ফুঁকে দেবে সব, কি বাড়িটাড়ি সুদ্ধ সব গিয়ে পড়লো ঐ মহামায়ার হাতে। সেটা হবে নিজের মৃত্যুর চেয়েও বড়ো দুর্ঘটনা। তাই আঁটঘাট বাঁধা। এক বছর পরে যখন পেন্সন পাবেন, তখন ঐ আদ্ধেক-হ'য়ে-যাওয়া আয়েই চালাতে হবে, সারাজীবনের সঞ্চয়ের উপর আর হাতই দেয়া চলবে না, তা রেখে দিতে হবে নিজের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য। যারা বলে মানুষের ম'রেও শান্তি নেই, তারা নেহাৎ মিছে বলে না।

উইলটি একটু জটিল, উকিলের সঙ্গে আরো কিছু পরামর্শ দরকার। তাছাড়া ট্রস্টী ঠিক করা এখনো বাকি। আছে আইনের আরো খুঁটিনাটি। যা-ই হোক্, একেবারে পাকা দলিলটি তৈরি ক'রে, সই

ক'রে, ব্যাঙ্কে জমা রেখে তবে এবার তিনি নাগপুর ফিরবেন। নিজের মৃত্যুর আয়োজন সম্পূর্ণ, তারপর যা হবার হোক্।

অরিন্দম ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। বড়ো ক্লান্ত লাগে।

পাশে কার ছায়া পড়লো।—'বাবা।'

অরিন্দম চমকে উঠলেন। কী আশ্চর্য মিল বুলির আর খোকার কণ্ঠস্বরে। আগে কোনোদিন লক্ষ্য করেননি। রাস্তার যে-সব সুবেশ যুবক ঘুরে বেড়ায় তারা অনেকেই যে অরুণের মতো তা-ই বা কবে লক্ষ্য করেছিলেন!

'বুলি! আয়। আলোটা জ্বাল্।'

বুলি আলো জ্বেলে বাবার পায়ের কাছে মোড়ায় বসলো।

'নিরঞ্জন চ'লে গেছে?'

বুলি মাথা নাড়লো।

'আমাকে দেখেই উঠে এলি বুঝি?'

'না, বাবা, উনি অনেকক্ষণ ধ'রেই উঠি-উঠি করছিলেন।'

'আরো খানিকক্ষণ গল্প করলেই পারতিস। ভারি একা লাগে তোর, না রে?'

'কই, না তো।'

'বুলি, তুইও যে মন জুগিয়ে কথা বলতে শিখলি। উপায় হবে কী?'

বুলি একটু হেসে বললে, 'এখন খাবে না, বাবা?'

'খাবো বইকি, চল্।'

'ইচ্ছে করলে দেরিও করতে পারো।'

'না, না, আর দেরি না। খিদে যা পেয়েছে। ওরা এসে দেখবে আমাদের খাওয়া হ'য়ে গেছে—জব্দ হবে।'

কেমন ফাঁকা-ফাঁকা শোনালো কথাগুলি।

মিনি ক'দিন ধ'রেই সন্ধ্যাবেলা মায়া-মন্দিরে যাচ্ছে, কিন্তু বাবার

খাওয়ার সময়ের আগেই এসেছে ফিরে। আজ তার ফেরা হয়নি, কানাই ভট্চাযের পাষাণ-গলানো কেত্তন আরম্ভ হয়েছে, ফেলে ওঠা অসম্ভব। উজ্জ্বলাও আজ অনুপস্থিত। মস্ত খাবার টেবিলের এক কোণে বসলো দু'জনে; অরিন্দমের মনে হ'লো এমন নিরানন্দ ভোজে জীবনে কখনো তিনি বসেননি।

বাপের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বুলি বললে, 'মিনি আর বৌদি এখন ফিরে এলেই পারে।'

'ঐ ছাখ—বললুম না তোর একা-একা লাগে।'

বুলি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সত্যি এবার তোমার সঙ্গে নাগপুর যাবো, বাবা।'

'বেশ তো।'

'বেশি যেন উৎসাহ নেই তোমার?'

'একা কি থাকতে পারবি ওখানে?'

'একা মানে? তুমিই তো আছো। তাছাড়া তুমিও তো একাই থাকো। আমি গেলে তবু দেখাশোনা করবার একটা লোক হবে।'

অরিন্দম হেসে উঠলেন।

'হাসির কথা কী! ঐ তো সেবার তোমার অসুখ করলো—কাউকে কিছু লিখলে না, একা-একাই ভুগে উঠলে। ভারি অন্যায় তোমার।'

অরিন্দমের মনে পড়লো বুলি যখন ছোটো তিনি কখনো চুপ ক'রে একটু শুলেই ও কাছে এসে বলতো, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে? অসুখ করেছে? গা টিপে দেবো? মাথা টিপে দেবো? জল খাবে?' এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়তো যে কিছু-একটা ফরমায়েস দিয়ে তবে তার হাত থেকে নিস্তার ছিলো। তারপর কপালে হাত বুলিয়ে বলতো, 'ষাট, ষাট, সেরে যাবে।' তখন হাসি পেতো ওর রকম দেখে, আজ কথাটা মনে প'ড়ে ঠিক হাসি পেলো না, বুকের

মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত শিরশিরানি অনুভব করলেন। মস্ত বড়ো বাবাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার ভার নিজের উপরে নিতো যে-ক্ষুদ্র মেয়ে, সে এখনো একেবারে হারিয়ে যায়নি; অন্য সকলের অমনোযোগ যে-শূন্য রচনা করেছে, তা সে একলাই ভ'রে দেবে, তার এই ইচ্ছা ফুটে ওঠে প্রতি কথায়।

অরিন্দম খানিকক্ষণ কিছু বললেন না।

'তুমি আজ কিছুই খাচ্ছো না, বাবা।'

'কী যে বলিস!' অরিন্দম মেয়েকে দেখিয়ে আর-একখানা ভেটকির ফ্রাই নিলেন।

'জোর ক'রে খেয়ো না, বাবা। একদিন না-হয় একটু কমই খেলে।'

অরিন্দম হেসে বললেন, 'খাওয়া সম্বন্ধে তোদের কাছে আমার এমন একটা সুনাম হয়েছে যে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে মাঝে-মাঝে সত্যি বিপদে পড়তে হয়।'

বুলি বললে, 'আমার মনে হচ্ছে আজ রান্নাটাও তেমন সুবিধে হয়নি।'

অরিন্দম ব'লে উঠলেন, 'বাঃ, এই বর্ষাকালে এত বড়ো কই! আবার যে ফুলকপি দেখছি। যা-ই বলিস, কলকাতার মতো জায়গা নেই। বারো মাস সব পাওয়া যায়।'

কথাবার্তাটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বুলি বললে, 'নাগপুরে কেমন পাওয়া যায় খাওয়া-দাওয়া?'

'আরে ছি-ছি, সে আর বলবার নয়। মাছ তো চোখেই দেখিনে, মাংস ডিম খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকা।'

এ-প্রসঙ্গ আর চালানো গেলো না, কথায় আবার ছেদ পড়লো।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, বুলি হঠাৎ বললে, 'বাবা, তুমি কী ভাবছো আমাকে বলবে?'

'ভাবছি নাগপুর গিয়ে আর কী করবি, তোর যাবার মতো একটা চমৎকার জায়গাই তো রয়েছে।'

'কোথায় সেটা?'

'শ্বশুরবাড়ি।'

বুলি হেসে উঠে বললে, 'ভুল বললে। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীর বাড়ি যায়।'

'ঠিকই বলেছিস। শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা ভুল। স্বামীর বাড়িই যাওয়া উচিত।' কথাটা অরিন্দম বললেন উজ্জ্বলার কথা ভেবে। রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা-করা এক খণ্ড আম মুখে দিয়ে বললেন, 'সত্যি ভাবছি এবার তোর বিয়ে দেবো।'

'আর-একটা ভুল বললে, বাবা। আজকালকার মেয়েদের বিয়ে হয় না, তারা বিয়ে করে।'

'করতে যদি পারিস সে তো খুবই ভালো, নয়তো হবে।'

বুলি বললে, 'হ্যাঁ বাবা, এখন বিয়ে হওয়াই ভালো।'

অরিন্দম একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'একটা কথা তোকে ব'লে রাখি, বুলি। যদি কখনো প্রেমে পড়িস আমাকে বলিস কিন্তু।'

* * *

নিরঞ্জনের পক্ষে ঢাকা মেলের চাইতে বালিগঞ্জের ট্র্যামের আকর্ষণই প্রবল হ'য়ে উঠলো। পরের দিন সন্ধ্যায় এসে দ্যাখে ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে, লম্বা সোফায় পা তুলে ব'সে বুলি বই পড়ছে। বসেছে এলানো ভঙ্গিতে, পিঠের নিচে হলদে সিল্কের কুশান, পা দুটি একটি সরল রেখায় এসে শেষ হয়েছে আর-একটি কুশানের উপর, সেটি মিশকালো। গোড়ালির চাপে কালো কুশানটা কুঁচকোনো, পায়ের আঙুলগুলো এই বাঁকাচ্ছে, এই টান করছে। শাড়িটি পরেছে ইঁটের মতো লালচে-ব্রাউন রঙের, মেঝেতে প'ড়ে

আছে রঙিন কাপড়ের দুটি চটি। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকেই এক পলকে সব দেখে নিলে।

মুহূর্তে সোজা হ'য়ে ব'সে বুলি বললে, 'আসুন।'

বুলির দিকে আর-এক ঝলক তাকিয়ে নিরঞ্জন বললে, 'বেরুবে বুঝি এক্ষুনি?'

'না তো। আপনার জন্যেই ব'সে আছি এখানে।'

'আমার জন্যে কেন?'

'বাঃ, আপনি কাল ব'লে গেলেন না আজ আসবেন।'

'তাই নাকি? আমার আজ ঢাকা যাবার কথা ছিলো যে।'

'এও বলেছিলেন যে ঢাকা আর যাবেন না। যে-ক'দিন ছুটি আছে, কলকাতাতেই থাকবেন।'

'আমি বলেছিলাম!'

'আমি তো বলেছিলাম। তাহ'লেই হ'লো।' বুলি উঠে দলিত কুশান দুটো চাপড়ে টান ক'রে রাখলো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, 'আজও কি বাড়িতে তুমি একা?'

'এতক্ষণ তা-ই ছিলুম, এখন আর একা বলা যায় না'

একটু কাটলো চুপচাপ, তারপর নিরঞ্জন কথা পাড়লো: 'কী বই পড়ছিলে ওটা?'

'পড়ছিলুম না, দেখছিলুম। ছবির বই।'

'আমারও একটি ছবি চোখে পড়লো এ-ঘরে ঢুকেই। দুঃখের বিষয় বেশিক্ষণ দেখতে পারলুম না।'

নিরঞ্জনের মুখের দিকে একটু তাকিয়েই বুলি কথাটা বুঝতে পারলে। হেসে বললে, 'ছবিটার নামও আমি ব'লে দিতে পারি— "একটি অলস মেয়ে।" বাস্তবিক, কী ক'রে যে সময় কাটে! এক এক সময় মনে হয় আমার কি কিছুই করবার নেই জগতে?

অগত্যা ঘরকন্নায় মন দেবো ভাবি, তারও উপায় নেই—এত চাকর-বাকর।'

'কেন, তুমি পড়াশুনো করো না?'

'পড়াশুনো মানে তো পরীক্ষা পাশ করা!'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'তা ছাড়া আর কী!'

'আমার পক্ষে তা-ই। সত্যি-সত্যি পড়াশুনো আমি কোত্থেকে করবো! আমার কি তেমন মাথা! নভেল ছাড়া কিছু পড়তেই পারিনে।'

'কেন, নভেলটা বুঝি মিথ্যেমিথ্যি পড়া? তোমার বয়সে—' নিরঞ্জন থেমে গেলো।

'কী বলছিলেন?'

'বলছিলুম তোমার বয়সে সকলেই খুব নভেল পড়ে। তাতে কিছু খারাপ হয় না—ভালোই হয়।'

'আমার বয়েসে মানে? আমার বয়েস কি কম? সতেরো হ'লো হ'লে কী হবে—কোনো শক্ত বিষয়ে মনই দিতে পারিনে। নভেল—তাও কী রকম ভালো লাগে জানেন? টানা একটি প্রেমের গল্প, খু সহজ লেখা, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, কথাবার্তা বেশি। বর্ণনা এলে ডিঙিয়ে যাই।'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'ভালোই করো।'

'জানেন, এ-ধরনের বই বেশি পড়লে মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁব ফাঁকা লাগে। মনে হয়, এখন কিছু করি, কিছু করি। কিন্তু করবো?' কিচ্ছু জানিনে। মাটির পুতুল যদি গড়তে পারতুম তাহ'লে বেশ হ'তো। একবার ছাদে টবের বাগান করবার চেষ্টা করলুম, কৈ কুলোলো না। অভ্যেসই গেছে খারাপ হ'য়ে।'

'তাহ'লে মন দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া পড়তেই শুরু করো।'

বুলি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'বাবার সঙ্গে যদি চ'লে যাই ও-সব তো চুলোয় যাবে। যাওয়াই ভালো—কী হবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে ?'

'কলেজে পড়বে।'

'কলেজে প'ড়েই বা কী হবে। মিনির তো এবার বি. এ. দেবার কথা। তাতে হ'লো কী ? ঐ মহামায়ার পায়েই তো বিদ্যেবুদ্ধি ডালি দিলে। জিগেস ক'রে দেখবেন, পৃথিবীর কোনো বিষয়ে কোনো খবর রাখে ? খবরের কাগজটা খোলে বছরে একবার ? রেডিওটা যখন খোলে তখনো কলকাতা ছাড়া কিছু ধরে না।'

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো।

বুলি বললে, 'বি. এ., এম. এ. যা-ই পাশ করি ঐ রকমই হবো তো ! অতএব ঠিক করেছি আমি কিছুই পাশ করবো না, লেখাপড়ায় মাথা যখন নেই মূর্খ হয়েই থাকবো। আপনিই বলুন, শিক্ষিত মূর্খের চাইতে অশিক্ষিত মূর্খ কি ঢের ভালো না ?'

নিরঞ্জনের মনে পড়লো অনেকটা এইরকমই একটা প্রশ্ন সেদিন লন-এ ব'সে বুলি করেছিলো। তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে বুলি আবার বললে, 'শিক্ষিত হবার 'পরে লোভ নেই আমার, লোভ হয় গুণী হ'তে। কত সময় আমার, কত সুবিধে, কিচ্ছুর জন্যে ভাবতে হয় না। কোনো গুণী লোক এ-রকম সুবিধে পেলে পৃথিবীর কত লাভ হ'তো। তা তো হয় না—যত সুবিধে পেলুম কিনা আমি, যে গাইতে পারে না, আঁকতে পারে না, লিখতে পারে না, কিচ্ছু পারে না !'

বুলি মাথা ঝেঁকে উঠলো, বুকের উপর লুটিয়ে-পড়া লম্বা মোটা বেণী দুটি উঠলো দুলে।

নিরঞ্জন বললে, 'খামকা মন-খারাপ করছো। গুণী আর ক'জন হয়—পৃথিবীতে বেশির ভাগই সাধারণ লোক। দ্যাখো না আমি কেমন মেনে নিয়েছি যে আমি মানুষটা অতি সাধারণ—বেশ আছি।'

অগত্যা ঘরকন্নায় মন দেবো ভাবি, তারও উপায় নেই—এত চাকর-বাকর।'

'কেন, তুমি পড়াশুনো করো না?'

'পড়াশুনো মানে তো পরীক্ষা পাশ করা!'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'তা ছাড়া আর কী!'

'আমার পক্ষে তা-ই। সত্যি-সত্যি পড়াশুনো আমি কোত্থেকে করবো! আমার কি তেমন মাথা! নভেল ছাড়া কিছু পড়তেই পারিনে।'

'কেন, নভেলটা বুঝি মিথ্যেমিথ্যি পড়া? তোমার বয়সে—' নিরঞ্জন থেমে গেলো।

'কী বলছিলেন?'

'বলছিলুম তোমার বয়সে সকলেই খুব নভেল পড়ে। তাতে কিছু খারাপ হয় না—ভালোই হয়।'

'আমার বয়েসে মানে? আমার বয়েস কি কম? সতেরো হ'লো। হ'লে কী হবে—কোনো শক্ত বিষয়ে মনই দিতে পারিনে। নভেল—তাও কী রকম ভালো লাগে জানেন? টানা একটি প্রেমের গল্প, খুব সহজ লেখা, কোনো ঘোরপ্যাচ নেই, কথাবার্তা বেশি। বর্ণনা এলেই ডিঙিয়ে যাই।'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'ভালোই করো।'

'জানেন, এ-ধরনের বই বেশি পড়লে মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মনে হয়, এখন কিছু করি, কিছু করি। কিন্তু কী করবো? কিচ্ছু জানিনে। মাটির পুতুল যদি গড়তে পারতুম তাহ'লেও বেশ হ'তো। একবার ছাদে টবের বাগান করবার চেষ্টা করলুম, ধৈর্যে কুলোলো না। অভ্যেসই গেছে খারাপ হ'য়ে।'

'তাহ'লে মন দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া পড়তেই শুরু করো।'

বুলি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'বাবার সঙ্গে যদি চ'লে যাই ও-সব তো চুলোয় যাবে। যাওয়াই ভালো—কী হবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে?'

'কলেজে পড়বে।'

'কলেজে প'ড়েই বা কী হবে। মিনির তো এবার বি. এ. দেবার কথা। তাতে হ'লো কী? ঐ মহামায়ার পায়েই তো বিদ্যেবুদ্ধি ডালি দিলে। জিগেস ক'রে দেখবেন, পৃথিবীর কোনো বিষয়ে কোনো খবর রাখে? খবরের কাগজটা খোলে বছরে একবার? রেডিওটা যখন খোলে তখনো কলকাতা ছাড়া কিছু ধরে না।'

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো।

বুলি বললে, 'বি. এ., এম. এ. যা-ই পাশ করি ঐ রকমই হবো তো! অতএব ঠিক করেছি আমি কিছুই পাশ করবো না, লেখাপড়ায় মাথা যখন নেই মূর্খ হয়েই থাকবো। আপনিই বলুন, শিক্ষিত মূর্খের চাইতে অশিক্ষিত মূর্খ কি ঢের ভালো না?'

নিরঞ্জনের মনে পড়লো অনেকটা এইরকমই একটা প্রশ্ন সেদিন লন-এ ব'সে বুলি করেছিলো। তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে বুলি আবার বললে, 'শিক্ষিত হবার 'পরে লোভ নেই আমার, লোভ হয় গুণী হ'তে। কত সময় আমার, কত সুবিধে, কিচ্ছুর জন্যে ভাবতে হয় না। কোনো গুণী লোক এ-রকম সুবিধে পেলে পৃথিবীর কত লাভ হ'তো। তা তো হয় না—যত সুবিধে পেলুম কিনা আমি, যে গাইতে পারে না, আঁকতে পারে না, লিখতে পারে না, কিচ্ছু পারে না!'

বুলি মাথা ঝেঁকে উঠলো, বুকের উপর লুটিয়ে-পড়া লম্বা মোটা বেণী দুটি উঠলো দুলে।

নিরঞ্জন বললে, 'খামকা মন-খারাপ করছো। গুণী আর ক'জন হয়—পৃথিবীতে বেশির ভাগই সাধারণ লোক। ছাখো না আমি কেমন মেনে নিয়েছি যে আমি মানুষটা অতি সাধারণ—বেশ আছি।'

বুলি বললে, 'আহা—সাধারণ লোকের যেন কোনো দাম নেই! এত বড়ো একটা পৃথিবী চালাচ্ছে তো সাধারণ লোকরাই। এমন কোন লোক আছে বলুন যাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না? একটু কাজে যে লাগে সে-ই সার্থক। শুধু আমি এখন পর্যন্ত কোনো কাজেই লাগলুম না।'

নিরঞ্জন হেসে ফেললো।

'আপনি তো হাসবেনই। আপনি তো আমার মতো অলস অপদার্থ নন। আপনি ভালো টেনিস খেলতে পারেন—'

এবার নিরঞ্জন জোরে হেসে উঠলো।

নিরঞ্জনের মুখের উপর চোখের আলো ঝলসে বুলি বললে, 'কেন, টেনিস খেলাটা কিছু নয় বুঝি? সকলেই পারে নাকি ভালো খেলতে? তাছাড়া আপনার কথা আলাদা। শুয়ে ব'সে নভেল প'ড়ে তো আপনার দিন কাটে না। এই তো যাচ্ছেন সাপে-ভরা জঙ্গলে তেলের খনি খুঁড়তে।'

নিজের সামান্য উপজীবিকাকে এমন রোম্যান্টিক রঙে আঁকা হ'তে দেখে নিরঞ্জন চমৎকৃত হ'লো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সুখে থাকাটা তোমার মোটেও পছন্দ নয় দেখছি।'

'সুখ মানে? আমি তো সুখ খুঁজছি, পাচ্ছি না। একটা কাজের মতো কাজ পেলে তবে তো সুখ। আমার ইচ্ছে করে পাহাড়ে চড়ি, এরোপ্লেনে উড়ি। ইচ্ছে করে ছবি আঁকা শিখি। ইচ্ছে করে আপনার মতো চ'লে যাই চীন-সীমান্তের জঙ্গলে—কিন্তু সাপের কথা মনে হ'লেই ইচ্ছাটা আর প্রবল থাকে না।'

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললে, 'আর কী-কী তোমার ইচ্ছে করে ব'লে ফ্যালো।'

'তাহ'লে শুনুন। বড়ো কিছু হবে না, কিন্তু অনেক সব ভালো-

ভালো ছোটো কাজও আছে। যেমন রান্না, শেলাই, পান সাজা ইত্যাদি। ভাবছি এগুলোতেই স্পেশলাইজ করবো।'

'খুব ভালো কথা। কাল থেকেই আরম্ভ করো। চাকর তুলে দিয়ে কোমর বেঁধে নিজেই লেগে যাও।'

এতক্ষণ একটানা কথা ব'লে বুলি একটু থামলো। সেই ছবির বইটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে বললে, 'আহা—আমি যদি একটুও আঁকতে পারতুম? আপনি পারেন আঁকতে?'

'জ্যামিতির চিত্র অতি চমৎকার আঁকতে পারি।'

খোলা বইটার একটা ছবির দিকে তাকিয়ে বুলি বললে, 'যামিনী রায়ের ছবি আপনার কেমন লাগে?'

নিরঞ্জন কুণ্ঠিত জবাব দিলে, 'ছবি-টবি আমি বিশেষ দেখিনি।'

'দেখবেন? আসুন না এখানে।' বুলি নিজের পাশের জায়গা দেখিয়ে দিলে। 'আরো দু' একটা বই আছে, দেখাতে পারি।'

এদিকে মিনির সেদিন মায়া-মন্দিরে বেশিক্ষণ থাকা হ'লো না। কাল রাবার খাওয়ার সময় উপস্থিত ছিলো না, মনের মধ্যে একটু খুঁচিয়েছে। মা, অর্থাৎ হৈমন্তী, যাতে সংসার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারেন, এ-জন্যেই কোনো-কোনো কাজের ভার সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে, এবং কাজে অবহেলা তার ধাতে নেই। সত্য, এ-সব বিষয়ে উৎসাহ তার ক'মে আসছে, কলেজও কামাই হচ্ছে প্রায়ই, নিজেকে ঈশ্বরের পায়ে সম্পূর্ণ স'পে দেবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে সে, তবু সংসার যতদিন তাকে একেবারে না ছাড়ে, ততদিন কিছুটা মেনে নিতেই হবে। অন্তত বাবা যতদিন আছেন তাঁর দেখাশোনাটা করতে হবে বইকি। হৈমন্তীকে রেখে মিনি তাই একাই চ'লে এলো। নিজেদের গাড়ি—সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই।

ইম্প্রেশনিস্টদের ছবিতে নিরঞ্জন আর বুলি এত মগ্ন ছিলো যে

বাড়িতে গাড়ি ঢোকবার আওয়াজ টের পায়নি। মিনি কোনোদিকে না তাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো, চকিতে চোখে পড়লো বসবার ঘরে যেন বুলি আর নিরঞ্জন। ধ্বক্ ক'রে উঠলো বুকের ভিতরে, এগিয়ে গিয়ে দেখলো সোফায় পাশাপাশি দু' জনে ব'সে, মাঝখানে পাতা-খোলা ছবির বই; ঝুঁকে প'ড়ে একই ছবি দেখছে ব'লে মাথা দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি। মুহূর্তে মিনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে উঠলো।

মিনি ঘরে ঢুকলো, এগিয়ে এলো, তবু ওদের তন্ময়তা ভাঙলো না। এ-ছবিটা যথেষ্ট দেখা হয়েছে মনে ক'রে বুলি যেই পাতা উল্টিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে মিনি ব'লে উঠলো, 'এই যে নিরঞ্জনবাবু, কখন এলেন?'

নিরঞ্জন চমকে চোখ তুলে মিনিকে দেখেই একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। বুলি বললে, 'আজ এত শিগগির ফিরলি যে, মিনি?'

'এলুম,' ব'লে মিনি একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। 'তারপর—নিরঞ্জনবাবু, আপনার কী খবর?'

'খবর—ভালোই।'

'সেদিনের পর আজই প্রথম এলেন?'

'কাল এসেছিলাম একবার।'

'কাল ওখানে আটকে গেলুম, নয়তো কালই দেখা হ'তো আপনার সঙ্গে।'

নিরঞ্জন এতক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠেছিলো; একটু হেসে বললে, 'বুলি আতিথেয়তার ত্রুটি করেনি।'

মিনির ঠোঁটে তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠলো।—'হ্যাঁ, বুলি আর সে-বুলি নেই। ভদ্রতা-টদ্রতা সব শিখেছে। আজ আপনাদের চা খাওয়া হয়েছে?'

'চায়ের আমার কোনো দরকার নেই। আমি এক্ষুনি উঠছিলুম—'

'আমি এলুম আর অমনি উঠতে চাচ্ছেন?' বললে মিনি।

'না—না—তা নয়—'

মিনি খুব ঘরোয়াভাবে বললে, 'বসুন, বসুন। আপনার চায়ের দরকার না থাকে, আমাদের আছে। সঙ্গে এক পেয়ালা খাবেন আরকি। যা তো বুলি, চায়ের কথা ব'লে আয়।'

'তুইও খাবি চা?'

'কেন, আমি কি চা খাই না?'

'এ-সময়ে খাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছিস। সকালে-বিকেলেও কি খেতিস—নেহাৎ মাথা ধরে ব'লে না-খেয়ে পারিস না। যা হয়েছিস তুই আজকাল!'

মিনি একটুও রাগ করলে না এ-কথায়, হেসে বললে, 'আজ ইচ্ছে করছে চা খেতে।'

বুলি বেরিয়ে যেতেই মিনি নিরঞ্জনের মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে নিচু গলায় বললে, 'সেদিন আপনাকে অযথা কতগুলো কথা বলেছিলুম। নিজের মন ভালো ছিলো না, মেজাজ ঝাড়লুম আপনার উপর। আমারই অন্যায় হয়েছে।'

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো।

'আপনি চটেছিলেন? মাঝে আসেননি যে?'

তবু নিরঞ্জন চুপ।

'যাকৃগে, ও-সব মনে রাখবেন না আর। কাল রাত্তিরে এসে আমাদের এখানে খাবেন—কেমন?'

'আচ্ছা।'

বুলি ফিরে এলো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে মিনি বললে, 'নিরঞ্জনবাবুকে কাল রাত্রে খেতে বললুম, বুলি।'

বুলি খুশি হ'য়ে বললে, 'বেশ তো।'

এর পর মিনি সেখানেই ব'সে রইলো, নিরঞ্জন যতক্ষণ না উঠলো।

* * *

এ কী! আমার এ কী হ'লো? মিনি মনে-মনে বলে। যত তোমাতে মন দিতে চাই, মন কেন ফিরে আসে? ধ্যানে বসি, এ কার মুখ ফুটে ওঠে চোখের সামনে। যাই মন্দিরে, টিঁকতে পারি না। বুঝি ও এসেছে, বুঝি ও এসেছে, পিছনে যেন দানোয় তাড়া করে। ভূতে পেয়েছে আমাকে, পাপ ঢুকেছে মনে। কী ক'রে এ-পাপ মন থেকে মুছে ফেলি কে ব'লে দেবে। ওগো, কে ব'লে দেবে? আমার হৃৎপিণ্ড আমি কি ছিনিয়ে আনবো? মরবো আমি? কেন ভুলতে পারিনে? কেন দূর ক'রে দিতে পারিনে? এ কী দাহ! এ কী জ্বালা! আর সহ্য হয় না। নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

আয়নায় নিজের ছায়া দেখে মিনি শিহরিত হয়। লাবণ্য ঝরছে প্রতি অঙ্গে। কে বলবে তাকে দেখে সে তপস্বিনী। ঐ শরীরটাই পাপ। একুশ বছরের নিটোল, মধুর দেহটাকে আঁচ্‌ড়ে-কাম্‌ড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে চুল ছেঁটে ফেলতে। বেশভূষা ছেড়ে দিয়েছে, কালোপেড়ে একটি মিলের শাড়িতেই এত রূপ। কী পাপ।

কী করি? কী করি আমি? শান্তি নেই, শান্তি নেই। জ্বলছি! পুড়ছি। প্রাণ যায়। কেন ও এলো? কেন ও আবার এলো? ঐ বুলিটা। শুনলে না কথা, আনলে ওকে ফিরিয়ে। বলেওনি আমাকে ও এসেছিলো। ঐটুকু মেয়ে, থাকে ন্যাকা সেজে, এদিকে বুদ্ধি তো পাকা।

না—আর ভাববো না এ-কথা। আমি হতভাগিনী, মা-র স্পর্শেও আমার মনের মেকি কাটলো না। আর ভাববো না। মগ্ন হবো

তাঁর মধ্যে। ডুববো। মিলিয়ে যাবো। হারিয়ে যাবো। ফুটবো ফুল হ'য়ে। আমি আর আমি নই, আমি তুমি। আমার শরীর নেই, মন নেই, ইচ্ছা নেই, তুমি ছাড়া কিছু নেই আমার। ফুটেছি ফুল হ'য়ে, ঝরছি ফুলের মতো. আমি তোমার পুজোর ফুল, আমি তোমার। তুমি ছাড়া কিছু নেই, নেই—নেই। পেয়েছি শান্তি যা ভাঙে না, যার ক্ষয় নেই, শেষ নেই, বদল নেই। পেয়েছি তোমাকে, তোমাকে দেখেছি, ছুঁয়েছি, ধরেছি। পেয়েছি শান্তি। শান্তি, শান্তি।

তবু কেন পারি না? তবু কেন জ্বলি? কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে সাপ, পেঁচিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। ঐ বুলিটা। আর পারি না। বুলি, এ তুই কী করলি?

ক্রমে এমন হ'লো যে বুলিকে পাহারা দেয়াই মিনির প্রধান কাজ হ'য়ে উঠলো। নিরঞ্জন যখন আসে, মিনি সারাক্ষণ উপস্থিত। মায়া-মন্দিরে গিয়েই ফিরে আসে। কলেজে যায়, হঠাৎ মনে হয় নিরঞ্জন দুপুরবেলাতেই এলো না তো? আবার নিরঞ্জন যেদিন আসে না সেদিনও অসহ্য লাগে। তার চোখ সব সময় বুলিকে খুঁজছে, বুলির প্রতি ভঙ্গি, প্রতি কথা, প্রতিটি তাকানো মনে-মনে সে চেরে, কাটে, ভাবে—কী না করে!

আর সহ্য হয় না।

অগত্যা বুলিও ছলনার সাহায্য নিতে বাধ্য হ'লো। দুপুরবেলায় দেখা গেলো সে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেঁটে ছাতা বগলে নিয়ে বেরুচ্ছে। মিনি জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছিস এই রোদ্দুরে?'

'যাচ্ছি সিনেমায়।'

'একাই?'

'হ্যাঁ, একাই যাচ্ছি।'

'বাবাকে বলেছিস?'

'তার জন্যে তো তুই-ই আছিস। তাছাড়া জানতে যদি চাস, বলেছি, বাবা যেতে বলেছেন।'

'বাবা তোকে যেতে দিলেন একা?'

'কেন, আমাকে কি কেউ খেয়ে ফেলবে রাস্তায়?'

মিনি বললে, 'গাড়িটা নিয়ে যা।'

'না, ট্র্যামেই যাবো। ট্র্যামে চড়তেই আমার ভালো লাগে,' বলতে-বলতে বুলি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

সিনেমার দরজায় নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে। কিন্তু সিনেমায় তারা ঢুকলো না, ঢুকলো একটা রেস্তোরাঁয়। তারপর একটু ছায়া পড়তে ময়দানে ঘোরাঘুরি ক'রে কাটালে সময়।

পরের দিন বিকেলে তাকে দেখা গেলো আবার বেরুচ্ছে। আকাশে মেঘ, হাতে তাই বর্ষাতি। চুপি চুপি নামছিলো, মিনি তাকে ঠিক ধ'রে ফেললে।

'আজ আবার কোথায় যাচ্ছিস?' জিজ্ঞেস করলে মিনি।

'যাচ্ছি একটা ফোটোগ্রাফের এগ্‌জিবিশন দেখতে। যাবি?'

মায়া-মন্দিরে ছাড়া আর কোথাও মিনি আজকাল যায় না; বিশেষ যেখানে আমোদপ্রমোদের গন্ধ তার ছায়াও মাড়ায় না। শিল্পকলাতেও উৎসাহ নেই। তবু আজ হঠাৎ মনে হ'লো গেলে হয়। মনের ভাব চেপে বললে, 'বেশি দেরি করিসনে।'

বুলি রোজই বেরতে লাগলো, এদিকে নিরঞ্জন আর আসে না। মিনির দেয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে। একদিন ধৈর্য ভাঙলো।

বুলি বেরুচ্ছিলো, মিনি একেবারে পথ আগলে দাঁড়ালো। তীব্র গলায় বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস, থাম।'

বুলির চোখ জ্ব'লে উঠলো। শান্তস্বরে বললে, 'সরো।'

'পারবিনে তুই যেতে।'

'কী বলছিস তুই ?'

'বলছি, যেতে পারবিনে। তুই যেখানে যাস, নিরঞ্জনও সেখানে যায়। যায় কিনা, বল্।'

মিনির এমন কণ্ঠস্বর বুলি জীবনে শোনেনি। বুকটা কেঁপে উঠলো।

'বল্, নিরঞ্জনও সেখানে যায় কিনা।'

বুলি কিছু না-ব'লে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। পিছন থেকে শুনলো মিনির বিকৃত কণ্ঠস্বর—'বুলি, বুলি, তুই আমাকে মেরে ফেলবি।'

শেষটায় মিনি বাবারই শরণ নিলে।

'বাবা, এ-বাড়িতে কী-সব হচ্ছে আজকাল ?'

'অনেক-কিছুই হচ্ছে। কোন্‌টার কথা বলছিস ?'

'বুলির কথা বলছি।'

'কী হয়েছে তার ?'

'বুলি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে—তুমি দেখেও কিছু দেখছো না ?'

'তাই নাকি ?'

'ও রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তা জানো ?'

'যায় নাকি ? ওকে তো সব সময়ই বাড়ি ব'সে থাকতে দেখতুম।'

মিনি উৎসাহ পেয়ে বললে, 'সেদিন আর নেই !'

'তা সব সময় বাড়ি ব'সে থাকা কি ভালো ? এ-বাড়ির কেউই তো বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে না, ওর আবার বাড়াবাড়ি ছিলো। মোটে বেরোবেই না।'

কথাটার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে মিনি বললে, 'তাই ব'লে একা-একা যেখানে-সেখানে—'

'একা না গিয়ে বেচারার উপায় কী! তুই ছিলি ওর সঙ্গী, তা তুই তো—'

অরিন্দমের মুখ থেকে কথাটা ছিনিয়ে নিয়ে মিনি বললে, 'সেজ
তোমাকে ভাবতে হবে না, সঙ্গী ও নিজেই খুঁজে নিয়েছে।'

'নিয়েছে নাকি ?'

'ওর বেরুনো আর কিছুই না—ঐ নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করার অছিলা
মিনির স্বর এত তীব্র হ'লো যে কথাটা শেষ ক'রে সে হাঁপাতে লাগলো

অরিন্দম অবাক হ'য়ে বললেন, 'কেন, নিরঞ্জনের সঙ্গে বাড়িতে
তো ওর দেখা হ'তে পারে। হচ্ছিলোও তো।'

'একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেয়—তারপর দু'জনেই সেখানে গি
জোটে। একেবারে বিলেতি নভেল!' নভেল কথাটায় মিনি অনেক
খানি ঘৃণা ঢেলে দিলে। 'এ-সব কি ভালো হচ্ছে ?'

'হয়তো ওরা একসঙ্গে সিনেমায় গিয়েছে টিয়েছে—কী বলিস ?'

'নিশ্চয়ই! সিনেমায় তো যায়ই—আর কোথায় যায় কী কে
ওরাই জানে। তুমি তো কিছু জিগেস করবে না।'

'কী ক'রে জানলি তুই ? তোকে বুলি বলেছে ?'

'যেচে কি আর বলেছে!'

জিগেস করেছিলি ?'

'করেছিলুম।'

'কী বললে ?'

'কিছুই বললে না। এর মধ্যে যদি কিছু অন্যায়ই না থাকবে তাহ'লে
ও লুকোতে চাইবে কেন ?'

অরিন্দম কিছু না-ব'লে একটা সিগারেট ধরালেন।

'তুমি এর কিছু বিহিত করবে না, বাবা ?

'কী করতে বলিস্ ?'

'বুলিকে ডেকে ব'লে দাও নিরঞ্জনের মুখ আর দেখতে পাবে না
জীবনে।'

অরিন্দম মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন।

'যদি না শোনে ?'

'শুনবে না! শুনতেই হবে ওকে!'

'তুই কি আমার সব কথা শুনিস ?'

'আমি তো কিছু অন্যায় করিনে।' মিনি প্রথমেই যে-চড়া স্বরে ধরেছিলো তা ছাড়লে না।

'বুলিও মনে করতে পারে সে কিছু অন্যায় করছে না।'

'ওর কথাই তুমি মেনে নেবে নাকি ? ঐটুকু মেয়ে—কী বোঝে ও ?'

'তোর কাছে ও ঐটুকু মেয়ে, কারণ তুই ওর চার বছরের বড়ো। আমার কাছে তোরা দু'জনেই সমান। দু'জনেই ছোটো—দু'জনেই বড়ো।'

'তাহ'লে তুমি বলতে চাও কী ?'

'ওর যা ভালো লাগে তা-ই ও করবে।'

'এই অন্যায়ের তুমি প্রশ্রয় দেবে, বাবা ?'

'না দিয়ে উপায় কী ? অত বড়ো মেয়ে—তাকে সামলাবো কেমন ক'রে ?'

'জোর ক'রে।'

'ঘরে বন্ধ ক'রে রাখবো ?'

মিনি একটু ভেবে বললে, 'দরকার হ'লে রাখবে।'

'ধর্—আমি যদি মনে করি তুইও অন্যায় করছিস ? দু'জনকেই এক ঘরে তো ?'

'বাবা, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সন্তানকে তুমি শুধু ভালোই বাসো, তার মঙ্গল চাও না। তোমার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে দাদার জীবনটা নষ্ট হ'লো, এবার তোমার প্রশ্রয়েই বুলির সর্বনাশ হবে।'

হঠাৎ অরিন্দমের সমস্ত মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। চোখের কোণেও লাল ছিটে দেখা দিলো, দু'হাতের মুঠি চেপে ধরলেন, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, হাঁ গেলো খুলে, জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চাটতে লাগলেন। চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হাতের মুঠি ছেড়ে দিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, '[illegible], তুই এখন যা।' এত আস্তে বললেন যে কথাটা প্রায় শোনাই গেলো না।

৯

উজ্জ্বলার ছেলে যে মরছে তা এখন চোখে দেখেই বোঝা যায়, ডাক্তারের কালো মুখের দিকেও তাকাতে হয় না।

সেদিন নীরদ ডাক্তারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অরিন্দম রোগীর ঘরে ফিরে এলেন। নর্সের হাতের গুণে ঘরটির পরিচ্ছন্নতা, হাসপাতালের মতোই, যেমনি অনিন্দ্য তেমনি নিরানন্দ। হাওয়ায় অ্যান্টিসেপ্‌টিক গন্ধ দরজা পেরোলেই নাকে ঢোকে। দুদিন বৃষ্টির পরে আজ রোদ উঠেছে, আকাশে শাদা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে গোল-গোল নীল। মেঝেয় লুটোচ্ছে মস্ত চারকোণা হলদে রোদের ফালি, সমস্ত ঘরটিকে আলো করেছে। আজ সকালে ঘরটি বড়োই উজ্জ্বল, সুখের বাসা হ'লে মানাতো।

ক্ষুদ্র রোগীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন অরিন্দম। নর্স চেয়ারে ব'সে ছিলো, উঠে দাঁড়ালো তাঁকে দেখে। অরিন্দম ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমুচ্ছে?'

নর্স বললে, 'মনে তো হয়।'

ঘুমোনো না জেগে, বোঝা শক্ত। সব সময়ই নিঃসাড়। তার উপর পিঁচুটিতে চোখ প্রায় বোজা। নর্স অনেক কসরৎ ক'রে আস্তে-আস্তে চোখ দুটি খুলে দেয়, আবার খানিকক্ষণের মধ্যেই বুজে আসে। বেশ মন দিয়ে তাকালে বোঝা যায় চোখের পলকগুলি পিটপিট ক'রে নড়ছে।

অরিন্দম খুব ভালো ক'রে ওকে দেখলেন। জন্ম থেকেই ও নাকি আকারে ছোটো, এখন কুঁকড়ে এইটুকু হ'য়ে গেছে। গায়ের চামড়াটার

কেমন শক্ত পোড়া-পোড়া চেহারা, যেন খোসা উঠে-উঠে যাচ্ছে। গা ভরা লাল ঘা হাঁ ক'রে আছে। খুব কাছে এলে বিবিধ ওষুধ মলম পাউডরের তীব্র মিশ্রিত গন্ধে ঠেলা মেরে দুর্গন্ধ হঠাৎ ধাক্কা মারে। মাথাটা মস্ত, চুল সবই প্রায় গেছে উঠে। মোটের উপর ওকে আর মানুষের শিশু মনে হয় না, মনে হয় ছ'মাস বয়েসের ভ্রূণ অসময়ে মাতৃগর্ভ থেকে খ'সে পড়েছে।

ট্যাঁটানিও কমেছে। ঠোঁট নড়ে মাঝে-মাঝে, শব্দ বেরোয় না। কচিৎ ক্ষীণ গোঙানি শোনা যায়, কোনো চেনা শব্দের সঙ্গেই তা মেলে না, গাড়ি-চাপা-পড়া থ্যাঁতলানো বাচ্চা কুকুর হয়তো মরবার আগে দু'একবার ও-রকম শব্দ করে। কান্না নয়, বিদ্রোহ নয়, প্রতিবাদ নয়; এ যেন শরীরের মধ্যে স্নায়ুর ছিঁড়ে যাওয়ারই শব্দ। চুপ ক'রেই থাকে বেশির ভাগ; মস্ত টেকো মাথায় বোজা চোখের স্তব্ধতায় এক-এক সময় হঠাৎ প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ব'লে ভুল হয়। কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই মুখে; সুখদুঃখের অলিগলি ও পার হ'য়ে এসেছে, পিছনে ফেলে এসেছে দিন-রাত্রির দোলা, সামনে সময়ের সীমা-ছাড়ানো সিংহদ্বার। যাকে আমরা সময় বলি, ও তা ছাড়িয়েছে, তাই ওর সুখ নেই, দুঃখও নেই।

অরিন্দমের হঠাৎ মনে হ'লো তাঁর পাশে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে দেখলেন, হৈমন্তী। কিছু বললেন না, চোখ নামিয়েও নিলেন না।

'কী বললে আজ ডাক্তার?' একটু পরে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন।

'বলবে আর কী!'

হৈমন্তী একটু চুপ ক'রে রইলেন।

'ডাক্তার যা করবার করলে তো?'

'করেছে যতটা সাধ্য।'

'এখন মা-কে একবার ডাকি ?'

'কাকে ?'

'মা-মহামায়াকে,' স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে হৈমন্তী বললেন। 'আর-কিছু না—তিনি এসে একবার শুধু দেখে যাবেন।'

'আরো যদি কাউকে দেখাতে চাও আমার আপত্তি নেই। দেখবার মতো দৃশ্য বটে।'

'আমি তাঁকে বলেছিলুম—তিনি আজ বিকেলে আসবেন বলেছেন। চারটের সময়।'

'ও, তুমি বলেছো। তাহ'লে আর আমাকে জিগেস করলে কেন ?'

'তুমি কি সে-সময়ে বাড়ি থাকবে ?'

'আমার থাকার কোনো দরকার আছে ?'

'তিনি আসছেন—তুমি না-থাকলে ভালো দেখায় না। যদি তোমার খুব অসুবিধে না হয়—'

'আমি তো বাড়িতেই আছি। কোথায় আর যাবো !'

অরিন্দম রোগীর ঘর থেকে বেরোলেন, হৈমন্তীও এলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

'তুমি তো কিছুই বিশ্বাস করো না', দরজার বাইরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে হৈমন্তী বললেন। 'কিন্তু তুমি কি জানো যে—'

হৈমন্তী মা-মহামায়ার দু'একটা অলৌকিক কীর্তির বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তাকিয়ে দেখলেন, অরিন্দম নিচে নেমে যাচ্ছেন, সিঁড়ির বাঁকে তাঁর চওড়া পিঠ আর মিহি ক'রে ছাঁটা মোটা ঘাড়টা চোখে পড়লো। পরনে সবুজ সিল্কের বর্মি লুঙ্গি, গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। একটা তীব্র চাপা রাগে কেঁপে উঠলো হৈমন্তীর শরীর। স্বামীর এই গায়ে-ফুঁ-দিয়ে-বেড়ানো শৌখিন ভাবটা আজকাল একেবারেই সইতে পারেন না তিনি। ছেলেকে তাড়িয়েছে, নাতি মরছে, তবু ঢং ত্যাখো মানুষটার। সকালে

উঠে দাড়ি কামানো, তিনবার স্নান, চার বার কাপড় ছাড়া, সকালে কফি রাত্তিরে পেগ—সবই সমানে চলেছে। রবিবারে চুল ছাঁটাও বাদ যায়নি। ঐ তো মাথার পিছনদিকে কয়েক গোছা চুল, তারই ছাঁটাই নাকি এক রবিবার বাদ যেতে পারে না। তা-ই আবার কায়দা ক'রে ফেরানো হয়, সাবান সুগন্ধের ঘটা তো লেগেই আছে। খাবার টেবিলে মাংস চাই রোজ, আর কী প্রচণ্ড ঘুম। সব মিলিয়ে মূর্তিমান তামসিকতা। এতদিন কেমন ক'রে সয়েছি, হৈমন্তী অবাক হ'য়ে ভাবলেন।

হৈমন্তী নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। নিচের যে-ঘরটায় বিয়ের আগে খোকা থাকতো, এখন যেটা বুলির পড়ার ঘর, সেখানে আছেন উজ্জ্বলার মা-বাবা, উজ্জ্বলাও আছে—স্বামী বোধ হয় সেখানেই গেলেন। ওঁরা আসবার পর থেকে তো ওঁদের সঙ্গেই সারাদিন গুজগুজ ফিসফাস চলেছে। কী এত কথা কে জানে। বেয়াই-বেয়ানকে আদর এবার উপচে পড়ছে দেখি। এমনকি এও বলেছিলেন, 'তোমার ঘরটা ওঁদের ছেড়ে দাও।' এমন অবিবেচক মানুষ—আমি আছি আমার পুজো-আর্চা নিয়ে বাড়ির এক কোণে, আমাকে বলে কিনা ঘর ছেড়ে দিতে। ঠাকুরঘরের পাশে না-থাকলে আমার যে চলে না এটুকু বুদ্ধিও নেই। হৈমন্তী কর্ণপাতও করেননি কথায়; বেয়াই-বেয়ানের সঙ্গে ভালো ক'রে কথাও বলেননি—সময় কোথায় তাঁর! তাছাড়া ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে অত অন্তরঙ্গতারই বা দরকার কী—সবটাতেই ওঁর বাড়াবাড়ি। কাল বুঝি উজ্জ্বলার একবার ফিট হয়েছিলো, নিজেই দৌড়িয়ে গিয়ে হাতের কাছে যে-ডাক্তার পেলেন ডেকে আনলেন। কী কাণ্ড! ফিটের ধাত থাকলে ফিট হবেই—তার জন্য আবার ডাক্তার ডাকে নাকি কেউ। চোখে-মুখে জল ছিটোলেই সেরে উঠতো। এ-সব আর-কিছুই না—ঢং। আসল যে,

সেই ছেলেকেই দিয়েছে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে—এখন বৌকে ভালোবাসা দেখানো হচ্ছে। পুরুষমানুষের বোকামিরও একটা সীমা থাকা উচিত।

স্বামীর সবুজ লুঙ্গি-পরা চেহারাটা হৈমন্তীর চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সাজগোজের বাহার কী। শখ আর মেটে না। যখনই দেখা হয়, চুরুট ফুঁকছেন নভেল পড়ছেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোনো ভাবনাই নেই। ছেলের জন্যে একটু মন-খারাপও তো হ'তে পারে। আর চোখের উপর ঐ নাতিটা। বয়েস বাড়লে ভোগ-বিলাসে আসক্তি এমনিই ক'মে আসে মানুষের—তার কোনো লক্ষণই নেই। এ-বিষয়ে কথা উঠলে আবার বলা হয়—'আমার না পড়েছে দাঁত, না হয়েছে ডিসপেপ্‌সিয়া কি ব্লাড-প্রেশার—সবই খেতে পারি, সবই হজম করতে পারি—আমার কেন আসক্তি কমবে।' কথার ছিরি কী। কত সব বড়ো-বড়ো লোক মা-র ভক্ত হয়েছেন—তাঁরা সকলেই যেন দাঁত-পড়া ডিসপেপটিক! ভাবখানা এই, তিনিই যেন একমাত্র শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক, আর সকলেই মূঢ়! নিজে যখন বোঝেন সেটাই ঠিক, আর কারো কথা কানে তোলবার মতোই নয়! এই আত্মম্ভরিতাই তাঁর মহৎ দোষ। অনেকদিন আগে, হৈমন্তী যখন মায়া-মন্দিরে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন মাত্র, খাবার টেবিলে ব'সে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তোমার খাওয়া দেখেই বোঝা যায়, মন্তী, যে ধর্মের পথ তোমার পথ নয়। আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপানই যে ডিসপেপসিয়া।' ঠাট্টা, বিদ্রূপ, টিটকিরিতেই জিভখানা শানানো, একটা ভালো কথা মুখে নেই। কত সময় কত যাচ্ছেতাই কথা বলেন, জিভে তো লাগাম নেই, কিন্তু সব কথার মধ্যে এ-কথাটাই হৈমন্তীর বিশেষ ক'রে মনে আছে—'আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপানই ডিসপেপসিয়া।' বেশ তো—খাওয়া ছাড়তে কতক্ষণ, আমি কি ওঁর মতো কামাতুর জীব! আমিষ আহার প্রায় ছেড়েছেন, রাত্তিরে তো একটু দুধ আর ফল-টল ছাড়া কিছু খানই

না। প্রথম-প্রথম কষ্ট হ'তো, কিন্তু অভ্যেসের দাস হ'য়েই যদি জীবন কাটাবেন তবে আর এই ঐশ্বরিক করুণা কেমন ক'রে নামবে তাঁর জীবনে? লোভ জয় করতে পারলে তবে তো মানুষ! এখন তো অল্প খেয়েও—অনেক-কিছু না-খেয়েও—বেশ চ'লে যাচ্ছে। এ তো খুবই সত্য যে বাঁচবার জন্যেই আমরা খাই, খাওয়ার জন্যে বাঁচি না। স্বামী যখন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দারুণ উৎসাহে খেতে থাকেন, উৎকট মুখভঙ্গি ও কড়মড় শব্দ সহযোগে মাছের মুড়ো কি মাংসের হাড় চিবোন, দৃশ্যটা দেখতে পর্যন্ত গা-বমি-বমি করে। ঘোর তামসিক। ঘোর তামসিক।

বয়েসের জন্যে না হোক্‌, দুঃখে-শোকেও মানুষ বদলায়। একটি প্রিয়জনের মৃত্যু কত জাঁদরেল নাস্তিকের উদ্ধত মাথা নুইয়ে দিয়েছে তাঁর পায়ের ধুলোয়। রোগ যখন কিছুতেই সারে না, ডাক্তার শুধু মাথাই নাড়ে, তখন কালিঘাটে তারকেশ্বরে হত্যে না দেয় এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখলুম না।

আমি তো ও-সব কিছুই করিনি—ও-সবের দরকারই বা কী। গতজন্মের কত পুণ্যফলে তাঁর দেখা পেয়েছি, যিনি জাগ্রত দেবী। আর-কিছু মানি না, জানি না, বুঝি না। কালিঘাট তারকেশ্বর পুরী বৈদ্যনাথ সব ওখানে এসে মিশেছে। গ্রাম্য অশিক্ষিত স্ত্রীলোক তো নই যে অন্ধ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে আছি। তাঁকে দেখেছি ছুঁয়েছি চিনেছি, জীবন সঁপেছি তাঁকে, যে-আনন্দ তাঁর মধ্যে, সে-আনন্দ আর কোথাও নেই। আগে কোনোদিন তা জানিনি বুঝিনি ভাবিনি। জন্মান্তর হয়েছে আমার তাঁর স্পর্শে। নতুন হয়েছি আমি, পুরোনো আমি-কে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছি। এক জন্মেই জন্মান্তর যিনি ঘটাতে পারেন, সব পারেন তিনি, কমলকে বাঁচাতেও পারেন। শেষ আশা তিনিই। তবু—এখনো—স্বামীর মুখ দিয়ে একটা ভদ্র কথা বেরুলো না! ডাক্তার কী ছাই কথা শুনিয়েছে, তা-ই

আঁকড়ে রয়েছেন। ছুঁচ ফুটিয়ে-ফুটিয়েই মেরে ফেললো ছেলেটাকে। অনায়াসে বিশ্বাস করলেন অরুণের অসুখই কমলের বর্তেছে। কী কুৎসিত কথা—ভাবতেও ঘেন্না করে। ও-সব পচা অসুখ আবার ভদ্দরলোকের হয় নাকি? আর তা-ই যদি হবে, তাহ'লে অরুণ অমন সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে কেমন ক'রে? রোগে ধরলো যাকে তার কিছু হ'লো না, মরলো কিনা তার সন্তান! এ-সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করতে তো বাধে না কোথাও, অথচ মা-মহামায়ার নাম মুখে আনতে যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। কী হবে এ-সব মানুষের?

হৈমন্তী মানুষটা আবেগপ্রবণ। তার উপর মেজাজ ছেলেবেলা থেকেই রানির মতো। ধনীর একমাত্র কন্যা, বিয়েও হ'লো বড়ো চাকুরের সঙ্গে, তাঁর তুচ্ছতম ইচ্ছাটিও কখনো অপূর্ণ থাকেনি। প্রেমিক স্বামী, সুস্থ সুন্দর সন্তান, তাছাড়া শাড়ি বাড়ি আসবাবপত্র ভ্রমণ—সব মিলিয়ে যৌবনের দিনগুলি ছিলো কানায়-কানায় ভরা। এমন ভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়, সকলেই বলেছে। ভাগ্যের প্রধান খুঁটি স্বামী, স্বামীর অসামান্য ভালবাসা। স্ত্রৈণ অপবাদ জুটেছিলো অরিন্দমের। চোখের আড়াল করতে পারতেন না, দু'দিনের জন্য মফঃস্বলে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সমবয়সিনীরা ঠাট্টা ক'রে বলেছে—'অমন আঁচল-ধরা কেমন ক'রে করলি? তোর মন্ত্রটা বল্ না আমাদের, চেষ্টা ক'রে দেখি একবার।' হৈমন্তীর নিজের কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে ভাগ্য তাঁর উপর বিশেষরকম প্রসন্ন। সহজেই সব মেনে নিয়েছিলেন, কারণ এ ছাড়া আর-কিছু তাঁকে মানায় না, সুখী হ'তেই তিনি জন্মেছেন। দু'হাতে লুঠ করেছেন জীবনের ঐশ্বর্য; ছড়িয়েছেন, ছিটিয়েছেন, মনে হয়েছে তাঁকে সুখী করার জন্যেই পৃথিবীতে এত রকমের জিনিস, মনে হয়েছে এ-বিশ্বে তাঁর ইচ্ছাই চরম শক্তি। মত্ততা ছিলো দাম্পত্য জীবনে, সংসার পালনে, ছিলো ইচ্ছার অবাধ ব্যবহার। স্বামীকে

আচ্ছন্ন ক'রে ছিলেন, আশে-পাশের সকলের উপরেই ছিলো নিঃসংশয় কর্তৃত্ব। সমস্ত জীবনটাই নেশার মতো লাগতো। সে-নেশা এমন যে অন্য-কোনো চর্চাকে কাছে আসতে দিতো না। ভরাসুখের সংসারের বাইরে যে মস্ত বড়ো জগৎ নানা কর্মে নানা উৎসাহে নানা উদ্দেশ্যে আন্দোলিত হচ্ছে তার সংস্পর্শে আসেননি কখনো, বাইরের কোনো ব্যাপারে কোনো কৌতূহলই বোধ করেননি। শুধু বেঁচে থাকতেই এত ভালো লাগতো যে কোনো উত্তেজনা, আমোদ কি নিছক সময় কাটাবার উপকরণও বাইরে খুঁজতে হ'তো না। বই পড়েছেন খুব কম, সিনেমাতেও মন টানেনি। গান্ধির হুজুগে সমস্ত দেশে যখন হুলুস্থুল, তখনো তাঁর মন সাড়া দেয়নি, মনে হয়েছে—আমার এতে কী? তাঁরা যখন মান্দ্রাজে রবীন্দ্রনাথ একবার এলেন। কত সভা হ'লো, শহরসুদ্ধ লোক ছুটলো কবিকে দেখতে, শুধু তিনি গেলেন না। একবার—তখন তাঁরা দিল্লিতে—বড়োদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে শিশির ভাদুড়ীর কয়েকটা নাটক দেখেছিলেন স্বামীর একান্ত গরজে। ভালো লেগেছিলো, কিন্তু এমন মনে হয়নি যে না-দেখলে কোনো লোকশান হ'তো। এ থেকেই বোঝা যাবে যে একদিক থেকে তাঁর জীবন যেমন ছিলো নিজের মধ্যেই আশ্চর্যরকম সম্পূর্ণ, অন্যদিক থেকে ছিলো অন্ধ ও ক্ষুদ্র।

উত্তরচল্লিশে স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান একটি সঙ্কটের কাল যখন আসন্ন, যৌবন জীবনে যে-নেশা ধরিয়েছিলো তা ভাঙে-ভাঙে, এইরকম সময়ে হৈমন্তী প্রথম বাইরের কোনো ঘটনার সংস্পর্শে এলেন। সে-ঘটনা মা-মহামায়া। সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের সমস্ত জগৎটা, যার সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানতেন না, মা-মহামায়ার মধ্যেই যেন রূপ নিলে। তাঁকে সুখী করবার জন্যেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়নি, তা ছাড়া আরো আছে, আরো অনেক-কিছু আছে, এ-অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম। অবাক হ'য়ে দেখলেন এমন জায়গাও আছে যেখানে তাঁর ইচ্ছাই চরম নয়; এমন

মানুষও আছে, যার কাছে দাঁড়ালে নিজেকে আর কর্ত্রী মনে হয় না, ক্ষুদ্রই মনে হয়। ভারি চমক লাগলো। নানারকম নতুন অনুভূতি ও উপভোগের দরজা যেন খুলে যেতে লাগলো একে-একে। কখনো ভাবেননি যে-সম্ভোগের মধ্যে এতদিন ডুবে ছিলেন তার বাইরেও এমন আনন্দ আছে। এতদিনে মনে হ'লো সত্যি তাঁর ভাগ্য ভালো, তাই তো এই মূর্তিমতী দেবীর দেখা পেলেন। স্বামী ভালোবাসবেন সে তো জানা কথাই, কিন্তু ঈশ্বরের করুণা এত লোক থাকতে আমার উপরেই যে ঝরবে এ কি কখনো ভেবেছিলাম! মা-মহামায়ার কথা শুনতে-শুনতে হৈমন্তী রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলেন। চোখের উপরেই তো দেখছি অজ্ঞ, অশিক্ষিত নিতান্ত সাধারণ এক স্ত্রীলোক—অথচ কী তাঁর শক্তি যে চুম্বকের মতো কাছে টেনে আনেন, যত দেখি ততই দেখতে ইচ্ছা করে, যত শুনি মনে হয় আরো শুনি। বয়েসে, শিক্ষায়, অন্য সব রকম যোগ্যতায় যে আমার ছোটো, তার কাছে ছোটো হ'তে এত ভালো লাগে কেন আমার, যে-আমি কারো কাছে কোনোদিন ছোটো হইনি? উঁচু মাথাটাকে ঐ দুটি পায়ের উপর লুটিয়ে দিতে কেন ভালো লাগে? আর এ-ভালো-লাগাও সম্পূর্ণ নতুন রকমের, এর স্বাদ আগে তিনি কখনো জানেননি। এতদিন কিসের মধ্যে ছিলেন! কোন্ অন্ধকারে! এতদিন যা করেছি তা তো শুধু বয়স্ক লোকের পুতুলখেলা, এইবার সত্যি-সত্যি বাঁচবো। নতুন এক জগৎ আবিষ্কার করলেন হৈমন্তী, তার রহস্যের সীমা নেই, আনন্দের অন্ত নেই, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অবরোধ থেকে হঠাৎ একটা মস্ত বড়ো মুক্তির মধ্যে প'ড়ে গিয়ে যেন হাঁপাতে লাগলেন। বাঁচা কথাটার মানেই গেলো বদ্‌লে, তুচ্ছ হ'য়ে গেলো এতদিন যা-কিছু ছিলো মূল্যবান।

জীবনের পুরোনো নেশা কেটে গিয়ে হৈমন্তীকে নতুন নেশায় ধরলে। স্বামীর অনুপস্থিতি সাহায্য করলো। স্বাভাবিক ভাবাবেগ নতুন পথে

ছুটলো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। শুধু যে পথটা নতুন তা নয়, জীবনে একটি ছাড়া যে দুটি পথ আছে এ চেতনাও নতুন। মনে হ'লো মা-মহামায়াই তো আমাকে বাঁচালেন, নয়তো সারাটা জীবনই হয়তো সংসারে ডুবে থাকতুম। তাঁর কাছে এসে সকলেই বেঁচে যেতে পারে, সকলে আসে না কেন? অনেকেই আসে, কিন্তু তার চেয়ে সংখ্যায় কত বেশি যারা খোঁজই রাখে না, কি খোঁজ পেয়েও উদাসীন। এ কী আশ্চর্য যে এমন অমৃত-উৎস হাতের কাছে পেয়েও লোকেরা দলে-দলে ছোটে অন্য দিকে! হৈমন্তীর অসহ্য লাগে। আবার কতগুলো লোক আছে যারা নিজেদের পাপ মন দিয়ে সব বিচার করে, যা-কিছু এই খাওয়া-পরার জগতের ঊর্ধ্বে তাকেই অশ্লীল বিদ্রূপ ক'রে ক্লেদাক্ত সুখ পায়। কত জঘন্য কথাই কানে আসে! কিন্তু কী এসে যায়, দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণের বাইরে কুত্তার দল যদি চ্যাঁচায়? আগে এদের প্রতি গভীর অবজ্ঞা ছিলো হৈমন্তীর, এখন নেশা যতই চড়ছে ততই অবজ্ঞা ঠেলে উঠছে তীব্র বিদ্বেষ। মা-মহামায়া সম্বন্ধে যে-লোক অবিশ্বাসী, এমনকি উদাসীন, তাকে ভালো চোখে দেখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এদিকে স্বয়ং স্বামী ঘোর অবিশ্বাসী, বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্বামী? ও তো একটা কথা মাত্র। ঐ কথাটার উপর বহুযুগের অন্ধ মহিমা জ'মে এমন হয়েছে যে তার ফাঁক দিয়ে মানুষটাকে আমরা প্রায় দেখতেই পাইনে। স্বামী দেবতা, এত বড়ো একটা মিথ্যার জন্ম দিয়েছিলো নিশ্চয়ই সেই পুরুষ শাস্ত্রকাররা যারা সমস্ত অধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করেছিলো। দেবতা দেবতাই—তিনি কোনো মানুষ নন, যদিও মানুষের রূপে মাঝে-মাঝে দেখা দেন। স্বামী তিনিই যিনি সহধর্মী। স্ত্রীকে সহধর্মিণী হ'তে হবে, আর স্বামীই বুঝি স্ত্রীর বিপরীতগামী হ'তে পারবেন? তা হয় না; যতদিন দু'জনের ধর্ম এক, ততদিনই স্বামী-স্ত্রী নাম সার্থক। ধর্মে বিচ্ছিন্ন হ'লে জীবনেও বিচ্ছেদ আসবে,

আসতে বাধ্য। পতি-পরম-গুরুর দিন আর নেই, সকলেরই চোখ ফুটেছে, সকলেই বুঝেছে সংস্কারের চেয়ে ধর্ম বড়ো। অন্তত হৈমন্তী বুঝেছেন।

মা সর্বদাই বলেন, যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে যাবি না, তাদের সঙ্গে কথা বলবি না, কারো সঙ্গে তর্ক করবি না কখনো। তর্কে মনে কলুষ ঢোকে। যাকে ওরা যুক্তিতর্ক বলে সেটাই মানুষের শয়তানি বুদ্ধি। ছাখ না সায়েবদের দেশে ওদের বিজ্ঞানই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেছে সর্বনাশের পথে। দানবশক্তির তেজে ওরা ভেবেছিলো সব পারে, এখন দেখছে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া কিছুই পারে না। আমাদের দেশ সর্বদা চেয়েছে কল্যাণকে, মঙ্গলকে, ধ্রুবকে, মেনে নিয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, বিশ্বাস ক'রে শান্তি পেয়েছি। তর্কের মারপ্যাঁচ এসেছে বিলেত থেকে জাহাজে চ'ড়ে; ও-সব বুলি যারা আওড়ায় তারা নিজেরাও জানে না কী বলছে। আমি তো তর্কে আগে থেকেই হেরে ব'সে আছি। মূর্খ আমি, তর্ক জানিনে। বিশ্বাস যদি করিস তবে আয় আমার কাছে। বিশ্বাস কর্—আর সব আপনিই হবে।

মা আরো বলেন—পাপ বলতে কী বুঝিস? শরীরের প্রবৃত্তি কি পাপ? তাই যদি হবে প্রবৃত্তিগুলি তিনি দিয়েছেন কেন? ঐ প্রবৃত্তির তাড়নাতেই তো মানুষ মিথ্যে বলে, মিথ্যে করে, নেশায় পচে, চুরি করে, ছুরি চালায়। যীশু বুদ্ধ চৈতন্য কত অবতার এলেন, এ-সব অন্যায় তো দূর করতে পারলেন না। কেমন ক'রে পারবেন—এও যে তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। তিনি যেমন তাঁর নিজের লীলায় বন্দী, তেমনি প্রবৃত্তি থেকেও মানুষের মুক্তি নেই। প্রবৃত্তি যত অন্যায়ের জন্ম দেয় সে-সব থাকবে চিরকাল। মানুষ লোভ করবেই, রাগ করবেই, ঈর্ষা করবেই। সব মানুষ সংযমী হয় না, প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখতে পারে লাখে ক'টা লোক? অন্যায় এগুলো, কিন্তু পাপ নয়। আমরা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সাজি, বিচার করি, ভাইকে জেলে পাঠাই,

তিনি যদি কিছু নাও বলেন, তবু তাঁর নাস্তিক উপস্থিতিই বিঘ্ন ঘটায়। মনের প্রশান্তি অকারণে নষ্ট হয়। ভ্রষ্ট হয় চিন্তা। এই বাড়িতে যে-একটি মধুর শান্তি তিনি রচনা করেছিলেন স্বামীর স্থূল হাত লেগে ভাঙলো তা। দিনে-দিনে তাঁর চারদিকে স্থূলতা হবে আরো প্রকট; সে-প্রতিকূল হাওয়ায় তিনি নিঃশ্বাস নেবেন কেমন ক'রে? এমনও হ'তে পারে যে একদিন স্বামীর পশু-প্রবৃত্তি দুর্দম হ'য়ে উঠলো; তিনি এলেন জোর ক'রে দাম্পত্য অধিকার খাটাতে! কী বীভৎস! কথাটা ভাবতেও হৈমন্তীর সমস্ত শরীর ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠলো।

যা-ই হোক্, আর দিন দশেক পরেই তিনি ফিরে যাচ্ছেন নাগপুর— আপাতত নিশ্চিন্ত। আবার গ'ড়ে তুলবেন শান্তি। মগ্ন হবেন ধ্যানে। মুক্তি তাঁকে ডেকেছে, দ্বিধার আর সময় নেই। যে-আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছেন মিথ্যা তার কাছে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। শব্দ গন্ধ স্পর্শ সব মিথ্যা। বুদ্ধি লজ্জিত। এত ঐশ্বর্য তাঁর, এই দরিদ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে কি ধরা যায়? যাবো ইন্দ্রিয়ের ওপারে, নিজের মধ্যে দিনে-দিনে সেতুবন্ধ রচনা করবো। স্বামী যদি অন্তরায় হন, ছাড়তে হবে স্বামী। শ্রীরাধারও স্বামী ছিলো। কিন্তু বাঁশি বাজলো, উতল হ'লো যমুনাজল, ভেসে গেলো সমাজ সংসার সমস্ত জীবন। বাঁশি বেজেছে। আর তো আমার উপায় নেই।

স্বামী চ'লে গেলে আবার সব সহজ হবে। অন্য সব চিন্তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে নিঃশেষে দিতে পারবেন মা-র চরণে। কেউ আর বাধা দেবে না। ছেলে যা খুশি করুক্, মেয়েরা যেমন খুশি হোক্— আমার তাতে কী? যে যার অদৃষ্ট নিয়ে জগতে আসে, আমরা মিছিমিছি ছটফটিয়ে মরি। মিনির জন্যে কোনো ভাবনা নেই, আর বুলি এবার ওর বাপের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে তো যাক্ না। যাওয়াই ভালো; ও বড়ো অবাধ্য হ'য়ে উঠছে, কারো সঙ্গে বকাবকি-ঝকাঝকি

করার সময় আমার আর নেই। ইচ্ছাও নেই। মিনি সেদিন কী-সব বলছিলো—বুলি নাকি কোন ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্বামী জেনে-শুনেও কিছু বলছেন না। এ-সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর নেই—বাপ যা খুশি করুন মেয়েকে নিয়ে। আর অরুণ। শুনতে পাই অরুণ উচ্ছন্নে গেছে, একেবারে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু ও যে একেবারে পতিত নয় তা তো চোখের উপরেই দেখলুম। ওর মধ্যেও ভক্তি ছিলো কে জানতো! যে-ছেলে নাকি ব্যভিচারেই মগ্ন সে দেখি এখন মা ছাড়া কিছুই জানে না। কী আশ্চর্য! ভক্তিতে কী না হয়, পাষাণ গলে, শিষে হয় সোনা। তিনি টেনেছেন অলক্ষ্যে ব'সে, ঠিক এসে ধরা দিয়েছে। কী আশ্চর্য! আর আমরা কিনা শাসন করি, চ্যাঁচাই, বাড়ি থেকে তাড়াই! আমরা যে কিছুই পারি না এটা বুঝতে পারাই আসল পারা।

সব অন্যায়ের ক্ষমা আছে, মুক্তির আশা আছে, নেই শুধু অবিশ্বাসের। অরুণকে আর স্বামীকে পাশাপাশি দেখেই তা বোঝা যায়। মা-র কথা কি কখনো ভুল হয়!

অবিশ্বাস পাপ।

ছেলেটা যদি মরে, ঠাকুরদার এই পাপেই মরবে। মা কি পারেন না ওকে বাঁচাতে? নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস চাই। কোনোখানে, কারো মনে, এতটুকু অবিশ্বাস থাকলেও বিঘ্ন হয় শক্তির উদ্বোধনে। হয়তো ব্যর্থ হয় শক্তিপ্রয়োগ। আমি কিছু পারি, আমি কিছু বুঝি এ-ধারণা নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারলে তবে তো পাওয়া যায় তাঁকে যিনি একা অযুত অক্ষৌহিণীর বেশি। মনে নেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তিনি যতক্ষণ এক হাতে কাপড় আঁকড়ে অন্য হাত উপরে তুলে কৃষ্ণকে ডাকছিলেন ততক্ষণ তাঁর সখা চুপ ক'রেই ছিলেন; কিন্তু একেবারে নিরুপায় হ'য়ে কাপড় ধ'রে রাখবার শেষ চেষ্টা যেই তিনি

ছেড়ে দিলেন, দু'হাত তুলে ডাকলেন সখাকে, তখনই অফুরন্ত বস্ত্র দ্রৌপদীকে জড়ালো, লজ্জিত হ'লো সে-ই, লজ্জা দিতে যে চেয়েছিলো। সব যিনি পারেন তাঁকে পেতে হ'লে আমি যে কিছু পারি এটা একেবারেই ভুলতে হয়। স্বামীর মন ভরা আত্মম্ভরিতা, অবিশ্বাস; হয়তো তাঁর অশুভ প্রভাব এত প্রবল হবে যে মা-র দিব্যশক্তি সম্পূর্ণ জাগবে না, কি জাগলেও কার্যকরী হবে না। ছেলেটা মরবে।

হৈমন্তী রীতিমতো চিন্তিত বোধ করলেন।

চিন্তার আরো একটু কারণ ছিলো। খোকা আজ বাড়ি আসবে মা-র সঙ্গে, সে-কথা স্বামীকে জানানো হয়নি। ছেলেকে দেখে আবার কিছু-একটা কাণ্ড না করেন—যে আসুরিক রাগ শরীরে। চাইকি মা-কেই কিছু অসম্মান ক'রে ফেললেন। খোকা আসুক, এও মা-রই ইচ্ছা। কাল হৈমন্তী যখন গিয়ে বললেন, 'কমল বুঝি আর বাঁচে না, তুমি একবার চলো মা', মা তক্ষুনি রাজি হ'লেন। 'আচ্ছা, কালই যাবো।' একটু পরে বললেন, 'অরুণকেও নিয়ে যাবো—কী বলিস?'

হৈমন্তীর মতে, স্বামী যতদিন আছেন খোকার অজ্ঞাতবাসই ভালো। ওর বর্তমান ঠিকানা স্বামীর না-জানাটাই সব চেয়ে দরকারি, আর-সব পরের কথা। কমলকে একবার দেখতে চায়, বেশি রাত্রে লুকিয়েও দেখে আসতে পারে, সে-ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু স্বামী যদি জানেন যে ও এখন মায়া-মন্দিরে আছে, এমনকি মা-র একজন প্রধান ভক্ত হ'য়ে উঠেছে তাহ'লে তাঁর মনের উপর ঠিক কী-রকম প্রতিক্রিয়া হবে তা কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। হৈমন্তী তাই বললেন, 'যা তুমি ভালো বোঝো।'

'হ্যাঁ, ওকে নিয়েই যাবো। বাপের উপর রাগ ক'রে কতদিন আর থাকবে!'

'কিন্তু উনি যে-রকম মানুষ—'

'পাগল! ওঁরও কি আর রাগ আছে এতদিনে! কী কষ্ট পাচ্ছেন মনে-মনে আমি তো বুঝি।'

'কিন্তু, মা, তোমার সঙ্গে ওকে দেখলে—'

'কী, চ'টে যাবেন? আমাকে পছন্দ করেন না বুঝি একেবারেই?'

হৈমন্তী মাথা নিচু ক'রে বললেন, 'সব বলবো, মা, একদিন।'

'বলতে হবে না তোর, আমি বুঝেছি। ধর, খুব চ'টেই গেলেন—কী আর করবেন? বড়ো জোর আমাকে গালমন্দ করবেন, এই তো?'

হৈমন্তী শিউরে উঠলেন।

'তাতে আর কী হবে—কত লোকই তো আমাকে কত কিছু বলছে! অন্যেরা না-হয় আড়ালে বলে, তোর স্বামী না-হয় মুখের উপরে বলবেন। ভালোই তো।'

'সে আমি কানে শুনতে পারবো না, মা।

মা-মহামায়া আস্তে একটু হাসলেন।

'কেন তোরা আমাকে এত ভালোবাসিস বল্ তো? কী আছে আমার? বুঝেছি, পাছে কোনোরকম চটাচটি হয় তাই তুই ভাবছিস? ভয় নেই তোর—যত বড়ো বাঘা লোকই হোন, আমাকে তিনি কিছু বলবেন না, দেখিস। ছেলেকে দেখে মনে-মনে খুশি হবেনই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

হৈমন্তী গভীর একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি যা বলো তা হ'তেই হবে।'

'অরুণের কথা আগে ওঁকে বলিসনে কিন্তু। দেখি, এ-সব গোলমাল মেটানো যায় কিনা। বেচারা অরুণ! ওরই কি কম কষ্ট। হাজার হোক, নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে—'

হৈমন্তী প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'ভাগ্যে বাড়ি-ঘর ছেড়েছিলো, মা, তাই তো তুমি ওকে নিলে। ধন্য হ'লো জীবন।'

সেই রাত্রে মা-মহামায়া অরুণকে বললেন, 'তোর ছেলের অসুখ বড্ড বেড়েছে, জানিস ?'

অরুণ বললে, 'তা-ই নাকি ?'

'ডাক্তার নাকি বলছে আশা নেই।'

অরুণ কিছু বললে না।

'কাজে-কাজেই আমি কাল যাচ্ছি ওকে দেখতে। ডাক্তার যখন জবাব দেয় তখনই তো আমার ডাক পড়ে। কেন ডাকে বল্ তো ? আমি কি মানুষ বাঁচাতে পারি ?'

'তুমিই জানো।'

'সত্যি বলতে, পারি না। অথচ লোকে ভাবে পারি। রোগী আপনিই সেরে ওঠে তো আমারই জয়, আর না যদি বাঁচে তাহ'লেও ওরা ভাবে ওদেরই কোনো দোষে এ-রকম হ'লো। ভারি মজা।'

মা-মহামায়ার এই ধরনের মন-খোলা কথাবার্তায় অরুণ এতদিনে বেশ অভ্যস্ত হয়েছিলো। অন্য সকলের কাছেই ইনি দেবীর মুখোশ প'রে থাকেন, শুধু তার কাছে এসেই মুখোশ ফেলেন খুলে, শুধু তাকেই দেখতে দেন তাঁর মানুষের মুখ। অরুণ মনে-মনে ভেবে দেখেছে সে-মুখ অতুলনীয়। মেয়েমানুষ দেখতে তো কম দ্যাখেনি, কিন্তু এমন একটি সুন্দর মুখ কখনো চোখে পড়েছে ব'লেই মনে হয় না। সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু সুন্দরীরা হার মানে। বয়েস এমন কম হ'লো না, কিন্তু শরীরের গড়নটি এখনো নিখুঁত। কখনো-কখনো মনে হয় ষোলো বছরের মেয়ে। রাধা যখন সাজেন, বৈষ্ণব কবিদের বর্ণনার সঙ্গে যেন হুবহু মেলে। মোটের উপর, প্রকৃতই মনোহারিণী। এত যে ভক্ত জুটেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবু এঁর কতটুকুই বা জানে তারা যারা সন্ধেবেলায় লীলামঞ্চে ভিড় করে! আসল মানুষটা দেখা দিলো, দেশে এত লোক থাকতে, এক অরুণের কাছে। কথাটা ভাবতে

বেশ একটু গর্ব হয় তার মনে। নিশ্চয়ই ইনি তাকে দেখেই বুঝেছেন যে তার মতো চালাক ছেলের কাছে ও-সব জারিজুরি খাটবে না, প্রথম থেকেই তাই নিজের সত্যিকার চেহারাটাই তাকে দেখিয়েছেন। এমন মন খুলে আর কারো সঙ্গে কি তিনি কথা বলেন? কারো সঙ্গে না। ছোটো ঘরটিতে লুকিয়ে অনেক কথাই তো সে শোনে। আর সকলের কাছেই যিনি দেবী, শুধু তার কাছেই তিনি মানুষ, কারণ তিনি যে মানুষই তা ধ'রে ফেলতে তার মুহূর্তও লাগতো না। নিজের বুদ্ধির এত বড়ো একটা প্রমাণ পেয়ে অরুণ মনে-মনে খুশি।

দেবী না-হয় না-ই হ'লেন, মানুষটিও কিছু কম নন্। বরং মানুষ হিসেবেই বেশি ভালো। যাকে বলে চার্ম! নেহাৎই মরীয়া হ'য়ে অরুণ এখানে এসেছিলো, ভেবেছিলো অবতার জাতীয় জীবের পাল্লায় প'ড়ে কত লাঞ্ছনাই যেন সইতে হবে, অবাক হ'য়ে গেলো। এত সহজ মানুষ নাকি বিখ্যাত মা-মহামায়া! যা মনে আসে তা-ই বলেন—অন্তত তার কাছে তো। আর কাউকে বোধ হয় তিনি ছাখেননি যার কাছে এমন মন খুলে কথা কওয়া যায়। সামান্য কয়েকটা টাকা যাদের কাছ থেকে নিয়েছে তারা আজ তার নামে কতরকম কুৎসাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ ইনি তো দেখেই বুঝতে পারলেন সে রীতিমতো একটা উঁচুদরের মানুষ। নয়তো এত সহজ হবেন কেন তার কাছে। ইনিও তাঁকে খারাপ ব'লেই জানতেন, অথচ তার কাছেই কোনো ভাণ রাখলেন না। নাক-উঁচু ভাব নেই, শাসনের ভঙ্গি নেই,—সত্যি যেন কতকালের বন্ধু। নয়তো এই একটি ঘরে বন্দী হ'য়ে টিঁকতে পারতো নাকি অরুণকুমার! সব চেয়ে যা ভালো লাগে, কোনোরকম প্রেজুডিস নেই। নীতিবাগিস নন, কপি-বুক্-মলার্স-এর ধার ধারেন না। সিগারেট তো চাইতেই জুটলো, কিন্তু শুধু সিগারেটে চলতো না। কয়েকটা দিন যেতেই খোঁয়ারির ঘোর যখন ছুটলো অদম্য হ'য়ে উঠলো

তৃষ্ণা। সন্ধেটা আর কাটে না, বিশেষত, ঐ সময়টাতেই মা-মহামায়ার সঙ্গ থেকে একটানা ঘণ্টা পাঁচেক সে বঞ্চিত। বড়ো একা লাগে, ডন জুয়ানে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় মনে পড়ে। বেরিয়ে যেতো, কিন্তু পকেটে কিছু নেই। শূন্য পকেটেও যেতো বেরিয়ে, কারণ ধার নিয়ে যার ফেরৎ দিতে হয় না, কলকাতার মতো বড়ো শহরে দু' চারটাকার জন্যে তার আটকাবার কথা নয়। তাছাড়া ঐ নয়ানগড়ের পিঁপেটাকে একবার ধরতে পারলে তো কথাই নেই। তবু—মহামায়ার আদেশ, আমাকে না-ব'লে কোথাও যাবিনে। অমান্য করতে একটু ভয় হ'লো, কারণ বাবা যতদিন আছেন এ-আশ্রয় হারাতে চায় না। এদিকে তৃষ্ণা অসহ্য। কী আর করে—অগত্যা একদিন বাবা-মহাদেবেরই শরণ নিলে। কৈলাসে সব রকম ব্যবস্থাই আছে—তবে সবই স্বদেশি। 'মা যেন টের না পায়, বাবা, মুশকিলে পড়বে।' অরুণ হেসে উঠলো।—'মা তোমারও মা নাকি?' চোখ বুজে বাঁশ-চেরা গলায় বললেন মহাদেব, 'বিশ্বের জননী তিনি। ...আজ আর না। যাও এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ো গে।'

কিন্তু ধরা প'ড়ে গেলো। মা-মহামায়া গন্ধেই টের পেলেন।

'কী খেয়েছিস?'

হুইস্কির তৃষ্ণা দিশিতে মিটিয়ে অরুণের এমনিতেই মেজাজ খারাপ হ'য়ে ছিলো, একটু শাসনের স্বর শুনেই খেঁকিয়ে উঠলো, 'মদ খেয়েছি। মদ। বুঝলে?'

'কোথায় পেলি?'

অরুণ নেশার ঝোঁকে ব'লে উঠলো, 'তোমার ঐ হনুমান স্বামীই দিয়েছেন। যাও এখন—বিরক্ত কোরো না, কালই আমি স'রে পড়বো। মদ না-খেয়ে এখানে প'ড়ে থাকে কোন শালা!'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথন তার মনে পড়লো। লজ্জা তার চরিত্রে আর নেই, তার বদলে আছে

শুয়োরের মতো গোঁয়ারতুমি, অর্থাৎ একটা লম্বাচৌড়া রকমের ড্যাম-কেয়ার ভাবই তার জীবনের 'ফিলজফি'। মাতাল হ'য়ে মার খেয়েছে চৌরঙ্গিতে, ঘাড়ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে শুঁড়িখানা থেকে রাস্তায়, জগুবাজারের কাছে রাস্তায় বমি করতে-করতে চারদিকে ভিড় জমিয়েছে, পেতি পাওনাদার বাগে পেয়ে ছিনিয়ে রেখেছে গায়ের আলোয়ান চোখের চশমা, হাজতেও মশার কামড় খেয়েছে কয়েক রাত—সুতরাং তার আর লজ্জা কিসে? বাঁচার মতো বাঁচতে হ'লে এ-রকম ছোটোখাটো দুর্ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটবেই। এই তো জীবন। বৌ ছেলেপুলে নিয়ে ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন কাটাবে এমন ক্ষীণজীবী ভালোমানুষ নাকি সে! সে তো আর হাবাগোবা সাধারণ মানুষ নয়। যারা নিয়মিত একটি চাকরি করে, প্রতিরাত্রেই বৌর সঙ্গে শোয়, ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে জুতো-জামা কিনতে যায় তাদের প্রতি অরুণের অসীম অবজ্ঞা। ঐ সব scumগুলোর ভোঁতা কথাবার্তা শুনলে ওদের উপরেই দয়া হয়। এদিকে লোকগুলো এমন কিপটে যে পাঁচটা টাকা ধার চাইলে মুখ শুকিয়ে যায়, এমনকি রাত্তির এগারোটায় চা খেতে চাইলে বলে, উনুনে আঁচ নেই। রাত্তির এগারোটা ওদের ঘুমের সময়! হাঃ-হাঃ। এগারোটায় সবে তো শুরু। কী জানে ওরা জীবনের? ঐ ছোট্ট একটু খাঁচার মধ্যে বেঁচে থাকে কেমন ক'রে? ওরাই যদি ভালো হয় অমন ভালো হ'য়ে আমার কাজ নেই। খারাপই হ'বো আমি। ভালো। খারাপ। ওগুলো তো কথার কথা। বাঁচবার সাহস নেই, তাই আমি মস্ত বড়ো চরিত্রবান সাধুপুরুষ। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্‌ জেন্ট্‌ল্‌ম্যান্‌। আমার আছে সাহস, কিচ্ছুকে আমি পরোয়া করিনে, আমি বাঁচবো। বাঁচাটাই আসল, ভালো-মন্দ কিচ্ছু না। জীবন চাখছে সে, তার মধ্যে মিঠে তেতো ঝাঁঝালো সব রকম স্বাদই আছে, থাকবেই। সবগুলোই চাখতে

হবে, তবে তো হ'লো বাঁচা। অরুণের তাই কখনো অনুতাপ হয় না, আত্ম-ধিক্কার জন্মে না, জীবনটাকে তারই একচেটে সম্পত্তি মনে ক'রে বেশ আছে সে।

আসল কথা ষোলো বছরের পরে অরুণ আর বাড়েনি। পিটর প্যান্-এর আসল চেহারাটা ফুটেছে ওর মধ্যে, সেটা অতি কুৎসিত। ষোলো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে, অর্থাৎ কলেজের প্রথম দু'বছরে, বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে এদিক-ওদিক কিছু বই পড়েছিলো, পড়েছিলো কিছু ফরাসি উপন্যাসের ইংরেজি তর্জমা, তার মধ্যে 'ল্যাটিন কোয়ার্টার' নামে একখানা ভাববিলাসী রোমান্স খুব নাড়া দিয়েছিলো তার তরুণ মনকে। আহা—জীবনটা এ-রকম হ'লে কী মজাই হ'তো। চরম আদর্শই হ'লো বোহেমিয়ান হওয়া। বোহেমিয়া আরম্ভ হ'লো সিনেমায় রেস্তোরাঁয় আড্ডায়, কিন্তু সেখানেই থামলো না। প্রথম যৌবনের উন্মার্গ ঝোঁকটাকে সামলাবার মতো কোনো শক্ত শাঁস তার ভিতরে ছিলো না, বাইরে থেকেও কোনো আঘাত এলো না, অনায়াসে ভেসে চললো। স্ট্রেচির লেখা বায়রনের জীবনচরিত পড়লো, একখানা রাসেলেরও পাতা ওল্টালো, ভালো-মন্দের চলতি ধারণাগুলো নেহাৎ বাজে এ-কথা মাথায় ঢুকলো, কিন্তু ওর মনের গড়ন র'য়ে গেলো ষোলো বছরেরই, সেটাই হ'লো মারাত্মক। বায়রন লম্পট, বোদলেআর আবসাঁৎ-খোর বেশ্যাবিলাসী, ভোলতেআর স্কাউণ্ড্রেল—সুতরাং আর ভাবনা কী? বি. এ. যখন পড়ছে তখন থেকেই অরুণ এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুকরণের চেষ্টা আরম্ভ করলো, পাশ ক'রে বেরোতে-বেরোতে দস্তুরমতো ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো। এতদিনে বিখ্যাত হবার আন্দাজ বড়ো স্কাউণ্ড্রেল সে হয়েছে, কিন্তু খ্যাতি তার কই। এখানেই তার ছোট্ট একটু ভুল হয়েছিলো। ভুলে গিয়েছিলো বায়রন কি বোদলেআর ব্যভিচারী হিসেবেই বিখ্যাত নন, ও-রকম আরো

হাজার-হাজার হ'য়ে গেছে ইতিহাস যাদের মনে রাখেনি। স্মরণীয় তাঁরা অন্য কারণে, সেখানে তাঁরা অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। মেয়েমানুষ নিয়ে বায়রনের ছিনিমিনি খেলা—অরুণের মনকে সেটাই খুব টানলো, তাঁর মহৎ কবিপ্রতিভার কথা একবারও ভাবলে না। মনে হ'লো ও-রকম করাই বুঝি মস্ত কিছু, কারণ মস্ত লোকেরা ও-রকম করেছেন। সাধারণ সব ভদ্রলোক, যারা খাটে খায় রাত্রে ঘুমোয়, নেশা করে না, বেশ্যা পোষে না, জীবন-বীমা করে, বরাবর একই স্ত্রীতে আসক্ত থাকে, অরুণ তাদের তুচ্ছ করতে শিখলো, শুধু এইটে ভুলে গেলো যে সে বায়রন কি বোদলেআর নয়, কোনো অসামান্য শক্তি তার নেই, এমনকি ভদ্রভাবে জীবনযাপনের অতি সাধারণ শক্তিও সে হারিয়েছে। সাধারণ ভদ্রলোক হ'লে তবু সে কিছু হ'তো, তা না হ'লে সে অত্যন্ত সাধারণরকমের লম্পট জোচ্চোর মাত্র হ'তে পারে—তার বেশি কিছু পারে না। ভেবে দেখলো না যাদের কথা উঠলেই তার মুখে বিচিত্র সব ইংরিজি গালাগাল ছোটে, তাদের মতো হ'তে হ'লেও যে-পরিশ্রমটুকু করতে হয় তাও সে পারে না, তাই তাদেরই ঠকিয়ে মদ খাবার পয়সা জোগাড় করতে হয়, ভিক্ষে ক'রে নিতে হয় দু'প্যাকেট সিগারেটের দাম। সাধারণ হবার শক্তিও যখন খোয়ালো, প'ড়ে থাকতে হ'লো অকথ্য রেসপেক্‌টেব্‌ল্‌ লোকগুলোর জুতোর তলায়, আবার এ-হেন দুর্ঘটনাকেও ভুল বুঝলো, ভাবলো সে অসাধারণ। এটাই কাল হ'লো। সে যে আর-কারো মতো নয়, মনের এই প্রকাণ্ড বিকারটা পাঁচ বছর আগেও হয়তো ছিলো ছেলেমানুষি, এখন ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। আর তার ফেরবার উপায় নেই। নিছক রক্তের জোরে যতদিন পারে চলবে, তারপর এই বিকার থেকেই একদিন হয়তো পাগল হ'য়ে যাবে, মরবে সিফিলিসে প'চে-প'চে। এই তার ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ যা-ই হোক্‌, এখনকার মতো কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

শুধু উপস্থিত মুহূর্তটি নিয়েই তার কারবার, আগে-পিছে ভাববার অভ্যেস সে ছেড়েছে অনেকদিন, সে-ক্ষমতাও নেই। মা-মহামায়াকে কাল রাত্রে যে-কথা বলেছিলো তা মনে পড়তেই মায়া-মন্দির ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হ'লো সে। কোথায় যাবে ভাবলে না, রাস্তায় বেরিয়ে যা হয় একটা ঠিক করবে। মহামায়া ঘরে ঢুকতেই বললে, 'চলি তাহ'লে।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'দেখা যাক কোথায় যাই।'

'তুই তাহ'লে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিস?'

'নিশ্চয়ই।' অরুণের কথার ধরনে মনে হ'তে পারতো মহামায়াই কোনো অপরাধ করেছেন, জবাবদিহিটা অরুণেরই পাওনা।

'কেন যাচ্ছিস?'

'আমার ইচ্ছে।'

'ইচ্ছে তোর একলারই আছে নাকি?'

অরুণ চুপ ক'রে রইলো।

'আমি কি তোকে কিছু বলেছি যে তুই রাগ করছিস? ভারি গোঁয়ার তো তুই।'

অরুণ মোটা গলায় বললে, 'এখানে আর ভালো লাগছে না।'

'আমাকেও ভালো লাগছে না? জিজ্ঞেস করলেন মা-মহামায়া। 'তাকা আমার দিকে, তারপর জবাব দে।'

অরুণ একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে।

'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে।'

'যাক্, তবু যে কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলি! এমন লাজুক তুই! আজ দুপুরে আমরা বিদ্যাপতি শুরু করবো—মনে আছে তো সে-কথা?'

সুতরাং অরুণ র'য়ে গেলো। সন্ধেবেলা একজন চাকর এলো তার

ঘরে এক বোতল জনি ওঅকর, সোডা আর কাচের গেলাস নিয়ে। অরুণ অবাক হ'য়ে গেলো।

'এ-সব কার জন্যে?'

'মা পাঠিয়ে দিলেন।'

চাকর গেলাসে অল্প একটু ঢেলে সোডা মিশিয়ে বোতলটি নিয়ে চ'লে গেলো। আর-কিছু বললে না। পাঁচদিন পর হুইস্কি পেটে প'ড়ে অরুণ যেন নবজীবন পেলো।

রাত্রে মহামায়া এসে বললে, 'কী খবর?'

অরুণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, 'সত্যি তুমি করুণাময়ী। যা-ই বলো, ও-জিনিস দু'এক ফোঁটা না হ'লে আমার চলে না। কী করবো—অভ্যেস ক'রে ফেলেছি।'

'ভালো অভ্যেস করিসনি। কেন খাস ঐ ছাইভস্মগুলো?'

অরুণ বললে, 'অল্প খেলে শরীর বেশ ভালো থাকে।'

'না—না—ও-সব চলবে না। ছাড়তে হবে। তবে যতদিন একেবারে ছাড়তে না পারিস, রোজ সন্ধেবেলা ঐটুকু ক'রে পাবি। ঠিক ঐটুকু!'

'রাজি।'

'কিন্তু কোনোদিন, একদিনও যদি বেশি খাস, যদি কখনো আমি শুনি একটুও বেশি খেয়েছিস তাহ'লে তোর মুখ দেখবো না আর কোনোদিন। বুঝলি? মনে থাকে যেন,' ব'লে মহামায়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকালেন।

অরুণের হঠাৎ মনে হ'লো ও-মুখ দেখতে না-পেলে তার দিন আর কাটবে না। সে বললে, 'মনে থাকবে।'

তারপর থেকে তার দিন বেশ কাটছে মায়া-মন্দিরে। বৈচিত্র্যের অভাব, উত্তেজনার স্বল্পতা পুষিয়েছে পরম নিশ্চিন্ততায়, শারীরিক

বিশ্রামে। সন্ধেবেলা একটি ক'রে পেগও জুটছে। যথেষ্ট নয়, কিন্তু প্রাণ বাঁচে। বাড়াবাড়ি করে না, পাছে সত্যি-সত্যি মহামায়া চটেন। এর কারণ শুধু ভয় নয়—শুধু ভয় অরুণকে থামাতে পারতো না—তাঁকে চটাতে ইচ্ছাও করে না তার। এত ভালো লাগে মানুষটাকে যে সে, ভালো-লাগাটাই প্রায় নেশার মতো। কাছে দেখলেই ভালো লাগে। তিনি খুশি হবেন ভাবতে নিজেই খুশি হয়। অসাধারণ মানুষ সন্দেহ কী—এমনিতে অশিক্ষিত, অথচ কথাবার্তায় কী তুখোড়। মনটা এতই মুক্ত যে তাকে হুইস্কির ব্যবস্থা পর্যন্ত ক'রে দিলেন। যদিও ধর্মকর্ম করেন, আশ্চর্যরকম আধুনিক। আমাদের দেশের বোকা লোকগুলোর মতো ভাবেন না যে মদ খেলেই মানুষ জাহান্নমে যায়।

অরুণ মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। সেতুবন্ধের একটি ঘরে দিন-রাত অবরুদ্ধ থাকতে তেমন খারাপও তার আর লাগে না। কিছু বৈচিত্র্য, কিছু উত্তেজনা মহামায়াই জোগান। চুপচাপ দুপুরবেলায় সে বৈষ্ণব কবিতা প'ড়ে শোনায়, মহামায়া মেঝেতে ব'সে চুপ ক'রে শোনেন, পড়া শেষ হ'লে নানারকম আলাপ-আলোচনা করেন। এ-সব বিষয়ে অরুণ একেবারেই অজ্ঞ, রোজই নতুন-নতুন তথ্য তার কানে ঢোকে, আর মহামায়ার বলবার ধরন এত মনোরম যে তিনি যা-ই বলেন তা-ই শুনতে খুব ভালো লাগে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই একেবারে নতুনরকমের একটা রস পায় অরুণ, ভিতরে-ভিতরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করে। কখনো বা মহামায়ার কথাগুলি কিছুই শোনে না, শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—কী সুন্দরই তাঁকে দেখায় যখন তিনি আস্তে-আস্তে রাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলার ব্যাখ্যা করেন।

হ্যাঁ, তাঁকে দেখেও সুখ। এক-এক রাত্রে তাঁর এক-এক বেশ, কত রঙের কাপড়, কত ছাঁদের সাজ, সোনা, রুপো, হীরে, মুক্তো সবই ধন্য হয় তাঁর অঙ্গের স্পর্শে, এর বৈচিত্র্যও বড়ো কম নয়। নতুন

সাজে মানুষটাকেই নতুন লাগে, মনে হয় এই প্রথম দেখলুম। আবার যখন অত্যন্ত সাধারণ একটি শাদা শাড়ি পরেন তখনো রূপ যেন ফেটে পড়ে। এত রূপ আর কার! রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে সে-সব বিচিত্র ছবি অরুণের চোখের সামনে ভাসে; জ্যান্ত মানুষটা যে তার পাশের ঘরেই ঘুমুচ্ছেন এ-কথা মনে হ'তেই চোখের ঘুম ছুটে যায়, খামকা জেগে থাকে।

এটা ঠিকই যে অরুণ কোনোদিন কোনো মানুষের প্রভাবে এতখানি পড়েনি, যতখানি এরই মধ্যে পড়েছে মা মহামায়ার। সত্যি বলতে, মনে-মনে সে ভক্তই হ'য়ে পড়েছে। হয়তো হৈমন্তীর আশাই ঠিক, মা-র স্পর্শে অরুণের জন্মান্তরই ঘটবে এবার। শিষে সোনা হবে, ব্যভিচারী হবে ভক্তচূড়ামণি।

মোটের উপর, সেতুবন্ধ থেকে নড়তে অরুণ চাচ্ছেই না আপাতত। তাই একটু পরে মহামায়া যখন বললেন, 'কাল চারটের সময় যাবো তোদের বাড়িতে, তোকেও নিয়ে যাবো', অরুণ সাফ ব'লে দিলে, 'আমি যাবো না।'

'যাবি না মানে? ছেলেকেও একবার দেখতে ইচ্ছে করে না তোর?'

'না, করে না।'

'অমন অমানুষের মতো কথা বলিসনে, আমার তাতে কষ্ট হয়। যাবি বইকি, নিশ্চয়ই যাবি। নিজের বাড়িঘর ফেলে কতদিন আর থাকবি।'

অরুণ শঙ্কিত হ'য়ে বললে, 'আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলছো?'

'হ্যাঁ, বলছি। বাড়ি ফিরবি না তো আমার কয়েদি হ'য়েই থাকবি নাকি চিরকাল?'

'তোমার কয়েদি হওয়াও সুখের।'

তাই নাকি? ভেবে কথা বলিস, অরুণ আমার কয়েদি যারা হয় তারা কিন্তু আর ছাড়া পায় না।'

'আমি কি চাচ্ছি ছাড়া পেতে?'

'ছাখ্, ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে নেই। কারো মনে কষ্ট দিতে নেই। তোর বাবা মনে-মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন তাও কি তুই ভাবিসনে? সেদিন তুই বলছিলি না তিনি কাগজে তোর কথা কী ছাপিয়ে দিয়েছেন?

অরুণ হেসে বললে, 'হ্যাঁ, আমার কোনো ঋণের জন্য তিনি দায়ী নন।'

'ছাখ তো, কতখানি আঘাত পেলে বাপ ছেলের কথা ও-রকম ক'রে ছাপিয়ে দিতে পারে। অমন একটা মানী লোক—এ কি তাঁর পক্ষে কম কষ্ট! তুই কেমন আছিস কোথায় আছিস তাও তো তিনি জানেন না। উঃ, জ্বলে যায় না বুক! আমার কথা শোন, চল্ তুই বাড়ি ফিরে। তোকে দেখলে তিনি আর রাগ রাখতে পারবেন না—সত্যি-সত্যি তিনি তোকে খুবই ভালো বাসেন।'

অরুণ বললে, 'ভালোবাসেন না হাতি!'

'ও-রকম অসভ্যের মতো কথা কথা আর কক্ষনো বলবিনে। আমি বারণ ক'রে দিলাম।'

'তুমি বারণ করলেই আমি মানবো কেন?'

'মানবি, নিশ্চয়ই মানবি। তুই না বড়ো উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল একটা অসুর—আমার প্রত্যেকটি কথা এ-পর্যন্ত মেনেছিস। ভেবে ছাখ। এটাও মানবি। যাবি তুই কাল বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গে। অসুর পোষ মানাতে হয় কেমন ক'রে আমি জানি, আমাকে এড়াতে পারবি না।'

অরুণ চুপ ক'রে রইলো। মহামায়ার দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে

সে-মুহূর্তে তার মনে হ'লো সত্যি ইনি তাকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করাতে পারেন, না বলবার ক্ষমতা তার নেই।

'কোনো ভয় নেই তোর—কেউ তোকে কিচ্ছু বলবে না—তুই চল। তোর বাবা যদি একটা ভুল ক'রেও থাকেন তুই কি তাই ব'লে নিষ্ঠুর হবি! তোকে চোখে দেখলেই কত বড়ো একটা বোঝা নেমে যাবে তাঁর বুক থেকে! আর ছেলেটার ঐ অবস্থা—এখন তুই উপস্থিত না-থাকলে লোকে বলবে কী! ছি-ছি, এটুকু বুদ্ধিও তোর নেই!'

অরুণ বললে, 'গিয়ে থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ, থাকতে হবে বইকি।'

'কিন্তু তোমাকে না-দেখে আমি কেমন ক'রে থাকবো?'

মহামায়ার মুখে অপরূপ একটি হাসি ফুটে উঠলো। নিচু গলায় বললেন, 'না-দেখে থাকতে না পারিস থাকবি না। আমার দরজা সব সময়ই খোলা।'

অরুণ রাজি হ'য়ে গেলো।

* * *

কাঁটায়-কাঁটায় চারটের সময় মহামায়া এলেন।

নিচে বসবার ঘরে অরিন্দম ব'সে ছিলেন, হৈমন্তী ছুটে এসে বললেন, 'তিনি এসেছেন। এসো একটু বাইরে।'

অরিন্দম বাইরে এলেন। বাড়ি সুদ্ধু লোক পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে, মহামায়া গাড়ি থেকে নামতেই একে-একে সব প্রণাম করলে। উজ্জ্বলার মা-বাবাও করলেন, মেয়ে বিয়ে দিলে অনেক-কিছুই মেনে নিতে হয়। কে জানে কিসে কী হয়—আর মেয়েটার যা কপাল।

শুধু বুলিকেই ওখানে দেখা গেলো না।

মহামায়া বারান্দায় উঠে আসতেই অরিন্দমের সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো। অরিন্দম হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললেন, 'কেমন আছেন?'

মহামায়া প্রতিনমস্কার ক'রে বললেন, 'আপনার শরীরটা তেমন ভালো দেখছি না।'

'আমার যা শরীর—একটু খারাপ হ'লে বেমানান হয় না।'

'নাতির অসুখ ?'

'দেখছি তো।'

'আমি একটু দেখতে পারি ওকে ?'

'নিশ্চয়ই—আপনি দেখবেন তার আবার কথা কী ?'

'আমি কিচ্ছু করবো না—শুধু একটু দেখবো।'

'বেশ তো', ব'লে অরিন্দম স'রে গেলেন। সমস্ত দলটি উপরে চ'লে গেলো, অরিন্দম বসবার ঘরে ফিরে এসে সিগারেট ধরালেন।

খানিক পরে বুলি এসে চুপি-চুপি বললে, 'বাবা, একটা কথা।'

'কী রে ?'

'দাদা এসেছে।'

'অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ সত্যি, দাদা এসেছে।'

'কোথায় সে ?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'রাস্তায় ?'

'না—বাইরের সিঁড়িতে।'

'কখন এসেছে ?'

'তা তো জানি না।'

'তুই কখন দেখলি ?'

'এই তো এইমাত্র।'

'তোকে দেখেছে ?'

'দেখেছে।'

'কিছু বললে ?'

'না।'

অরিন্দম একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।'

বুলির পিছন-পিছন অরুণ এসে ঢুকলো একটু পরেই। মহামায়া তাকে বাড়ির একটু দূরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, হেঁটে এইমাত্রই এসে পৌঁচেছে। দরজা দিয়ে ঢুকেই দাঁড়ালো, আর এগোলো না।

অরিন্দম বললেন, 'কাছে আয়।'

অরুণ দু'পা সামনে এলো। ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অরিন্দম একবার তাকালেন। দিব্যি ফিটফাট। মাথার টেড়িটি পরিষ্কার, দাড়ি কামানো। ফোলা-ফোলা চোখ, মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো। মদে দিন-দিন ফুলছে, গালে থুতনিতে মেদের ভাঁজ ফুটেছে এই বয়েসেই, ফোলা ভ্যাপসা মুখ,. মুখের ভাবটা ভোঁতা, চোখ যেন মরচে-পড়া—সব মিলিয়ে কেমন স্থূল, কুৎসিত হ'য়ে গেছে ও। এ ক'দিনে আরো যেন ফেঁপেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো কষ্ট পেয়েছে এমন মনে হয় না দেখে। বরং মনে হয় খুব সুখেই ছিলো। কে ওর সেই শত্রু যে আশ্রয় দিয়েছিলো ?

অরিন্দম জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলি ?'

অরুণ কথাটা ইচ্ছে ক'রে ভুল শুনে বললে, 'এই এলুম।'

অরিন্দম প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলেন না। যা ভেবেছিলেন, ফিরে এসেছে। দুশ্চিন্তার শেষ হ'লো—না আরম্ভ হ'লো ? যদি ও পালিয়ে যেতো দূর দেশে, ঝাঁপ দিতো জীবনসংগ্রামে, কোনো অদ্ভুত বিদেশে গিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতো, তবে বুঝতুম কিছু হ'লো। হয়তো আমি আর ওকে দেখতুম না জীবনে, হয়তো কোনো খবর না-পেয়েই মরতুম, কিন্তু তাতে কী—ও তো বাঁচতো। এ ক'দিন একবেলাও কি ও নিজের অন্ন নিজে

জুটিয়েছে? দেখেই বোঝা যায় করেনি। একবেলা যে পারে সে আর-একবেলারও পারে, স্বোপার্জিত অন্নের স্বাদ একবার যে জেনেছে সে কি আর স্বেচ্ছায় তা থেকে বঞ্চিত হয়! তাহ'লে ওর বাড়ি ফেরার ভঙ্গিটাই হ'তো আলাদা, চোরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো না, অকুণ্ঠে ঢুকতো, পুরুষের মতো কথা বলতো। দুর্ভাগ্য ওর, যতদিন বেঁচে আছে পরান্নভোজী হ'য়েই কাটবে। এত বড়ো দুঃখ কিছু নেই জীবনে, একদিন বুঝবে। আশায় আছে বাপ মরলেই বড়োলোক হবে, সে-আশার গুড়ে বালি ঢেলেছি। অর্ধ-পয়সাও না। মা-বোনের কাছ থেকে কেড়ে খামচে ভিক্ষে ক'রে কোনোরকমে বেঁচে থাকা। আর অবশ্যি উজ্জ্বলার মাসোয়ারাটা মেরে দেবে। একটা সর্ত দিতে হবে উজ্জ্বলা যদি তার স্বামীর আগে মরে, উজ্জ্বলার সমস্ত টাকা পাবেন তার বাবা। সুদটা নয়, থোকে আসলটাই। ক্ষতিপূরণ। কিংবা, যদি অরুণের আরো সন্তান হয় উজ্জ্বলার গর্ভে, হ'য়ে বেঁচে থাকে সে কি তারা পাবে টাকাটা সাবালক হ'লে। তবে অরুণের আর যে ছেলেপুলে হবে, হ'লেও বাঁচবে, এমন আশা করা যায় না—যায় না? এখনো সময় আছে, এখনো অরুণ ফিরতে পারে। মোটে তো চব্বিশ ওর বয়েস।

হয়তো এ-আশা ছলনা মাত্র। তবু, কষ্টে পড়বার সুযোগ থেকে ওকে বঞ্চিত করলে চলবে না। যদি কোনোদিন তাতে কিছু হয়। উইলটা এবারে সই ক'রে ফেলবেন—একদিকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যত ভাবছেন ততই জটিল হ'য়ে উঠছে—উজ্জ্বলার যে-পাঁচ হাজার টাকা মন্ত্রী মহামায়াকে দান করেছে সেটাও দিতে হবে ফিরিয়ে। জীবনের প্রথম আঘাত পাবে অরুণ যখন শুনবে বাপ তাকে এক পয়সাও দিয়ে যায়নি। সে আঘাতে সুফল হ'তে পারে—যদি ওর মধ্যে মনুষ্যত্বের এক ছিটেও এখনো থেকে থাকে। যদি মানুষ হয় তাহ'লে বাপের টাকার আর দরকার হবে না। আর যদি এমনিই চলে, তাহ'লে তো

গেলোই—মুশকিল শুধু এই যে তখনো খাওয়া-পরা জুটবে, আইনের হাজার মারপ্যাঁচেও তা থামানো যাবে না। আসলে সমস্ত টাকা ওড়ানোই ভালো, সঞ্চয় করাটাই ভুল। বাপের টাকা ছেলে পাবে এ নিয়মটাই ভুল। অনুপার্জিত অর্থের মতো চরিত্রনাশক কিছু নয়। যে যেমন ক'রে পারে ক'রে খাবে। যে কাজ করে না সে খাবেও না। রুশদের কথাই ঠিক। কীই বা সামান্য টাকা আমার—তা নিয়ে ঝকমারি কত। আর ভালো লাগে না।

আর আমাদের এই আহা-বাছা ভাবটাই সর্বনেশে। ছেলেমেয়েকে চিরকাল ছেলেমানুষ ক'রে রাখবার ঝোঁকটা বাঙালির মজ্জাগত।

বড়ো হ'তে দেবোই না, চেপে রাখবো। মেয়েরা তবু বিয়ে হ'য়ে বাঁচে, স্বাধীন জীবন পায়, কারণ যে-জীবনে দায়িত্ব আছে সে-জীবনই স্বাধীন। কিন্তু মা-বাপের সঙ্গে থাকলে তিন ছেলের বাপ হ'য়েও ছেলের ছেলেমানুষি ঘোচে না। বিশেষ, বাপ যদি হয় অবস্থাপন্ন। বাপ বড়োলোক হ'লে ছেলের পিতৃভক্তি সাধারণত এত বেশি হয় যে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারে না—অরুণই বা কী, যত পাজিই হোক্, শেষ পর্যন্ত আমাকে চটাবার, আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বার সাহস ওর আছে নাকি, তাহ'লে তো হ'তোই! সারা জীবন খেতে পরতে পাবে এই বদ্ধমূল ধারণাই ওকে পচালো, এই চুরি-করা নিশ্চিন্ত আরাম কখনো থাকবে না এ-কথা ভাবতেই বোধ হয় ওর আতঙ্ক, এ ছাড়া অন্য কোনো জীবন কল্পনাও করতে পারে না। গরিব বাপের ছেলের এতটা অধঃপাত ঘটবার কারণ থাকে না, সে জানে বাপের আশ্রয়েই তার জীবন কাটবে না; পৌরুষে দীক্ষা পায়, সাবালক হ'তে শেখে। সে যখন বাপকে অমান্য করে তা হয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ, তাতে কোনো পক্ষেরই অসম্মান নেই, অরুণের মতো হীন চৌর্যবৃত্তি তাকে দিয়ে সম্ভব নয়। অথচ আমরা বাপ-মায়েরা এমনি অবুঝ যে নিজেদের কিছু সম্বল

থাকলেই ছেলেকে মাথায় চড়াতে চাই—অর্থাৎ ক্রীতদাস ক'রে রাখতে চাই। ধাড়ি-ধাড়ি জোয়ান ছেলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে এ-দৃশ্য দেখা যাবে ঘরে-ঘরেই। ভ্রুক্ষেপ নেই কারুরই। ছোটো কাজে ঢুকবে না—মান যাবে। দূর দেশে যাবে না—অসুখ করলে বাছাকে দেখবে কে? আহা—এত তাড়া কিসের, খেতে পাচ্ছে না এমন তো নয়। বৌ আনি ঘরে, বৌর যদি কপাল থাকে আপনিই হবে। সবই একেবারে তৈরি, হাতটিও বাড়াতে হয় না, মুখের কাছে ধরা, দয়া ক'রে হাঁ করলেই হয়। বাপ-মায়ের বাধ্য যে, ঈশ্বর তাকে এমনি সুখী করেন। এইভাবে ছেলের মনুষ্যত্ব নিঃশেষে নিংড়ে বার ক'রে নিয়ে আমরা পিতার কর্তব্য সম্পন্ন করি। জীবনের অর্ধেক শুয়ে ব'সে কাটলো, ভুঁড়ি বেরুলো, ঘি-খাওয়া মোটাসোটা নধর চেহারাটি হ'লো, অবশেষে খুড়ো ঘরে'র ছেলেদের জন্য যে-সব চাকরি বাঁধা তার একটা জুটলো, তারপর বাপ স্বর্গে গেলেন, তবু টাকা রেখে ছেলের মাথা কিনে রেখে গেলেন। কায়স্থেরও যে উপবীতে অধিকার আছে, কিংবা রাবণের পুষ্পকরথের আইডিয়াটা চুরি ক'রেই যে সায়েবরা এরোপ্লেন বানিয়েছে এই ধরনের কোনো গবেষণায় কাটলো বাকি জীবনের থেলোথোলো ঢিলেঢোলা অবসর। কোনোদিন বুদ্ধি ফুটলো না, চিন্তার ক্ষমতা জন্মালো না, নিজেকে একটা জ্যান্ত মানুষ ব'লে উপলব্ধি করবার কোনো সুযোগই এলো না। এই সব অতি অবোধ বয়স্ক বালকে বাংলা দেশ ভরা। আমরা সব ম'রে থাকতে ভালোবাসি, মেরে রাখতে চাই।

অরুণেরই বা আর কী হবে? আমি যদি আজ মরি, ওর মা কি এ-কথা বলবেন—বেরো আমার বাড়ি থেকে। তা তো নয়ই, বরং স্ত্রীলোকেরা মিলে ষাট-ষাট করবে—আমি ওর উপর অবিচার করেছি এ-রকম একটা প্রপাগাণ্ডাও জোর চালাবে, সকলের আদরে দিব্যি

জোঁকের মতো ঝুলবে। উজ্জ্বলারটা তো কাড়বেই—কাড়তেই বা হবে কেন, ও যে-রকম বোকা মেয়ে ওর মন ভোলাতে কতক্ষণ। রমাপতিবাবুর সঙ্গে এবার অনেক কথা হয়েছে অরিন্দমের। অরুণের কীর্তি সবই বলেছেন। তারপর বলেছিলেন, 'উজ্জ্বলার বিবাহভঙ্গ ক'রে দিন। সুবিধেমতো ওকে আবার বিয়ে দেবেন।' ভদ্রলোক প্রায় আঁৎকে উঠেছিলেন কথাটা শুনে। 'তাই ব'লে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেবেন?' রমাপতিবাবু ছলোছলো চোখে বললেন, 'ওর কপালে যা আছে তা-ই হবে।'

বেশ, তা-ই হবে। সব ক'টা জীবন ছারখার হ'য়ে যাক্—আমি যদি তখন না-ই থাকি, আমার আর ভাবনা কী? কী দুর্বলতা মানুষের—আমি ম'রে গেলেও আমার ইচ্ছামতো যাতে সব চলে এ দুশ্চিন্তা মৃত্যুকেই বোধ হয় ঘনিয়ে আনে। ব্যাপারটা হঠাৎ অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকলো অরিন্দমের। উইলের কথাটা এখনো কাউকে বলেননি, ফিরে যাবার আগে হৈমন্তীকে বলতে হবে। মন্তী হয়তো রাগ করবে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে অরুণের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়াই এখন দরকার। তুমিও নিষ্ঠুর হোয়ো, এই আমার অনুরোধ। ধর্মের প্রভাবে তো দেখছি নিষ্ঠুরতাটা ওর বেশ সহজেই আসছে—কিন্তু ছেলের বেলায় পারবে কি? যাক্‌গে, আমার যা বলবার আমি তা বলবো, তারপর ওদের যা খুশি। তিনি কলকাতা ছাড়লেই বাড়ির একদম হাওয়া-বদল হবে এটা অনুমান করা তাঁর পক্ষে শক্ত নয়। এতদিন জানতেন তিনিই এ-বাড়ির সমস্ত, এ-বাড়ির সমস্তই তাঁর। এবারে মনে হচ্ছে তিনি যেন দুর্বৃত্তের মতো সকলের উপর উৎপাত ক'রে বেড়াচ্ছেন, তিনি বিদায় নিলে অনেকেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। মন্তী তো আমাকে ত্যাগই করেছে—আছে বেশ। ও যা বলে যা করে সবই কি সত্যি?

এই তো নানা অশান্তিতে আছেন—তবু, কয়েকদিন পরে নাগপুরে ফিরতে হবে ভাবতেই মনটা একটু খারাপ লাগে। অথচ এর তুলনায় নাগপুরে একা-একাই ছিলেন ভালো। চোখের উপরই কিছু দেখতে না হ'লে আর ভাবনা কী? কিন্তু এততেও মন বলে না—এখানে আর ভালো লাগে না, চ'লে যাই। কোথায় যাবেন? এই তো তাঁর বাড়ি, এখানে ছাড়া অন্য সবখানেই তিনি প্রবাসী। ভুলতে পারেন না পৃথিবীতে এরাই তাঁর সব চেয়ে আপন। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে। এরা ছাড়া কেউ নেই তাঁর। প্রতিটি মুখের সঙ্গে সমস্ত জীবন তাঁর জড়ানো। ঠিকই বলে মন্তী, ঘোর আসক্তি আমার। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ ভালোবাসে ততক্ষণ একেবারে অনাসক্ত হ'তে কি পারে? আর ভালোবাসা না-থাকলে জীবনে রইলো কী? এ তো ভালোবাসারই শক্তি যে এত দুশ্চিন্তা, এত অশান্তি, তবু জীবনে ধিক্‌কার আসে না, সংসার অসার মনে হয় না। এ দিব্য জ্ঞান হৈমন্তী কোথায় পেলো?

অরিন্দমের হঠাৎ খেয়াল হ'লো অরুণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

'বুলি, তুই যা। তোর দাদার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

বুলি চ'লো গেলো।

'উপরে গিয়েছিলি?'

'না।'

'তোর ছেলের অবস্থা তো বেশি ভালো না।'

অরুণ চুপ।

'কী অসুখ ওর জানিস?'

'না।'

'আমিই তোকে ব'লে দিচ্ছি।' অরিন্দম চেষ্টা ক'রে কথাটা উচ্চারণ করলেন, 'সিফিলিস।'

অরুণের মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো।

'তোর কবে হয়েছিলো?'

অরুণ চুপ।

'জিগেস করছি, কবে হয়েছিলো ঐ রোগ?'

'আমার কখনো হয়নি।'

'হয়েছিলো তো চিকিৎসা করাসনি কেন? গাধা কোথাকার!'

অরুণ চুপ।

'ছেলেটাকে একবার দেখে আয় তবেই বুঝবি তুই কী করেছিস। নিজের মরবার ভয়ও কি তোর নেই?'

অরুণ শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে বদলি করলে।

'বোস না—দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

অরুণ দাঁড়িয়েই রইলো।

'অসুখ করলো তাতে লজ্জা নেই, চিকিৎসা করাতেই লজ্জা! Fool!'

অরুণ একবার ঢোঁক গিললো।

'শোন—কাল থেকেই তোর চিকিৎসা আরম্ভ হবে।'

এতক্ষণে অরুণ একটা কথা বললে, 'আচ্ছা।'

'নীরদকে আমি ব'লে রেখেছি—তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিছু ভয় নেই তোর, সেরে যাবে।'

অরুণ পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলো।

'তবে সেরে যাবার পরেও খুব সাবধানে থাকতে হবে—সে-সব ডাক্তার তোকে ব'লে দেবেন। আমি তো চ'লে যাচ্ছি, তুই ডাক্তারের কথা-মতো চলিস। আমার এই কথাটা অন্তত রাখিস তুই।' শেষের কথাটা অরিন্দম অত্যন্ত শুষ্কভাবে বললেন। ব'লেই ভাবলেন—ও হয়তো এখন মনে-মনে বলছে, 'ব'য়ে গেছে আমার ডাক্তারের কথা-মতো চলতে!'

অরুণ চ'লে যাবার একটা ভঙ্গি করতেই অরিন্দম বললেন, 'একটু দাঁড়া।'

উপরি-ওলার হুকুম-পাওয়া সৈন্যের মতো অরুণ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলো।

'চাকরি করবি?'

অরুণ সেদিন যা বলেছিলো আজও তা-ই বললে, 'পাবো কোথায়?'

'আমি দেবো জোগাড় ক'রে? করবি?'

'করবো না কেন?'

'তার আগে কিছু-একটা কাজকর্ম শিখে নে।'

'কী কাজ?'

'একটা নতুন কাপড়ের মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সেখানে তোকে এক্ষুনি ঢুকিয়ে দিতে পারি।'

'কত মাইনে দেবে?'

'প্রথম তিনমাস কিছুই দেবে না—তারপর পঁচিশ থেকে আরম্ভ।'

অরুণের মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুলো। আর কারো মুখে এ-কথা শুনলে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠতো।

'তা আপাতত তোর টাকার দরকারই বা কী? এক পয়সাও যে এ-পর্যন্ত রোজগার করিসনি, বেঁচে তো আছিস। মন দিয়ে কাজ করলে পরে বেশ ভালো হবে। আমি তো মনে করি এটা বেশ ভালো চান্স্।'

অরুণ চুপ ক'রে রইলো।

'পছন্দ হ'লো না? বেশ, তুই-ই বল্ তোর কী ইচ্ছে? কিছু তো করতে হবে।'

কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর অরিন্দমের আর শোনা হ'লো না—যদি ধ'রে নেয়া যায় অরুণ কোনো উত্তর দিতো—কারণ তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন

হৈমন্তী আর মহামায়া। ঘরে ঢুকে মহামায়া বললেন, 'বাঃ, এই তো অরুণ। বাপের উপর রাগ পড়েছে তাহ'লে। পাগলা ছেলে!'

অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন।'

মহামায়া বসলেন অরিন্দমের কাছে একটি চেয়ারে, হৈমন্তী একটু দূরে। এই সুযোগে অরুণ আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো।

মহামায়া বললেন, 'আপনার ছেলেকে আমিই ফিরিয়ে আনলুম তা জানেন?'

অরিন্দম মজলিশি ধরনে বললেন, 'কী রকম?'

'হঠাৎ দেখি ও আমার ওখানে গিয়ে উপস্থিত—'

'আপনার ওখানে?'

'—উসকোখুসকো মাথা, ময়লা জামাকাপড়, দেখে মনে হয় দু'দিন খায়নি—'

'আপনার বর্ণনার সঙ্গে মানুষটা কিন্তু মোটেও মিলছে না।'

'শুনুন। আমি তো ওকে দেখে অবাক—'

'আমিও অবাক হচ্ছি। আপনার ওখানে ও কেন গেলো সেটা ভাববার কথা।'

'কী ওর মনে হয়েছে ও-ই জানে। আমাকে বলে কিনা, "আমি এখানেই থাকবো।"'

'বলেন কী! তবে কি ওর ধর্মে মতি হ'লো!' অরিন্দম হেসে উঠলেন। হৈমন্তী তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন, কিন্তু চেষ্টা ক'রেও স্বামীর সঙ্গে চোখোচোখি করতে পারলেন না।

'আমি ওকে বললুম, "পাগল! তা কি হয়! তোর বাড়ি, তোর ঘর এ-সব ফেলে কোথায় থাকবি তুই? মা-বাপের মনে এ-রকম কষ্ট দেয়া কি ভালো!"'

'ও কী বললে?'

'কিছুই বললে না—বড্ড একগুঁয়ে ছেলে আপনার। যা-ই হোক্, আমার ওখানেই স্নান করলো, খেলো, আমি নতুন জামাকাপড় আনিয়ে দিলুম, তারপর অনেক ব'লে-ক'য়ে পাঠিয়ে দিলুম বাড়িতে। তারপর এই তো দেখছেন।'

'আপনার একবেলার যত্নেই ওর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে তো। আমার তো মনে হ'লো ও আগের চেয়েও একটু বেশি মোটা হয়েছে যেন।'

মা-মহামায়া একটু হাসলেন।

'ওর যত দোষই থাক্ আপনাকে ও মনে-মনে ভালোবাসে।'

'কী ক'রে বুঝলেন?'

'বোঝা যায়। মা-র চেয়ে বাপের উপরেই ওর বেশি টান।'

'টান আমার উপর না আমার টাকার উপর?' ব'লে অরিন্দম আবার হেসে উঠলেন।

মহামায়ার চোখ অরিন্দমের মুখের উপর এসে পড়লো। অরিন্দমের মনে হ'লো সে-চোখ যেন সাপের চোখের মতো তীক্ষ্ণ। তাকানোটাও সেইরকম ঠাণ্ডা।

হঠাৎ মা-মহামায়া অন্য কথা পাড়লেন।—'সুন্দর বাড়িটি আপনার।'

'শুনতে পাই আপনার বাড়ি আরো সুন্দর।'

'আমার আর বাড়ি কী—আমাকে ওরা রেখেছে—আছি একদিন তো পায়ের ধুলো দিলেন না।'

'না, সে-সৌভাগ্য আমার আর হ'লো কই।'

'আপনার ছুটিও তো বুঝি ফুরিয়ে এলো।'

'হ্যাঁ, এবার ফিরতে হবে।'

'ওদের নিয়ে যাবেন?'

'ওরা মানে তো অনেকে। কার কথা বলছেন?'

'হৈমন্তী যাবে নাকি ?'

'আমি তো নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, উনি যেনে চান না। আমার চাইতে আপনার কাছেই ও ভালো থাকে দেখছি,' ব'লে অরিন্দম হাসলেন।

মা-মহামায়াও একটু হাসলেন। হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা-ই নাকি ?'

হৈমন্তী ভাবছিলেন মা এত কথা বলছেনই বা কেন ওঁর সঙ্গে ? রোখা-চোখা মেজাজ, কখন কী ব'লে ফেলেন ঠিক কী ? স্বামীর প্রত্যেকটি কথাই তাঁর কানে বর্বরোচিত শোনাচ্ছিলো—আর-কিছু না হোক্, একটু নরম স্বরে কথা বলতে দোষ কী—এতগুলো মানুষের ভক্তির পাত্র তো তিনি। কিছু বললেন না তিনি, মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বোধ হয় তাঁর হয়েই মা-মহামায়া জবাব দিলেন, 'তা কি কখনো হ'তে পারে ! আমার কাছে আপনার কথা কত বলে তা তো জানেন না।'

অরিন্দম আগাগোড়াই এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন তিনি আর মহামায়া ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। চেয়ারে একটু ঘুরে আরো একটু ঘনিয়ে ব'সে একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'সত্যি ? কী বলে বলুন তো।'

'আপনি নাকি স্বাস্থ্যের যত্ন নেন না মোটেও, রো- সিগারেটই খান একশো।'

অরিন্দম খুব চওড়ারকমের হেসে বললেন, 'একেবারে বানানো কথা।' কার বানানো, হৈমন্তীর না মহামায়ার তাঁর কথা থেকে সেটা স্পষ্ট হ'লো না।

'একশো না হোক, পঞ্চাশ ? মস্ত একটা খরচও তো। খুব খরচ করেন দু' হাতে—না ?'

'এক হাতে খরচ করলে আর-এক হাতে পৌঁছয় না যে,' বেশ একটু ফুর্তির সুরে বললেন অরিন্দম।

মহামায়ার ঠাণ্ডা চোখ একটু চকচক ক'রে উঠলো; খুব নিচু, খুব নরম গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দু' হাতে যে ঢালে সে-ই আবার দু' হাত ভ'রে পায়। তাই ব'লে একেবারে বেহিসেবি হওয়াও কি ভালো? আপনার বাড়ির যা এলাহি খরচ!'

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, খরচ হয়তো একটু বেশিই হয়।'

'এবারে একটু রাশ টানুন।'

'টানতেই হবে। এক বছর পরেই তো পেন্‌শন।'

'এখন থেকেই যদি সামলে চলেন তাহ'লে দেখবেন পরে আর অসুবিধে হবে না।'

'চেষ্টা তো করি। পারি কই?'

'খরুচে লোকেদের যে যা-ই বলুক এটা ঠিক যে তারা সুখী করে অন্যদের, কষ্ট পায় নিজেরা। মহত্ত্বই বলতে হয়। আপনি যদি টাকা রাখতে চাইতেন, কত টাকাই তো রাখতে পারতেন।'

'তা পারতুম।'

'তা না ক'রে পাঁচজনের জন্য সব উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হ'য়ে বসেছেন—এটা কি কম কথা!'

অরিন্দম মহামায়ার দিকে একটু তাকালেন। সাপের মতো তীক্ষ্ণ তাঁর চোখ সরলো না, নড়লো না।

'হ্যাঁ—একেবারে ফতুর!' ব'লে অরিন্দম হেসে উঠলেন।

'অরুণেরও আপনার ধাত।'

'কোন্ হিসেবে বলছেন?'

'ওরও বেহিসেবি ঝোঁক।'

'একবার দেখেই ওকে খুব চিনেছেন তো। না কি ওর সঙ্গে আপনার আজকেই প্রথম দেখা নয়?'

তিন গুনতে যতক্ষণ লাগে, মহামায়া চুপ ক'রে রইলেন। তারপরেই একটু হেসে বললেন, 'বাঃ, ওকে তো কবেই দেখেছি!'

মা-মহামায়া উঠে দাঁড়ালেন।

'সে কী! এখনই যাচ্ছেন? কিছুই আপ্যায়ন করা হ'লো না—একটু মিষ্টি-টিষ্টি—' বলতে-বলতে অরিন্দমও উঠলেন।

মধুর হেসে মহামায়া বললেন, 'আমি দিনে একবারই খাই।'

'তাহ'লে যাবেনই? অপরাধ নেবেন না—অনেক বাজে বকলুম। ...আচ্ছা, নমস্কার।'

একা ঘরে ব'সে অরিন্দম শুনলেন বারান্দায় অনেক মিহি গলার আওয়াজ, তারপর গাড়ির স্টার্ট নেয়ার গুঞ্জন। একটু পরেই হৈমন্তী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে সে-খেয়াল আছে?'

অরিন্দমের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'নিজেকে তুমি মনে করো কী? এঁর পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়লে কত রাজা-মহারাজা ধন্য হ'য়ে যান, জানো? ইনি যে কত বড়ো তা তুমি কী বুঝবে? না বোঝো চুপ ক'রে থাকো! এ-সব এয়ার্কি রতে কে বলেছে তোমাকে?'

'যা-ই বলো, ইনি কথাবার্তা বলতে জানেন। আমার তো বেশ ভালোই লাগছিলো।'

হৈমন্তী জ্ব'লে উঠে বললেন, 'অনেক সৌভাগ্য তোমার, ওঁর মতো মানুষ তোমার সঙ্গে যেচে কথা বলেছেন! উনি অত্যন্তই মহৎ, তাই তোমার সমস্ত বর্বরতা ক্ষমা করলেন।'

অরিন্দম চোখ গোল-গোল ক'রে বললেন, 'বলো কী! আমার

তো আরো মনে হ'লো আমাকে তিনি বেশ পছন্দই করলেন! তিনি কি রাগ করেছেন? আমি কি অন্যায় কথা কিছু বলেছি?' অরিন্দমের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উদ্বেগ ফুটে উঠলো।

'তোমাকে তিনি আজ কতখানি কৃপা করলেন তা যদি বুঝতে তবে আর ও-রকম কথা বলতে না। ভারি তো একটা মানুষ তুমি, তোমার মতো কত লোক তাঁকে একটু চোখে দেখবার জন্য পাগল। আর তুমি কিনা তাঁকে গ্রাহ্যই করলে না! মনে করো তুমি একটা মস্ত লোক, তোমার মতো আর-কেউ নয়। কয়েকটা টাকা রোজগার করো ব'লেই তো তোমার এত জাঁক। ত্যাখোগে, তোমার মতো দশটা চাকর রাখতে পারে এমন সব লোক তাঁর পায়ে লুটোচ্ছে। আমাদের উপর তাঁর অসীম করুণা, তাই তো তিনি আজ কমলকে দেখতে এলেন। তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতা নেই, বিনয় নেই, সে-কথা একবার জিগেস পর্যন্ত করলে না! জানো, তিনি কমলকে দেখে কী বলেছেন? বলেছেন কিছু ভয় নেই, ও মরবে না। ভাবতে পারো, ব'লে গেছেন এ-কথা! দৈব শক্তির অধিকারী না-হ'লে কেউ পারে ও-কথা বলতে! এদিকে তোমার ডাক্তাররা তো—'

'পাগল!' অরিন্দম ব'লে উঠলেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে ওঁর তুলনা!' সত্যি তুখোড় মানুষ তোমাদের এই মা-টি। মিথ্যে কথা বলার কী অসাধারণ ক্ষমতা! অরুণ এ ক'দিন বরাবরই ওঁর আশ্রয়ে ছিলো তুমি জানো নাকি?'

মুহূর্তে হৈমন্তীর সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতের স্রোত ব'য়ে গেলো। কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে গেলেন, হাত-পা কাঁপতে লাগলো, মনে হ'লো দম আটকে যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে ফণা-তোলা সাপের মতো ফোঁস ক'রে উঠলেন, 'তোমার কথা শুনলে পাপ! তোমার মুখ দেখলে পাপ!'

১০

পরের দিন সকালেই উজ্জ্বলার ছেলে মারা গেলো। উজ্জ্বলাকে নিয়ে তার মা-বাবা সেদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে রওনা হ'য়ে গেলেন টাটানগর। যাবার আগে জামাতার সঙ্গে দেখা। উজ্জ্বলার মা ছলোছলো চোখে বললেন, 'যেয়ো, বাবা, একবার আমাদের ওখানে।' চোখ মুছে একটু তাকিয়ে রইলেন অরুণের দিকে। বদ হোক, যা-ই হোক, জামাই তো।

রাত্তিরে বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

তারপর কয়েকটা দিন অত্যন্ত চুপচা[illegible] কাটলো। অরুণ বাড়িতেই আছে, অর্থাৎ বাড়িতেই খায় শোয়, বাকি সময় কী করে সে-ই জানে। হৈমন্তী স্বামীর সঙ্গে একটা কথাও আর বলেননি, চোখে চোখ পড়লেও এড়িয়ে যান। মিনির আরো একটু পরিবর্তন হয়েছে; সে শাদা শাড়ি ছাড়া পরেই না, চুল বাঁধে না, কথা বলে কম, সংসারের যেটুকু দেখাশোনা করতো, তাও ছেড়ে দিয়েছে। আলুথালু উদাসীনতা তার চেহারায়, মুখ ম্লান, দেখলে তপস্বিনী মনে হয়।

বুলিও বদলেছে। চোখে দীপ্তি, ঠোঁটে দৃঢ়তা, চাল-চলনে আত্ম-বিশ্বাসী স্বাচ্ছন্দ্য। তার জৈব প্রাণশক্তি আর কথায় হাসিতে ভঙ্গিতে উপচে পড়ে না, অথচ ম্রিয়মাণও সে নয়, বরং তাকে দেখে মনে হয় মনের মধ্যে মস্ত একটা আলো হঠাৎ জ্ব'লে উঠেছে, তারই আভা সমস্ত মুখে। বাড়িতে এই শোকের ছায়া অগ্রাহ্য ক'রে নানা রঙের কাপড় পরে, নিখুঁত রকম সুন্দর সাজে মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে বেরোয়,

বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে হয়-তো বলে, 'একটু মার্কেটে যাচ্ছি, বাবা। তোমার জন্তে কী আনবো বলো।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের হঠাৎ মনটা কেমন ক'রে ওঠে। সময় এসেছে, একে এবার ছাড়তে হবে।

সেদিন বিকেলে বুলি যখন বেরোচ্ছে, অরিন্দম তাকে ডাকলেন।

'কী, বাবা?'

'শোন্—নিরঞ্জন কি এখনো কলকাতায়? তুই জানিস?'

বুলি লাল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু নিজের লজ্জায় লজ্জিত হ'লো। জোর ক'রে তাকালো বাপের চোখের দিকে। বললে, 'হ্যাঁ, আছে।'

'দেখা হয় তোর সঙ্গে?'

'হয়।'

'আমার তো মনে হচ্ছে সে অনেকদিন আসে না আমাদের বাড়িতে।'

'না, আসে না অনেকদিন। বাইরেই দেখা হয় আমার সঙ্গে

'আসে না কেন রে?'

'তা তো জানি না।'

'তুই বলিস না আসতে?'

বুলি চুপ ক'রে রইলো।

'ওকে একদিন আসতে বলবি?'

'বলবো।'

'যদি পারে কালই আসে যেন। আমার একটু দরকার আছে ওর সঙ্গে।'

মুহূর্তের জন্ত বাপে-মেয়েতে চোখোচোখি হ'লো।

'বাবা, একটা কথা বলবো?'

'যা ইচ্ছে বল্।'

'দাদা কিছু টাকা নিয়েছিলো ওর কাছ থেকে।'

অরিন্দম ক্লান্তভাবে বললেন, 'কত টাকা?'

'কত—একশো না একশো কুড়ি। সেইজন্যেই দাদার খোঁজে ছু'দিন এসেছিলো।'

'হুঁ।'

'ও আমাকে বার-বার বলেছিলো কাউকে যেন না বলি—কিন্তু তোমাকে না-ব'লে পারলুম না।'

'নিরঞ্জন তোকে সব কথাই বলে বুঝি?'

'এটা ব'লে ভালোই করেছে। টাকাটা ফেরৎ না-পেলে ওর একটু মুশকিলই হবে।'

'পাবে ফেরৎ।'

'ও অবশ্যি আশা ছেড়েই ছিয়েছে—দাদার কথা জানতে তো কিছু বাকি নেই।'

'তুই বলেছিস বুঝি?'

'আমি ছু' একটা কথা ব'লে থাকতে পারি, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি শুনেছে বন্ধু-বান্ধবের কাছে। এমন অনেক কথা শুনেছে যা তুমিও জানো না।'

'আমি! আমি তো সব চেয়ে কম জানি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে অরিন্দম বললেন, 'আচ্ছা, তুই যা।'

বুলি চ'লে গেলো, অরিন্দম তার পিছনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন উৎসাহ ওর পা ফেলায় যেন জীবনটাকে ও এইমাত্র আবিষ্কার করেছে।

অরিন্দম মন স্থির ক'রে ফেলেছেন। বুলির বিয়ে দেবেন নিরঞ্জনের সঙ্গে। যদি সম্ভব হয়, এক্ষুনি, নিরঞ্জন বর্মা যাবার আগেই। কিংবা বর্মা ও না-ই গেলো, ছেড়ে দিক চাকরি, ওর মতো করিৎকর্মা ছেলের

অন্য কাজ জোটাতে দেরি হবে না। আমিও সাহায্য করতে পারবো। দিন পনেরো ছুটি বাড়িয়ে নিলে হয়, কলকাতায় বিয়ের ব্যবস্থা করতে ক'দিন আর লাগে। এবারে একটু দেখেই নিরঞ্জনকে ভালো লেগেছে তাঁর। ওর ছাঁচটাই অরিন্দমের পছন্দ। জীবনকে সহজে নেয়, নির্ভয়ে নেয়, নালিশ নেই আবদার নেই, মা-বাপ আত্মীয়স্বজনের বেড়াজাল নেই, তবু ছন্নছাড়া নয়, নিজের মধ্যেই খুঁটিতে বাঁধা। ভালোমানুষ, কিন্তু বোকা নয়; সাধারণ, তবু বুদ্ধিমান। এ-রকম একটা ছেলে তাঁরও তো থাকতে পারতো।

তার উপর বুলিরও ওকে ভালো লেগেছে। সেটাই আসল কথা। নিজে বাইশ-শো টাকা মাইনে পান ব'লে আস্ত আই. সি. এস.-এর সঙ্গে ছাড়া তাঁর মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না এ-রকম কোনো মোহ তাঁর মনে নেই। নিরঞ্জন তো বেশ ভালো। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে নেই, পরিশ্রমে আপত্তি নেই, আহ্লাদি ছিচকাঁদুনে স্বভাব ওর হ'তেই পারে না। সত্যি বিয়ে করার যোগ্য। আর কী চাই? বুলি সুখী হবে।

বিয়ের পরেই মেয়ে একেবারে অত দূরে চ'লে যাবে এতে অরিন্দমের মন সায় দেয় না। আবার বিবাহিত মেয়েকে নিজের কাছে ধ'রে রাখাটাও তাঁর ভালো লাগে না; বিয়েই যদি হ'লো একসঙ্গে থাকতেই হবে দু'জনকে। নিরঞ্জন বর্মা না-গেলেই যে সব চেয়ে ভালো হয়, তাঁর মনের এই দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয়ও দিতে চান না, অস্বীকারও করতে পারেন না। তাঁর গোপন ইচ্ছাটা এই যে একেবারে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়েই নাগপুর ফিরবেন। দুঃখের পাথর ফেটে আবার একটি আশার কুঁড়ি ধরেছে তাঁর মনে। আবার থেকে-থেকে ঝলক দেয় সাঁওতাল পরগনার ছবি, ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ছোটো বাড়ি, কাঁকরের লাল রাস্তা, বুলির জন্য একটা হরিণ। সত্যি, পেনসন্ নিয়ে আর

কলকাতায় না। ওরা কেউ না আসে একাই থাকবো। হঠাৎ একদিন বিকেলে বুলি আর নিরঞ্জন আসবে দু'শো মাইল মোটার দৌড়িয়ে, লাল ধুলো মাখা মাথা, চোখে কালো চশমা, রোদে-পোড়া তামাটে মুখ। ওদের হাসির শব্দ মনে-মনে কল্পনা ক'রে অরিন্দমের বুক যেন ভ'রে গেলো। জীবনের উপর তাঁর মুঠি আলগা হ'য়ে আসছিলো, বুলির বিবাহের সম্ভাবনায় আবার একটা আঁকড়ে ধরবার মতো শক্ত জায়গা পেয়েছেন।

এদিকে নিরঞ্জনের যাবার দিন প্রায় এসে পড়লো। বুলি বললে, 'সত্যি এই রোববারেই যাবে?'

'না গিয়ে আর উপায় কী?'

উটরাম ঘাটের জেটিতে ব'সে ছিলো তারা। অন্ধকার রাত, গঙ্গার ঘোলা জলে আলোর উল্কি আঁকা।

একটু দূরে একটা জাহাজ সমস্ত আলো জ্বালিয়ে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে, সেদিকে তাকিয়ে বুলির মনে হ'লো যে তার সমস্ত জীবন, জীবনের সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়ে ঐ জাহাজ একদিন চ'লে যাবে কোথায় কে জানে।

হঠাৎ নিরঞ্জনের হাতের উপর হাত রেখে বুলি বললে, 'যেয়ো না।'

নিরঞ্জন বুলির হাতে চাপ দিয়ে বললে, 'ভয় কী! ফিরে আসবো।'

বুলি বিহ্বলের মতো ব'লে উঠলো, 'কী শক্ত তোমার হাত! কী সুন্দর তুমি,' ব'লে হাতখানা দু' হাতের মধ্যে নিয়ে মুখের উপর চেপে ধরলো।

নিরঞ্জন আস্তে বললে, 'এই—ওদিকে কারা সব দাঁড়িয়ে।'

বুলি হাত ছেড়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'চিঠি লিখো।'

'লিখবো।'

'কিন্তু চিঠি আসতে নাকি দশদিন!'

'তা দিন ছয়েক তো।'

একটু কাটলো চুপচাপ, তারপর বুলি বললে, 'কবে আসবে আবার?'

'সামনের বছর ছুটির চেষ্টা করবো।'

সা-ম-নে-র ব-ছ-র!'

'আমাদের ঐ বছরে একমাস ছুটি।'

'না—না—তুমি যেয়ো না। কী হবে গিয়ে। আমি পারবো না—আমি আর পারি না।' বুলি তার মাথাটা নিরঞ্জনের কাঁধের উপর রাখলো।

লোকগুলো স'রে গেছে, জেটিতে তারা একা। একটা নৌকোয় দু' জন মুসলমান মাঝি রান্নার আয়োজন করছে, তাদের দাড়িওলা বুড়ো মুখ এই ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, এই ফুটে উঠছে উনুনের আগুনে টকটকে লাল হ'য়ে।

নিরঞ্জন বললে, 'তুমিও চলো না আমার সঙ্গে।'

'যাবো? সত্যি বলছো?'

'আমি বললেই তুমি যেতে পারো?'

'পারি না!'

একজন মাঝি নদীর জলে চাল ধুতে-ধুতে হঠাৎ উপরের দিকে তাকালো। বুলি মাথা সরিয়ে এনে সোজা হ'য়ে বসলো।

ট্র্যামের রাস্তার দিকে যেতে-যেতে বুলি বললে, 'বাবা তোমাকে কাল একবার যেতে বলেছেন।'

'আমাকে?'

'কী কথা আছে তোমার সঙ্গে বললেন।'

'আমার সঙ্গে তাঁর কী-কথা বলো তো?'

'আমি কেমন ক'রে বলবো?'

নিরঞ্জন একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, যাবো। যাবার আগে এমনিও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতাম। তোমাদের বাড়িতে খেলাম যেদিন, তিনি কী-রকম মজার-মজার সব গল্প করছিলেন, মনে আছে? ভারি ভালো লেগেছিলো।'

বুলি সগর্বে বললে, 'আমার বাবা খুব ভালো। ও-রকম মানুষ হয় না।' তারপর হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা, তুমিই তো বাবাকে বলতে পারো।'

'কী বলবো?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বুলি বললে, 'বলবে—যাতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো। কথাটা যে তারও মনে না হয়েছে এমন না। কিন্তু হাতে এখন সময় এত কম—এর মধ্যে কী ক'রে কী হবে? এই ক'দিনের মধ্যেই কী যে তোলপাড় হ'য়ে গেলো তার জীবনে—সে নিজেই এখনো ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি, মন ধাঁধিয়ে আছে। শুধু মনের মধ্যে কেমন একটা ভোঁতা ব্যথা সব সময় অনুভব করে; জানে, যে-মুহূর্তে জাহাজে চড়বে অসহ্য হ'য়ে উঠবে এর ধার। যদি সে না-গিয়ে পারতো, যদি কলকাতায় কোনোরকমে বেঁচে থাকবার একটা সংস্থানও তার থাকতো! এক-এক সময় এও মনে হয়েছে—না-হয় থেকেই যাই, কী আর হবে, এত বড়ো শহরে কিছু একটা জুটবেই। মাঝে একদিন তাদের কলকাতার আপিশের বড়ো সায়েবের সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছিলো, কলকাতাতেই আমাকে রাখো না। সায়েব অবাক হ'য়ে বলেছিলেন—বলো কী ছোকরা! তোমার বয়েসে এ-রকম একটা চান্স ক'টা লোক পায়! আমি হ'লে তো লাফাতুম। কানেই তুললেন না কথা। কথাটাও ঠিক, বর্মি জঙ্গলে বছর দুই টিঁকতে পারলে হয়তো এক লাফেই জুনিয়র

অফিসারের চেয়ার পাবে। তার পক্ষে স্বর্গ। কাজকর্ম সে ভালোই করে, কর্তৃপক্ষ খুসি। এই দুর্দিনে এ-রকম একটা চাকরি সে আর কি পাবে! তাছাড়া যে-কোনোরকম একটা কাজই বা এক্ষুনি তার জুটবে কোথায় কলকাতায়! এবার তো ভেসে পড়ি, তারপর, বুলি যদি মনে রাখে . . .

বুলি বললে, 'কিছু বলছো না যে?'

নিরঞ্জন ম্লান হেসে বললে, 'কী বলবো।'

'কী বলবে মানে?' বুলি হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেলো। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোয় নিরঞ্জন দেখলো, তার চোখ চকচক করছে, ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'য়ে গিয়ে দাঁতের শাদা আভা দেখা যাচ্ছে।

নিরঞ্জন অস্ফুটস্বরে ডাকলে, 'বুলি!'

'তুমি ভারি ভীরু।'

'আমি ভীরু! কত সাহস আমার, তোমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছি! তুমি আমাকে দুর্বল ক'রে দিয়ো না। আমি ঠিক ফিরে আসবো। তুমি—তুমি ভুলো না।'

'আমি ভুলবো!'

হঠাৎ আর-একখানা মুখ নিরঞ্জনের চোখের সামনে ফুটে উঠলো। অনেকটা এই মুখেরই মতো। বিদ্যুতের মতো তার মনের মধ্যে খেলে গেলো যে সে যেমন বুলিকে পেয়ে মিনিকে ভুলেছে, বুলিরও তেমনি আর-একজনকে পেয়ে তাকে ভুলতে কতক্ষণ!

বুলি তাকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বললে, 'করো কী! চাপা পড়বে যে।'

মুহূর্ত পরেই মিলিয়ে গেলো মায়া, হারিয়ে গেলো এই অসম্ভব চিন্তা, রাজধানীর উজ্জ্বল চওড়া রাস্তায় নিরঞ্জন বাস্তবের মুখোমুখি জেগে উঠলো।

তারপর খানিকক্ষণ ওরা হাঁটলো চুপচাপ।

ট্র্যামের রাস্তার কাছাকাছি এসে বুলি বললে, 'আর-এক কথা। বাবা বলেছেন সেই টাকাটা তোমাকে দিয়ে দেবেন।'

'টাকা! টাকা কিসের?'

'সেই যে দাদা নিয়েছিলো।'

নিরঞ্জন ঈষৎ লাল হ'য়ে বললে, 'সে কী, তুমি আবার সে-কথা বলেছো নাকি তাঁকে?'

'বলবো না কেন?'

'তিনি তো কাগজে বিজ্ঞাপনই দিয়ে দিয়েছেন—'

'তাতে হয়েছে কী?'

'ভালোই করেছেন। ও শুধু আমার কাছ থেকেই তো নেয়নি—আরো অনেকে—'

বুলি মাথা ঝেঁকে বললে, 'আরো অনেকের কথা জানিনে, আমার দাদার অন্যায়ের জন্য তুমি কেন ভুগবে?'

নিরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, 'অন্যদের উপর আমিও একটা অন্যায় সুবিধেই পেলাম।'

বুলি শান্তভাবে বললে, 'তা তো পেলেই।'

নিরঞ্জন আর-কিছু বললে না। যে-টাকার আশা সে আর রাখেনি তা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনায়, এই আসন্ন বিচ্ছেদের মুখেও, মনে-মনে সে বেশ খুশিই হ'লো।

তু'জনে এসে দাঁড়ালো ট্র্যাম যেখানে দাঁড়ায়। বুলি এবার বললে, 'এসো কিন্তু কাল।'

'যাবো।'

'কখন আসবে?'

'যখন বলবে।'

'সকালেই এসো না।'—বুলি তাদের বিকেলের বেড়ানোটা নষ্ট করতে চায় না। এ ক'দিনে যতটা পাওয়া যায়।

শোঁ-ও ক'রে বালিগঞ্জের ট্র্যাম এসে পড়লো। বুলি উঠে বসতে-না-বসতেই ট্র্যাম দিলে ছেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকিয়ে নিরঞ্জনকে সে আর দেখতে পেলো না। ট্র্যাম-লাইনের ধারে কালো-কালো গাছগুলোর ছায়া এর মধ্যে ওকে গিলে ফেলেছে। ধ্বক্ ক'রে উঠলো বুলির বুকের মধ্যে—নিরঞ্জন চ'লে গেলে সে কেমন ক'রে টিঁকবে? কী উপায় হবে তার? চৌরঙ্গির উজ্জ্বল আলো, জনতার বিচিত্র লীলা এমন অবাস্তব তার মনে হয়নি কখনো। নিরঞ্জন নেই, এই কল্পনাতেই যদি এত দুঃখ, তবে ও যখন সত্যিই থাকবে না কেমন ক'রে সইবো? তার উপর বাবাও চ'লে যাবেন দু'দিন পরে, আর বাড়ির তো এই অবস্থা! অসম্ভব—বাবা না-থাকলে বুলিকেও ছাড়তে হবে বাড়ি। দাদা সুদ্ধ নাকি মহামায়াতে মজেছে—আর কী চাই? আর টেকা যাবে না। একটা মানুষ ছারখার ক'রে দিলে আমাদের বাড়ি। সুখ নেই, শান্তি নেই, হাসি নেই। সবগুলো মানুষের হৃদয় ঐ মহামায়া যেন উপড়ে তুলে নিয়েছেন। দিন-দিন আরো উদাসীন, আরো হৃদয়হীন হ'য়ে উঠছে বাড়ির হাওয়া। ঈশ্বরে মন গেলে এইরকম নিষ্ঠুর হয় নাকি মানুষ? মিনির চোখে এত বিষ, ওর দিকে তাকানো যায় না। মা বোধ হয় আরো উপরে উঠেছেন—তাই কাকে কখন দুঃখ দিলেন তা তাঁর নজরে পর্যন্ত পড়ে না। তাঁর অবহেলার জন্যেই তো দাদার ছেলেটা মরলো। প্রথমেই ডাক্তার ডাকলে হয়-তো এ-রকম হ'তো না। মা-মহামায়াই আছেন, ডাক্তার লাগবে কিসে। এখন বৌদিকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত, ভাবখানা এমন যেন ওখানেই তাঁর জীবন কাটবে। দাদার অত্যাচারে বৌদি কি আর মানুষ আছেন! কোনোদিন বৌদির দিকটা ছাখেননি মা, দাদা যা ইচ্ছে তা-ই করেছে,

কিছু বলেননি। ছেলেকে সামলাতে না পারুন, বৌ-কে আগলে থাকতে পারতেন তো। কত ছোটো-ছোটো উপায় ছিলো, যাতে বৌদিকে সুখী করা না যাক্‌ অন্তত দুঃখটা কিছু ভুলিয়ে রাখা যেতো। কী দরকার—মা-মহামায়াই শাস্তি দেবেন।

ছেলেটা মরলো, এ-বাড়িতে বৌদির আর রইলো কী? মানুষের দয়ামায়া অন্তত থাকে, দাদার তা-ও নেই দেখা গেলো। দিব্যি আছে। মায়া-মন্দিরে যাচ্ছে রোজ। বলা যায় না, একদিন হয়-তো মহামায়ার আদেশ পাবে, বৌ-টৌ ত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসবে। যারা বদ, তাদের পক্ষে ধর্মের ঐ তো মস্ত আকর্ষণ—তার আড়ালে সবই করা যায়, নিন্দে হয় না। মোট কথা, বৌদির জীবনটাই গেলো। মা যতদিন মহামায়ার কথায় উঠবেন-বসবেন, বৌদির কোনো আশা নেই। আর তার—বুলিরই বা কী আশা, যে-মুহূর্তে বাবা চ'লে যাবেন? মিনি হয়-তো তখন রীতিমতো নির্যাতন শুরু করবে। মা-কে দেখে-দেখেই ও সব শেখে—আর মা-র তো অদ্ভুত ক্ষমতা এ-বিষয়ে। বাবার সঙ্গে এবার যে-রকম ব্যবহার করছেন, কোনো স্ত্রী কোনো স্বামীর সঙ্গে এ-রকম করে না—অন্তত বুলি তো কোনো নভেলে এ-পর্যন্ত পড়েনি। কী বিশ্রী! বাবা কেমন ক'রে সহ্য করছেন, আর সহ্য করছেনই বা কেন? দিতে পারেন না মা-কে আচ্ছা ক'রে দু' কথা শুনিয়ে! উচিত শিক্ষা দিতে কী লাগে! বাবা তো ইচ্ছা করলেই পারেন। আসল কথা—বাবা অত্যন্ত ভালোবাসেন সকলকে, আর তারই সুযোগ নিয়ে যার যা খুশি তা-ই করছে, যার প্রশ্রয়ে এত সাহস উল্টে তারই উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

মা, বাবা, মিনি, দাদা, লোকজন বন্ধু-বান্ধব—কী সুখী ছিলো ওরা সকলে মিলে। সে-সুখে আগুন লেগেছে। এই সেদিনও সে ভাবতো তার মতো সুখী জগতে কেউ নেই। ছেলেবেলার নানা-রঙা হালকা

দিনগুলির দিকে মনে-মনে মুগ্ধ চোখে সে তাকিয়ে রইলো, যেমন আমরা চোখ ভ'রে দেখে নিই চারদিকের শোভা, কোনো সুন্দর জনপদ ছেড়ে যাবার দিনে।

স্বর্গ ছিলো বাড়ি, সে-বাড়ি ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে—বুলির মনের মধ্যে নানা সুরে ঘোরাফেরা করতে লাগলো কথাটা। অতীতের দিনগুলির জন্য একদিকে যেমন মমতায় বুক ছলছল করে, অন্যদিকে তেমনি মুক্তির একটা উল্লাস রক্তে জোয়ার আনে। ভেঙেছে স্বর্গ—কিন্তু এ-স্বর্গ তাকে কতকাল আর ধ'রে রাখতে পারতো! নতুন অদ্ভুত সুখ এসেছে জীবনে: সে-সুখ এত তীব্র যে মুহূর্তে একদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সমস্ত অতীত এরই মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো একটি রঙিন ছবি হ'য়ে উঠেছে—জীবন ভ'রে দেখবে, কিন্তু ফিরে যেতে চাইবে না।

বুলি ভেবে দেখলো সত্যি তার বাবার সঙ্গে নাগপুর চ'লে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপাতত বাঁচবে তো, তাছাড়া বাবাও সুখী হবেন। কিন্তু তারপর? বাবাকে সুখী ক'রেই জীবন কাটবে নাকি তার? কত দূরে চ'লে যাবে নিরঞ্জন, কবে আসবে আবার, এলেও দেখা হবে কিনা, আর দেখা হ'লেও···হঠাৎ মিনির কথা মনে প'ড়ে বুলির চিন্তার স্রোত থমকে দাঁড়ালো। কে জানে কী হবে! ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ভয়ে, সংশয়ে উৎকণ্ঠায় ভরা। আজ যা ভাবতেও পারে না, তা হ'তে কতক্ষণ! ভবিষ্যতের কালো গুহায় কোন্ নির্মম পরিবর্তন লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে! ভবিষ্যতের দায়িত্বজ্ঞান নেই, সঙ্গতিবোধ নেই, মায়া-মমতা নেই। সে যা খুশি তা-ই ঘটায়। তার স্বেচ্ছাচারিতায় মরবো নাকি আমি! না, না, তা হ'তেই পারে না। যেতে দেবো না আমি ওকে, ওকে ধ'রে রাখবো, বেঁধে রাখবো, ওকে বলতেই হবে, 'আর কিছু জানি না, বুঝি না, তোমাকে ছাড়া আর চলবে না।'

তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। চাই চাই তোমাকে চাই, দূর হোক্ অন্য সব ভাবনা। এখনই চাই। ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেবো না, নিজেরাই নেবো। সব চেয়ে বড়ো যে-সত্য তাকে দূরে ঠেলে কী-সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এমন বোকা আমরা।

বুলির কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম দেখা দিলো। ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলো। ট্র্যাম রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে এসে পড়েছে।

বুলি মন ঠিক ক'রে ফেললো। আজ রাত্রেই সে বলবে বাবাকে। এতদিন এই সহজ কথাটা কেন মনে হয়নি ভেবে অবাক লাগলো। বাবাই তো আছেন তার মস্ত বন্ধু, তার ভাবনা কিসের? সে যা চায় তা-ই হবে। বাবা হওয়াবেন। তাছাড়া তিনি নিজেই কি আর এতদিনে কিছু লক্ষ্য না করেছেন! করেছেন, নয়তো আজ তার কাছে নিরঞ্জনের কথা পাড়বেন কেন? আসতেই বা বলবেন কেন? তাঁর মনেও কিছু হয়েছে এ তো বোঝাই যায়। ভয় কী, বাবাকে সে সব খুলে বলবে, তিনি বুঝবেন। বলতেই হবে—তা ছাড়া আর উপায় নেই।

কী-ভাবে কথাটা আরম্ভ করবে, বুলি তার মহড়া দিতে লাগলো। বাড়ি ফিরে, কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে, বাথরুমে গিয়ে, ভাত খেতে-খেতে অনেকবার মনে-মনে আওড়ালে কথাটা। তারপর, খাওয়ার পরে অরিন্দম যখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে আরাম করছেন, হাতের কাছে কাচের টেবিলে পেগটি র'য়েছে, আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট, বুলি গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর কাছে।

'বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বল্।' কিন্তু কথাটা যে কী, মেয়ের মুখ দেখেই তা অনুমান করতে তাঁর দেরি হ'লো না।

'আলোটা নিবিয়ে দিই, বাবা? বড্ড চোখে লাগে।'

'তোর দরকার না-থাকলে আমার কোনো দরকার নেই আলোর।'

বুলি আলো নিবিয়ে দিয়ে নিচু একটি মোড়ায় বসলো।

'বাবা!'

'উপস্থিত। আরম্ভ কর্।'

'বাবা, তোমার মত পেলে শিগগিরই একটা বিয়ে হ'তে পারে।'

'এত বড়ো একটা শুভ ঘটনা শুধু আমার মতের জন্যেই আটকে আছে এ তো ভালো কথা না। আর-সবই ঠিক বুঝি?'

'পাত্র-পাত্রী ঠিক। বাকিটা তোমার উপরে ভার।'

'স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে পারিস।'

'পারি তো? তাহ'লে সবটাই শোনো।'

কিন্তু সবটা শোনবার জন্য অরিন্দমের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেলো না। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো কথা! নিরঞ্জনকে আসতে বলেছিলি?'

'বলেছিলুম। কাল সকালেই আসবে।'

'সকালেই!'

'কেন, তখন তোমার অসুবিধে?'

'খুব সকালে আসবে না তো?'

'ভেবো না—আমি তোমাকে ভোরবেলা জাগিয়ে দেবো।'

'তাহ'লে তো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। যা, আর দেরি করিসনে।'

'কিন্তু আমার সব কথা তো শুনলে না।'

অরিন্দম একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ভাবিসনে, নিরঞ্জনের সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। এখন ঘুমো গে।'

বিদ্যুৎ ব'য়ে গেলো বুলির শরীরে।

অরিন্দম মেয়ের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে আবার বললেন, 'কিচ্ছু ভাবিস্‌নে, যা।'

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে ব'সে অরিন্দম জিজ্ঞেস করলেন, 'বুলি, নিরঞ্জন ক'টার সময় আসবে বলেছে?'

মিনির বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা হাতুড়ির বাড়ি পড়লো—'কেন, ও আসবে কেন?'

অরিন্দম বললেন, 'আমি আসতে বলেছি। কখন আসবে?'

বুলি উদাসীনভাবে বললে, 'এক্ষুনি এসে পড়তে পারে।'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মিনি বুঝলো কী যেন একটা ভাবনা তাঁর মনের মধ্যে চলেছে। ওকে আসতেই বা বললেন কেন তিনি? কী ব্যাপার? মিনির বুকের ভিতরটা দুড়দুড় করতে লাগলো।... কিন্তু কেন? নিরঞ্জন কে? কেউ না। কেউ না। নিজের উপর অত্যন্ত রাগ হ'লো মিনির। ও আসুক বা যাক্‌, মরুক বা বাঁচুক, তার তাতে কী? সে এক্ষুনি উঠে স্নান ক'রে মা-র ধ্যানে বসবে, ভুলবে সব, উঠবে মরলোকের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে। ইন্দ্রিয়ের কারাগারে আর বন্দী থাকবে না সে। মুখও দেখবে না ওর। না, মুখও দেখবে না। চেয়েছিলো বুলিকে বাঁচাতে, বাবাই হ'লেন অন্তরায়। এত ক'রে বললুম—গায়েই মাখলেন না। উল্টো আমার উপরেই চোট। কেউ কোনো বাধা দেয় না, যখন খুশি যায় যখন খুশি ফেরে, কী যে বিশ্রী কাণ্ড হচ্ছে! যাকৃগে, আমার কী। বুলি নিজেই মরবে। ও উচ্ছন্নে যাক, ওর সর্বনাশ হোক—আমি এর মধ্যে আর নেই।

মিনি চায়ের পেয়ালা শেষ না-ক'রেই উঠে গেলো।

নিরঞ্জনের কথা ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একজনও পেয়ালায় খুব ঘন-ঘন চুমুক দিতে লাগলো। সে অরুণ। সাধারণত সে তার শোবার ঘরেই সকালের চা-টা খায়, আজ কী মনে হয়েছে, সকলের

সঙ্গে এসে বসেছে। কোনোরকমে খাওয়া শেষ ক'রেই উঠে যাচ্ছিলো, অরিন্দম বাধা দিলেন।

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

প্রশ্নটা নিরর্থক, অর্থাৎ উত্তর পাবার জন্য প্রশ্ন নয়, নেহাৎই কথা আরম্ভ করবার জন্য।

'যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি ?'

'আজ যাবো।'

'কেন দেরি করছিস মিছিমিছি ? আজই যাস্ কিন্তু—এক্ষুনি যা না। নীরদ এ-সময়ে থাকে।'

'আচ্ছা।'

অরুণ পালালো। ডাক্তারের কাছে যেতেও তার আলস্য। তাছাড়া নানারকম প্রশ্নের আশঙ্কা। বিশেষ ক'রে নীরদ ডাক্তারকে সে এড়াতে চায়। এ ক'টা দিন তা-না-না-না ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়, বাবা চ'লে গেলে আর ভাবনা কী। তিলকে তাল করাই ডাক্তারের কাজ। সিফিলিস না হাতি! ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে না, এখন দোষ চাপাচ্ছে আমার ঘাড়ে। একবার অবশ্যি—তা ও তো আপনিই সেরে গেলো। কিছু না, কিছু না, সব ডাক্তারদের পয়সা কামাবার কারসাজি। সুস্থ শরীরে চিকিৎসা করিয়ে পয়সা নষ্ট করবে, এমন বোকা নাকি সে। ও-পয়সা দিয়ে কত ভালো-ভালো কাজ করা যায়—গরমের দুপুরে ঠাণ্ডা হওয়া যায়, সর্দি সারানো যায়, জেনারল হেল্‌থ্ ইমপ্রুভ করা যায়। আবার যদি কিছু হয় তখন না-হয় দেখা যাবে। তা আর-কিছু হবেও না, ও সেরে গেছে।

বুলি বললে, 'তোমাকে আর-এক পেয়ালা কফি দেবো, বাবা ?'

অরিন্দম পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। রোজ তিনি বিছানায়

শুয়ে-শুয়েই কফি খান, দাড়ি কামিয়ে, স্নান ক'রে, কাপড় প'রে নিচে নামতে-নামতে সাড়ে ন'টা বাজে। আজ ঘুম ভাঙতেই বুলি তাঁকে টেনে নিচে নামিয়েছে।

নিজে এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে বুলি বললে, 'জানো, বাবা, দাদাও তো একজন ভক্ত হ'য়ে উঠেছে।'

চোখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধ'রে অরিন্দম বললেন, 'হুঁ।'

'রোজই যায় মায়া-মন্দিরে।'

কাগজ থেকে চোখ না-তুলে অরিন্দম বললেন, 'তুই কী ক'রে জানলি?'

'বাঃ, এ তো সকলেই জানে। মা সেদিন বলছিলেন দাদাকে, "তুই কাল যাসনি কেন রে মন্দিরে? মা জিগেস করছিলেন।" তার মানে রোজই যায়। তুমি জানতে না?'

অরিন্দম কাগজ থেকে চোখ তুললেন। একটু হেসে বললেন, 'না তো। আমি যে কত কম জানি ভেবে এক-এক সময় অবাক লাগে।'

বুলি বললে, 'ছেলেটার জন্যে দাদার মনে-মনে খুব কষ্ট কি আর না হয়! এবার হয়তো বদ্‌লে যাবে।'

'তোর তা-ই মনে হয়?' অরিন্দম চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন।

'বৌদির কাল চিঠি এসেছে। উঃ, পড়া যায় না।'

'কাকে লিখেছে?'

'লিখেছে মা-কেই, মা সকলকে দেখাচ্ছিলেন।'

অরিন্দম মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে গেলেন। থেকে-থেকে বুকের ভিতরটা কী-রকম মুচড়িয়ে ওঠে। উজ্জ্বলার চিঠির কথাটাও কি আমাকে বলবার মতো নয়? আর উজ্জ্বলাও তো আমাকে দুটো লাইন লিখতে পারতো।

'কী লিখেছে ?'

'আর-কিছু না, কেবল মা-মহামায়ার কথা।'

'সেইজন্যেই বললি পড়া যায় না ?'

'পড়তে-পড়তে এমন কষ্ট হয় ! আমি আর বাঁচতে চাই না—মা-কে বোলো তিনি যেন আমার জন্যে এই করেন যে শিগগিরই আমার মরণ হয়। এই সব আরকি। মা-র প্রসাদী বেলপাতা আরো কী-কী সব পাঠাতে লিখেছে।'

মা-মহামায়া চারদিক থেকে অরিন্দমকে ঘিরেছেন। মুহূর্তের জন্য অরিন্দমের মনে হ'লো তাঁর অস্তিত্বটুকু সুদ্ধ লুপ্ত ক'রে দেবার জন্য একটা অস্পষ্ট চক্রান্ত ঐ মহামায়ার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে দ্রুতবেগে এগোচ্ছে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'উজ্জ্বলা ভুল করেছে। ও-সব প্রসাদী ফুল-টুল পেয়ে ওর আয়ু তো আরো বেড়েই যাবার কথা।'

বুলি আস্তে একটু হাসলো।

'অরুণকে চিঠি লিখেছে উজ্জ্বলা ?'

'তা তো জানি না। দাদা তো একবার গেলেও পারেন টাটানগর—বৌদির মনটা একটু ভালো হয়।'

'হয় নাকি ? তুই যদি উজ্জ্বলা হতিস তোর হ'তো ?'

'এ-রকম অবস্থা আমার হ'তোই না কখনো', বুলি, মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো।

'কেন হ'তো না ?'

'ও-রকম অমানুষকে আমি কখনো বিয়ে করি !'

'কী ক'রে বুঝবি আগে ?'

'তা যায় বোঝা।'

'বিয়ের আগে যে মানুষ, বিয়ের পরে তার অমানুষ হ'তে কতক্ষণ !'

'পাগল !'

একটু কাটলো চুপচাপ। হাতের কাগজটা সরিয়ে রেখে অরিন্দম বললেন, 'আচ্ছা, মিনির কী হয়েছে বল্ তো।'

'কী আবার হবে।'

'ওর ভক্তির জ্বর যে ডিলিরিয়মে গিয়ে ঠেকেছে।'

বুলি কিছু বললে না। এখানটাই তার মনের কাঁচা জায়গা। আগে হ'লে মন খুলে প্রচুর ঠাট্টা করতে পারতো, এখন আর ঠাট্টা আসে না মুখে। সে জানে মিনির মনের কথা। জানে, কিন্তু সেটা সে সব সময়ই তার মনের একেবারে তলায় ঠেলে রাখে। যাকে সে পেয়েছে, তাকে সে একেবারেই আনকোরা পায়নি, আর-একজন মেয়ের দিকে কোনোদিন সে ঠিক এইরকম চোখেই তাকিয়েছে, এ-চিন্তা বুলি সইতে পারে না। তাই সে চেপে রাখে মনের তলায়। এতদিন ধ'রে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার এত কথা হচ্ছে, কিন্তু ভুলেও কখনো মিনির নাম মুখে আনেনি, নিরঞ্জনও আনেনি। দু'জনের মধ্যে এ-বিষয়ে নীরব একটা বোঝাপড়া যেন প্রথম থেকেই হ'য়ে আছে। নিরঞ্জনের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে, মিনির অস্তিত্ব সে একেবারে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। ভুলে থাকেও। আবার বাড়িতে যখন মিনিকে ছাখে, মিনি যে-যন্ত্রণায় ছটফট করছে তা যখন তার সামনে ধরা প'ড়ে যায়, তখন জয়ের তীব্র আনন্দে বুলির বুক ভ'রে যায়। এমন নয় যে ও ছুঁড়ে ফেলেছে আর আমি লুফে নিয়েছি। ওরই জন্যে কপাল কুটে মরছে তো এখনো। আমি জিতেছি, এখন ও যদি আমার পায়ে ধরেও কাঁদে, তবু আমি ছাড়বো না।

এ-সব জ্ঞান বুলির নব লব্ধ। সেই যে-রাত্রে মিনি তাকে অমন ক'রে শাসালে, বললে, 'কাঁদতে হবে তোকে,' সেদিনও বুলি কিছুই বোঝেনি, মিনির মুখে হঠাৎ এ-রকম নিষ্ঠুর কথা শুনে তার বরং কান্নাই

পেয়েছিলো। কিন্তু যেদিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে পিছনে মিনির চীৎকার শুনলো, 'বুলি, তুই আমাকে মেরে ফেললি!' সেদিন এক ঝলকে সে সব বুঝে ফেললো। তার পর থেকে মিনিও তাকে আর-কিছু বলেনি। এমনকি মিনি পারতপক্ষে আর কথাই বলে না তার সঙ্গে, তাতে আবার বুলির মনে কষ্ট হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে ভালোবাসা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বোনে-বোনে ভালোবাসা নিয়ম। মেয়েরা ঘরে থাকে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই ওদের মনের অবচেতনে এ-কথাটা থাকে যে এমন দিন আসবে যখন বাপ, মা, ভাই, সকলের সঙ্গেই মাঝে-মাঝে দেখা হবে, কিন্তু বোনকে পাঁচ বছরে একবারও হয়তো দেখবে না। নদীতে নদীতে দেখা হয়, বোনে বোনে হয় না। বোনের কাছে বোনের চেয়ে পর আর কে? সেইজন্যে, মা-বাপের কাছে যতদিন একসঙ্গে থাকে, ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের যতটা পারে অগ্রিম শোধ তোলে। বিশেষ ক'রে মিনি আর বুলির মধ্যে এতই গভীর ভালোবাসা ছিলো যে বুলি সেটাকে ভালোবাসা ব'লে চিনতেই পারেনি, যতদিন না মাঝখানে এই ব্যবধান এলো। দাদা বয়েসে অনেক বড়ো, এ-পৃথিবীতে চোখ মেলেই মিনিকে পেয়েছে সঙ্গী, বন্ধু, আশ্রয়। ছেলেবেলায় চার বছরের বড়ো মানে অনেকটা বড়ো, অথচ এত বড়ো নয় যাতে অবজ্ঞা আসে; মিনিও রেখেছে তার বড়োত্বের মর্যাদা, একসঙ্গে খেলেছে খেয়েছে শুয়েছে, কিন্তু ওরই মধ্যে বুলিকে সর্বদা আশ্রয় দিয়েছে, ওর প্রতি কেমন একটা স্নেহের ভাব স্বতঃই জেগেছে তার মনে। এইভাবে এতগুলি বছর কাটলো নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ত উচ্ছ্বাসে, আর আজ এক ধাক্কায় কত দূরে ছিটকে পড়েছে দু'জনে। বুলি ভুলতে পারে না সেই মিনিকে যে তাকে খাওয়ার পরে আঁচিয়ে দিতো, মুখে-মুখে অজস্র ছড়া শেখাতো, শীতের রাত্রে এক লেপের নিচে শুয়ে কত অদ্ভুত গল্প শোনাতো—সেদিন পর্যন্তও একদিন যে

বাড়ি না-থাকলে সমস্ত বাড়িই ফাঁকা লাগতো। আজ কত সহজ হয়েছে তাকে ছাড়া। এতে গর্ব আছে, আনন্দ আছে, সার্থকতা আছে, কিন্তু দুঃখও কি কম! রাত্তিরে একই ঘরে দু'জনে শোয়, কিন্তু কথাবার্তা প্রায় হয়ই না। বুলি মাঝে-মাঝে চেষ্টা করে, মিনি চুপ। হঠাৎ বুলির এত মন-খারাপ লাগে যে চোখে প্রায় জল এসে পড়ে। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। তার পরেই নিজের মধ্যে অনুভব করে জয়ের উন্মাদনী উত্তাপ, কষ্ট ডুবে যায়।

মিনি সম্বন্ধে বুলির মনোভাব তাই অতি বিচিত্র, তার কথা উঠলে বলার মতো কথা সে খুঁজে পায় না।

অরিন্দম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ওর?' তাঁর নিজের মনেও যে একটা সন্দেহ না ঢুকেছিলো এমন নয়। অনেক আগে একবার নিরঞ্জনের সঙ্গে মিনির মেশামেশিটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যাপারটা তুচ্ছ, ভুলেই গিয়েছিলেন, এবার এসে নিরঞ্জনকে না-দেখলে মনেও পড়তো না। কিন্তু কয়েকদিন যেতেই দেখলেন মিনি তো নয়, বুলি। কে জানে, তাঁরই হয়তো ভুল হয়েছিলো। তবু, মনে একটু খটকা লেগেছিলো বুলিকে অধঃপাত থেকে বাঁচাবার জন্য মিনির তীব্র গরজ দেখে। এ তো স্বাভাবিক নয়।

বুলি হেসে বললে, 'মাথা একটু খারাপ হয়েছে বোধ হয়। তার উপর মা যা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন!'

ঠিকই। মন্তী এ করছে কী? এ তো স্রেফ পাগলামি। সাতদিন একটা কথা হয় না ওর সঙ্গে। চোখেও কখনো দেখি ব'লে মনে হয় না। একই বাড়িতে আছি, অথচ ও যেন নেই। কী করি ওকে নিয়ে!

বাইরে জুতোর মৃদু শব্দ শোনা গেলো। বুলি বললে, 'এসেছে বোধ হয়।'

'এখানেই ডাক্।'

বুলি বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলো নিরঞ্জনকে নিয়ে। ঘুম থেকে উঠে কোনোরকমে এক পেয়ালা চা গিলেই চ'লে এসেছে—পারলে রাত ভোর হবার আগেই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো।

অরিন্দম বললেন, 'এসো, নিরঞ্জন।—বোসো।' তাঁর পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

একটু লজ্জিতভাবে হেসে নিরঞ্জন বসলো।

'চা না কফি?'

'চা।'

বুলি টী-পটের গায়ে হাত ঠেকিয়ে বললে, 'এটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। নতুন চা ক'রে আনছি।' ব'লে নিজেই উঠে গেলো টী-পট হাতে নিয়ে। চাকরকে বললেই হ'তো, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরোবার একটা ছুতো পেয়ে সে যেন খুশিই হ'লো। বাবার সামনে নিরঞ্জনের দিকে সে যেন আজ চোখ তুলে তাকাতে পারছিলো না, বাইরে গিয়ে এই লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে আসতে চায়।

অরিন্দম তাঁর টর্কিশ সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও।'

নিরঞ্জন সবিনয় কুণ্ঠার একটা ভঙ্গি করলে।

'খাও না, লজ্জা কী।' অরিন্দম চান না যে স্রেফ এই সিগারেট খাওয়ার জন্যে জামাই তাঁর সঙ্গ এড়াবে, রেলগাড়িতে এক কামরায় চড়বে না, তিনি ঘরে ঢুকলেই বিপন্ন বোধ করবে। কন্যার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তার বন্ধুতা তাঁরও কাম্য। আগে থেকেই লজ্জা ভাঙাতে চান।

অগত্যা নিরঞ্জন সিগারেট ধরালে।

'আর ক'দিন আছো কলকাতায়?'

'এই রোববারেই যেতে হবে।'

'ছুটিটা কলকাতেই কাটালে?'

'কেটে গেলো তো।'

'ভালোই কাটলো—কী বলো ?'

নিরঞ্জনের মনে হ'লো এবার তার নিজের কিছু বলা কর্তব্য। তাই সে বললে, 'অরুণের ছেলেটি শুনলুম—'

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

'কী হয়েছিলো ?'

'সে নানারকম। তুমি যেখানে যাচ্ছো সেটা কী জায়গা ?'

'যাচ্ছি যেখানে সেটাকে বলে মো-টুং ফরেস্টস্। পেট্রোলের খোঁজ পেয়ে আমাদের কোম্পানি এক হাজার বিঘা জমি ইজারা নিয়েছে সেখানে।'

'কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে ?'

'তা একরকম হয়েছে। এঞ্জিনিয়ররা চ'লে গেছে যন্ত্রপাতি নিয়ে, মান্দ্রাজ থেকে গেছে দু' জাহাজ ভর্তি লেবর, খানিকটা জায়গায় জঙ্গল সাফ ক'রে কাঠের বাড়ি-ঘরও তোলা হ'য়ে গেছে—ওরা তো আশা করছে সামনের মাসেই বাজারে তেল ছাড়তে পারবে।'

'তোমার কাজটা কী ?'

'আমাকে পাঠাচ্ছে লেবর-সুপরভাইজর অর্থাৎ কুলির সর্দার ক'রে। কাজটা সুখের নয়', ব'লে নিরঞ্জন একটু হাসলো।

'তা কেরানিগিরির চেয়ে ভালো !'

'এ-কাজে আমি ছাড়া আর বাঙালি নেই। আর সবাই হয় ফিরিঙ্গি নয় পঞ্জাবি। ভাগ্যিস ক্লেরিকল স্টাফে-কিছু বাঙালি আছে, মাঝে-মাঝে বাংলা কথা ক'য়ে বাঁচবো।'

'কাছাকাছি শহর নেই ?'

'আরাটুন ব'লে ছোট্ট একটা শহর আছে পাঁচ মাইল দূরে। জঙ্গলটার গা ঘেঁষেই বর্মা রোড চ'লে গেছে চীনে। তা এই অয়েল ফীল্ডই দেখতে-দেখতে শহর হ'য়ে দাঁড়াবে। জনসংখ্যাও নেহাৎ কম

না, আর সব জাতেরই কিছু নমুনা আছে। টেকনিশিয়ানরা মার্কিন, ডাক্তার দু'জনই বাঙালি, কুলিরা বেশির ভাগ মান্দ্রাজি, তবে লোকাল রিক্রুটমেণ্টে কিছু বর্মি আর চীনেও জুটবে, মিস্ত্রি তো চীনেই সব, কেরানিরা কিছু বাঙালি, কিছু মান্দ্রাজি, ইংরেজ কেমিস্টও আছে একজন, তার কাজ বাই-প্রোডক্ট বের করা। আর কী চাই? দস্তুরমতো আন্তর্জাতিক ব্যাপার।'

নিরঞ্জনের কথা শুনতে-শুনতে অরিন্দমের চোখের সামনে যেন সৃষ্টির কারখানার একটা ছবি ফুটলো। হাজার মানুষ একটা মানুষের মতো খাটছে। ঘুরছে বিরাট যন্ত্র; ঘাম, কাদা, তীব্র রোদ, তীক্ষ্ণ শব্দ, হয়তো রক্ত, হয়তো ব্যাধি, মৃত্যু, হত্যা। মারীবাহী পতঙ্গের গান, বিষাক্ত সাপের নিঃশব্দ চলাফেরা, হিংস্র জন্তুর ডাক রাত্রে শোনা যায়। তারপর? তারপর শহর, ইলেকট্রিক আলো, অ্যাসফল্টের রাস্তা, মারী মরেছে, মিলিয়েছে জানোয়ারের পাল। তারপর রেলগাড়ি এলো, এলো নানা-দেশের বণিক, ডালপালা ছড়ালো নানাদেশের ব্যাঙ্ক, আর তারই পিছন-পিছন এলো শুঁড়ি, এলো জুয়ো-ওলা, বেশ্যাও এলো। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে ঐশ্বর্য ছিনিয়ে আনবার এই যে উদ্যম তার মধ্যে বীরত্ব যত, নিষ্ঠুরতাও ততখানি। সমস্ত ব্যাপারটা অরিন্দমকে যেন সম্মোহিত ক'রে। ব্যর্থ হ'লো জীবন সরকারি চাকুরির তাকিয়া ঠেস দিয়ে, এ-রকম কোনো কাজে ঝাঁপ দিতে পারলে হ'তো, সত্যি-সত্যি করবার মতো কিছু আছে ওখানে, কেবল কাগজ সই করা নয়, টি. এ.-র লোভে সফর করা নয়। এখনো তাঁর মন টানে এই বিপদবহুল কর্মোন্মত্ত জীবন, কিন্তু এখন আর সময় নেই, বুড়ো হ'তে চললুম। এখন এই যুবককে এত বড়ো একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করা কি আমার উচিত?

'কেমন লাগে তোমার এ-কাজ?'

'লাহোরে তো কাটিয়ে এলুম—সেখানে কাজও ছিলো অনবকাশের।

ওখানে কেমন লাগবে কে জানে', শেষের কথাটা অত্যন্ত বিষণ্ণ শোনালো। নিরঞ্জন এ ক'দিন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখেছে, সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়েছে তাদের কলকাতার আপিশে, মনে-মনে কত সময় নিজেকে দেখতে পেয়েছে কাঠের কুঠুরিতে লণ্ঠন-জ্বালানো নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়। দিনটা যা হোক কাজের ঝোঁকে কেটে যাবে, কিন্তু সন্ধ্যায় সে কী করবে, সন্ধের পরে বেরুনোও নাকি এখনো নিরাপদ নয়। কলকাতা থেকে দূরত্বটা কতবার যে হিসেব করেছে, কিন্তু যতই গোনে, সে-অগাধ দূরত্বের একটি মাইলও কমাতে পারেনি।

'খুব খাটুনি?'

'খাটুনি বেশি হওয়াই ভালো। তবু সময় কাটে।'

বুলি ফিরে এলো। নিরঞ্জনকে চা ঢেলে দিয়ে বসলো অরিন্দমের পাশে, নিরঞ্জনের মুখোমুখি। একটু কাটলো চুপচাপ। তারপর অরিন্দম বললেন, 'ভালো কথা—অরুণ তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলো—'

নিরঞ্জন চায়ের বাটিতে মুখ ডুবিয়ে বললে, 'না—না সে কিছু না।'

'কিছু না কেন? বিদেশে যাচ্ছো, টাকার তোমার দরকার। সেটা আমি তোমাকে ফেরৎ দেবো। আর হ্যাঁ—আর-এক কথা!'

নিরঞ্জন একটু অবাক হ'য়ে মুখ তুলে তাকালো।

'কথাটা আমি ভেবেছিলুম তুমিই পাড়বে। তুমিই ভেবে ছাখো—এমন কোনো কথা কি নেই যা আমাকে বলতে চাও?'

অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো। আলো ফুটলো তার চারদিকে, সে-আলোয় উল্টোদিকে বসা বুলির মুখই সব চেয়ে অস্পষ্ট।

অরিন্দম আবার বললেন, 'যদি আমাকে কিছু বলবার থাকে বলো।'

নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে-শুনতে বাধো-বাধো গলায় নিরঞ্জন বললে, 'আমার যা বলবার তা বুলিকেই বলেছি।'

'বেশ তো। তুমি এখনই কেন ওকে বিয়ে করো না।'

নিরঞ্জনের সমস্ত শরীর যেন অবশ হ'য়ে গেলো, তার দু'কানে হৃৎপিণ্ড এমন প্রচণ্ড শব্দ করছে যে অন্যদের কথা অতি ক্ষীণ শুনছে। একটু চুপ ক'রে থেকে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললে, 'তা কেমন ক'রে হয়?'

'কেন হয় না?'

'আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে যে।'

'কিন্তু সত্যি কি তুমি যেতে চাও?'

'না-গিয়ে উপায় কী আমার?'

'সে-কথা থাক্। তুমি চাও কিনা তা-ই বলো।'

নিরঞ্জন একটু চুপ ক'রে রইলো। বুলির কালো মাথাটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে যেন। মাথা নিচু ক'রে ও চুপ। বোধ হয় ও এখানে না-থাকলে কথা বলা সহজ হ'তো।

'তাহ'লে আপনি কী বলেন?'

'তুমি যদি যেতে চাও আমি বাধা দেবো না। পরে এক সময়ে ছুটি নিয়ে এসে বিয়ে করতে পারো। কিন্তু, সত্যি বলবো, সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমি ভাবছিলুম আরো দিন পনেরো ছুটি নেবো, তারপর একেবারে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে নাগপুর ফিরবো।'

'নাগপুর! আমি কেমন ক'রে যাবো? আমার চাকরি যাবে যে।'

'তা জানি। এ-চাকরি না-হয় ছেড়েই দিলে। আসল কথা, মেয়ে অত দূরে চ'লে যাবে এ আমার প্রাণে যেন সয় না। আমার বয়সে এটুকু দুর্বলতা আশা করি ক্ষমা করা যায়।'

নিরঞ্জন তবু একটু দ্বিধা ক'রে বললে, 'একেবারে ছেড়ে দেবো?' বাঙালির চাকরির মায়া বড়ো মায়া।

'চাকরিটা কিছু না—ওখানকার অভিজ্ঞতাটা পেলে না, সেটাই

হ'লো লোকশান। বলো কী হে, আমারই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী আর করবে, এই বিয়েটাও একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবেই নাও। নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস তোমার হয় না যে আর-একটা চাকরি পাবে?'

নিরঞ্জন চিন্তিতভাবে বললে, 'দেরি হ'তে পারে।'

'তা না-হয় হ'লোই। অসুবিধে হবে না।'

নিরঞ্জন চুপ ক'রে রইলো। তার মাথার ভিতরটা এখনো ঘুরছে। এ ক'দিন ধ'রে সে যা-কিছু ভাবছে, তার সমস্ত দুশ্চিন্তা সংকল্প কল্পনা সমস্যা সব এক মুহূর্তে এক সঙ্গে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সে, এ-রকম যে হ'তে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। উপস্থিত সংকল্প থেকে চ্যুত হ'য়ে কেমন একটা বিহ্বল শূন্যতার মধ্যে পড়লো, যে-মুক্তি এইমাত্র পেলো তার আনন্দ এখনো অনুভব করতে পারছে না। —'ভেবো না আমি তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতে বলছি। আমার মনে হয় তোমার নিজের ভিতরেই এ-সাহস আছে। তাই বলছি।'

নিরঞ্জন বললে, 'তা-ই হবে।'

'তাহ'লে তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও।'

'তা দেবো, কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কথাই চরম। আর-কেউ কিছু বলবে না।'

'কিন্তু ওঁরা আসবেন তো?'

'কী দরকার? পরে আমি—আমরাই গিয়ে দেখা ক'রে আসবো।' নিরঞ্জন নিজের দিক থেকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে সারতে চায়, বাড়ির সবাই আসবে থাকবে অত টাকা তার কোথায়? তাছাড়া ও-সব হৈ-হৈ কাণ্ড পছন্দও হয় না।

'না—না—তা আসবেন বইকি। আর কে আছেন তোমার?'

'দিদি আছেন।'

'আর?'

নিরঞ্জন একটু ভেবে এক মাসির কথা বললে। আর কারো কথা মনে পড়লো না। আত্মীয়ের সংখ্যা তার বড়োই কম।

'সকলকেই তুমি আসতে লিখে দাও—খরচের জন্য ভেবো না।' অরিন্দমের মনের ভাব নিরঞ্জনের ঠিক উল্টো—এ-বিয়েতে প্রাণ ভ'রে ধুমধাম করবেন, পাছে যথেষ্টরকম বেশি টাকা খরচ না হয় এই তাঁর দুশ্চিন্তা।

'বুলি, বাংলা এটা কী মাস রে?'

'শ্রাবণ বুঝি।'

'তাহ'লে শিগগিরই একটা তারিখ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই কথা রইলো। আমি উঠি, এখনো আমার স্নান হয়নি। নিরঞ্জন, তুমি কাল আবার এসো।'

বুলি আর নিরঞ্জন ব'সে রইলো চুপচাপ। কেউ উঠে গেলো না, অথচ কথাও বললে না, চোখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত। বুলি টেবিলের কাপড়ের উপর নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগলো, আর নিরঞ্জন তুলে নিলে অরিন্দমের পরিত্যক্ত খবরের কাগজ। এতদিন তাদের কথার শেষ ছিলো না, আজ কোনো কথা নেই।

উপরে উঠতেই অরিন্দমের সঙ্গে মিনির দেখা। স্নানের পরে সে বসেছিলো ধ্যানে, কিন্তু প্রচণ্ড টানে কে যেন তাকে টানছিলো, কেবলই মনে হচ্ছিলো নিচেটা একবার ঘুরে আসি। তাই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, তোর কলেজের বেলা হ'লো বুঝি?'

'না, দেরি আছে।'

'নিয়মিত কলেজে যাস তো?'

'তা যাই,' ব'লেই মিনি পা বাড়াচ্ছিলো, কিন্তু অরিন্দম তক্ষুনি আবার বললেন, 'চুলগুলো বাঁধিসনে কেন? বিশ্রী দেখায়। ও-রকম ক'রেই কলেজে যাস নাকি?'

মিনি কিছু বললে না। কলেজে যাওয়ার সময় কোনোরকম একটা খোঁপা বাঁধতেই হয়, আয়নার সামনে দাঁড়াতেও হয় একবার। আসলে কলেজে যাওয়াটাই তার আর পছন্দ নয়।

'তার চেয়ে এক কাজ কর্ না। বিলেতি মেয়েদের মতো খাটো চুল রাখ্। আর কলেজ যদি ভালো না লাগে ছেড়ে দে। কী বলিস?'

'আমিও তা-ই ভাবছি।'

'কী ভাবছিস? পড়াশুনো ছেড়ে দিবি? করবি কী?'

'কাজের কি অভাব?' মিনি আর-একবার চেষ্টা করলো সিঁড়ির দিকে যেতে, অরিন্দম আবার বাধা দিলেন।

'শোন, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।' বারান্দার বেতের চেয়ার-গুলোর একটাতে বসলেন অরিন্দম। 'বোস্।'

'নিচে একটু কাজ আছে আমার—'

'একটু বোস্ না। এক মিনিট। খুব দরকারি কথা।'

মিনি এমন আলগোছে বসলো যেন এক্ষুনি আবার উঠবে।

অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ত্যাখ্, আমি ভেবে দেখলুম তুই সেদিন বুলির কথা ঠিকই বলেছিলি।'

মিনির ঠোঁটে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠলো।

'সত্যি, নিরঞ্জনের সঙ্গে বুলি বড্ড বেশি ঘোরাঘুরি করছে।'

'কেমন! আমি বলিনি!'

'এর একটা ব্যবস্থা তাই করতেই হ'লো।'

মিনি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যবস্থা করলে?'

'ওদের বিয়ে ঠিক ক'রে এলুম এইমাত্র।'

'কী!'

'হ্যাঁ, তা-ই ভালো। ওদের যখন পরস্পরকে ভালো লেগেছে—'

'বাবা, এ তুমি করলে কী!'

'কেন, আমার তো মনে হয় এর চেয়ে ভালো কিছু হ'তে পারে না। এ-মাসেই বিয়ে হবে।'

'বাবা, এ-বিয়ে কখনো হ'তে পারবে না।'

'তুই বলছিস কী?'

'তুমি জানো না—নিরঞ্জন কী ভয়ানক খারাপ লোক—'

'তুই কী ক'রে জানলি?'

'আমি জানি। দেখতে ও-রকম মিনিমুখো ভালোমানুষ, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সাংঘাতিক বদ। আমি তোমাকে বলছি—বুলির সর্বনাশ করবে ও, এর চেয়ে বুলিকে হাতে-পায়ে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেয়া ভালো।'

'বুলির নিজের মতটা কিন্তু অন্যরকম।'

'বুলি! ও কী বোঝে? ও কী জানে? আর ঐ নিরঞ্জনই তো ওকে নষ্ট করেছে। আগে সাবধান হ'লে না—এখন সামলাও ঠ্যালা।'

'ঠ্যালাটা তো ভালেই। নিরঞ্জন সত্যি বেশ ভালো ছেলে। আমার মনে হয়, মিনি, কোনো কারণে ওর উপর তুই খুব চটেছিস, ও-সব কথা বলবার আর-কোনো কারণ তোর নেই।

'ও একটা মানুষই ভারি, ওর উপর আবার চটবো! আমি জানি, তাই বলছি। আমি জানি! এ-বিয়েতে বুলি কখনো সুখী হ'তে পারে না। তুমি এক্ষুনি নিরঞ্জনকে ডেকে ব'লে দাও জীবনে আর বুলির সঙ্গে ওর দেখা হবে না।'

অরিন্দম মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন।

'না, মিনি, এর আর নড়চড় হয় না। সব বিয়েই কপাল ঠোকা, সুখদুঃখের কথা কে জানে। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে যে বড়ো বোনের আগে ছোটো বোনের বিয়ে হওয়াটা বিসদৃশ। তা তুইও তো—'

মিনি তীব্রস্বরে বললে, 'সে-কথা আমি মোটেও ভাবছিনে।'

'তোর যদি মত পাই তাহ'লে আজ থেকেই পাত্রের খোঁজ করি। ঐ নীরদ ডাক্তারেরই ছেলে আছে, তাকে যদি বলি—'

'ও-সব কথা মুখেও এনো না, বাবা।'

'কেন, বেশ তো। দু' বোনেরই একসঙ্গে হ'য়ে যাবে। তখন দেখবি, নিরঞ্জনকে আর তত খারাপ লাগবে না।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা গলায় মিনি ব'লে উঠলো, 'না—না—না।'

'তার মানে? বিয়ে করবি না?'

'জীবনেও না।'

'বলিস কী? সারাজীবন বিয়ে না-ক'রে কাটাবি?'

'সারা জীবন। ও-সব ভাবতে পর্যন্ত আমার ঘেন্না করে। তুমি আর বোলো না।'

অরিন্দম একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বেশ, তুই যখন করবিই না, বুলির বিয়েটা অন্তত হ'তে দে।'

'তুমি তাহ'লে এই স্থির করলে?'

'হ্যাঁ, একেবারে স্থির। এ বিয়ে হবেই।'

'বেশ, যা-খুশি করো তোমরা', কান্না চাপতে গেলে মানুষের গলা যেমন ভেঙে যায় সেইরকম ভাঙা গলায় এ-কথা ব'লে মিনি চেয়ার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, দুড়দাড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঝড়ের মতো ঢুকলো যেখানে একা বুলি খাবার টেবিলের উপর খবরের কাগজ খুলে ব'সে আছে।

'নিরঞ্জন—কোথায়?'

'চ'লে গেছে।'

'চ'লে গেছে! কখন গেলো?'

'এইমাত্র।'

'চ'লে গেলো!—বুলি, কী-সব শুনছি?'

'কী শুনছো?'

'তোর নাকি—' মিনি নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামলো।

বুলি বললে, 'হ্যাঁ, আমার বিয়ে। নিরঞ্জনের সঙ্গে।'

'এই তোর মনে ছিলো! এত ক'রে তোকে সাবধান ক'রে দিলুম, তবু তুই ডুবলি!'

বুলি কিছু বললে না।

মিনি অনেকটা শান্তস্বরে বলতে লাগলো, 'বুলি, এখনো সময় আছে, এখনো তুই ওকে ছাড়। মরবি তুই, জ্ব'লে-জ্ব'লে মরবি। তুই কি ভাবিস ও তোকে ভালোবাসে? ও-সব কিছু না, বাবার টাকার উপরেই ওর নজর। সেই লোভেই তো এ-বাড়ির চারদিকে ঘুর-ঘুর করে, বাবাকে পটিয়ে কিছু আদায় ক'রেও নেবে হয়তো। এই ওর মৎলব। তারপর বিয়ে হ'য়ে গেলেই তোর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালাবে, কি কাছে যদি থাকেও তোকে অকথ্য যন্ত্রণা দেবে, তোকে কষ্ট দিয়ে মুচড়ে-মুচড়ে বাবার টাকা খসাবে। বুলি, এত বড়ো ভুল করিসনে। ও সব পারে, ও ঘোর দুশ্চরিত্র। লাহোরে একটা মেয়ের সর্বনাশ ক'রে এসেছে জানিস?'

বুলি উঠে দাঁড়ালো। মিনির চোখের ভিতরে তাকিয়ে বললে, 'সবই জানি।'

ব'লে চ'লে যাচ্ছিলো, মিনি খপ ক'রে তার হাত ধ'রে ফেললো। আরো নরম স্বরে বললে, 'বুলি, শোন। এখন তোর ঝোঁক চেপেছে, আমার সব কথাই খারাপ লাগবে। কিন্তু শান্ত হ'য়ে ভেবে ত্যাখ। কত বড়ো বিপদ তুই ঘনিয়ে আনছিস তা তুই জানিস না—'

'ছাড়ো, হাত ছাড়ো আমার', বুলি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মিনির হাত যেন জাঁতিকলের মতো তাকে আঁকড়ে ধরলো।

'আর কারো তো কিছু হবে না, তোর জীবনটাই ছারখার হবে। সেইজন্যেই বলছি। তুই সুখী হবি এই আমি চাই। তুই যা, এক্ষুনি বাবাকে গিয়ে বল্—'

'ছাড়ো হাত!' বুলি তীব্রস্বরে ব'লে উঠলো।

'—গিয়ে বল্ এ বিয়ে হবে না। বাবা অত্যন্ত ভালোমানুষ, তাঁর চোখে ধুলো দেয়া সোজা। মা কিছুই খেয়াল করেন না—আমি ছাড়া তোকে বাঁচাবে কে? প্রথম থেকেই তাই আমি বলছি, পাছে তুই দুঃখ পাস এই আমার ভয়। তুই দুঃখী হ'লে আমি যে কত কষ্ট পাবো তুই তার কী বুঝবি। লক্ষ্মী বুলি, আমার কথা শোন, এত বড়ো কষ্ট আমাকে তুই দিসনে।'

বলতে-বলতে মিনির গলা ভেঙে গেলো, মুখ বিকৃত হ'লো, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। বুলি এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেলো একেবারে বাইরে, রান্নাঘরের পিছনে, যেখানে জোয়াত আলি মুরগিকে ধান খাওয়ায়। আর মিনি বুলির পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে টেবিলের উপর দু'হাতে মুখ গুঁজে কান্নায় কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।

এখন একবার হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কিন্তু সারাদিনের চেষ্টাতেও অরিন্দম স্ত্রীর দেখা পেলেন না। হৈমন্তীর ঘরের পাশ দিয়ে যখনই গেছেন, দরজা বন্ধ। দুপুরে খাওয়ার পরে একটু বুঝি ঘুমিয়েছিলেন, মন্তী ঠিক তখনই গেছে বেরিয়ে। অরিন্দম ধৈর্য হারালেন না, রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

আজ অনেকদিন পর তাঁর মনটা ভালো লাগছে। বুলির বিয়ে ঠিক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হচ্ছে যেন মুক্তি পেলেন। যত চাপা বিক্ষোভ মনে জমা ছিলো, বুলির পরিপূর্ণ সুখ উজ্জ্বল হাত বাড়িয়ে তা মুছে নিয়েছে। যত বার বুলির সঙ্গে চোখোচোখি হয়েছে, গভীর আশ্বাস পেয়েছেন মনে। মন্তীর উদাসীনতা, মিনির পাগলামি, অরুণের উচ্ছন্নে যাওয়া—সবই তার কাছে তুচ্ছ। টাটার মৃত্যুও মনে রাখার মতো আর নয়। দুঃখ অতি কৃপণ; তার ছোটো হাত বেশি দূর পৌঁছয় না; সুখ অফুরন্ত। অরিন্দম কি ভেবেছিলেন যে এত সহজে জীবনে নতুন দিগন্ত দেখা দেবে? কিন্তু দেখা তো দিলো। চারদিক থেকে অবরোধ ঘনিয়ে আসছিলো, হাওয়া-হারা অপরিসরে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে আসছিলেন, হঠাৎ ছাড়া পেলেন, দরজার পর দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলেন স্বাধীন হাওয়ায় অবারিত আলোতে। ফিরে পেলেন স্বরাজ্য।

হালকা পায়ে সারা বাড়ি ঘোরাঘুরি করেছেন বিকেল বেলা। তাঁর মনের মধ্যে একটা কথা শুনতে পাচ্ছেন—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তিনি যেমন বুলির কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'ভাবিসনে', তেমনি তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী কেউ যেন তাঁর কানে-কানে বলছে, 'আর ভয় নেই।' মন্তী আসে না কেন? অনেক কথা ওকে বলবার আছে আমার। ও বরাবরই খামখেয়ালি, না-হয় একটু বাড়াবাড়ি করছে, কিন্তু আমারই তো উচিত ছিলো ওর মান ভাঙানো। ও কথা বলে না, আর আমিও কিনা মুখ ফিরিয়ে নিলুম! হাসি পেলো অরিন্দমের। আমি এমন বোকা, মনে-মনে একটু রাগই করেছিলুম। রাগ! মন্তীর উপর! ওর উপর রাগ ক'রে কোনোদিন আমি থাকতে পারিনি, অথচ ওর যা অভিমান! সে মারাত্মক। কত দিনের কত পুরানো কথা অরিন্দমের মনে পড়লো, সে-সব যে মনে আছে তাও

জানতেন না। মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে তাঁর নিজের মধ্যেই যেন যৌবনের চঞ্চলতা ফিরে এসেছে। মন্তী যা-ই করুক, ও মন্তী। আর এই যে ও পালিয়ে বেড়ায়, যা-তা কথা বলে কিংবা কিছুই বলে না, এ-সব ছেলেমানুষি না-থাকলে ও মন্তী হবে কেন? আমি পছন্দ করি না ব'লেই মহামায়াকে নিয়ে এত মেতেছে, যদি বলতুম 'বাঃ, বেশ করছো', তাহ'লে তক্ষুনি স'রে আসতো। এই ওর স্বভাব। ওর সঙ্গে আমি যেখানে এক তা এত গভীরে যে লক্ষ মা-মহামায়ার সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছতে পারেন। ব্যর্থ হবে মহামায়ার সব শিক্ষা। বুলির বিয়ের পরে আমরা সকলেই যাবো নাগপুর, জব্বলপুর পাঁচমারি বেড়াবো, সকলে মিলে আবার সুখী হবো। মন্তী কি শেষ পর্যন্ত না বলতে পারবে—পাগল!

আজ রাত্রেই সব বলবেন ওকে, ওকে ফিরে পাবেন। তাঁর মনে হ'লো আসন্ন রাত্রিটিতে যেন অপরূপ কোনো উন্মীলন লুকিয়ে আছে, যেমন মনে হয় সদ্য-বিবাহিত যুবকের। উত্তেজনা নেই, অধৈর্য নেই, অথচ দিনের সমস্ত কলরোল যেন রাত্রির প্রতীক্ষারই গান।

সন্ধের পর অরিন্দম একবার উকিলের বাড়ি গেলেন। উইলের পাকা দলিল তৈরি, সাক্ষীসমেত সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সই ক'রে জটিল ইংরিজিতে রচিত ছোটোখাটো পুঁথিটি পকেটে ক'রে বাড়ি ফিরলেন। অন্যান্য দিনের চাইতে একটু সকাল-সকালই খেলেন, তারপর ব'সে-ব'সে অগুনতি সিগারেট পোড়ালেন। দশটা বাজলো, বাজলো সাড়ে-দশটা, হৈমন্তী ফিরলেন না।

অগত্যা আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এখনো বারান্দাতেই তাঁর খাট পাতা, যে-ঘর ছিলো দু' জনের, এখন তা হৈমন্তীর একলার দখলে। যখন থাকেন, দরজা বন্ধ থাকে; যখন থাকেন না ঠাকুর-ঘরটিতে তালা দিয়ে বড়ো ঘরটি খোলা রেখে যান, অরিন্দম মাঝে-মাঝে

যান সে-ঘরে, হয়-তো খাটে একটু গড়ান, শিয়রে টী-পয়ের উপর জিনিসগুলো একটু নাড়াচাড়া করেন। যেদিন তিনি এলেন সেদিন বাহাদুর তাঁর টুকিটাকি জিনিসগুলো ঐ টী-পয়ে যেমন রেখেছিলো, এখনো তেমনি আছে। এ-ঘরের অংশীদার যে একজন পুরুষও এই ছোটো জিনিসগুলোই শুধু তার স্মারক। তা ছাড়া, ঘরটি যেন স্ত্রী-সত্তার একটি সূক্ষ্ম সৌরভে ছাওয়া, ঢুকলেই টের পাওয়া যায়। অরিন্দম যখন হৈমন্তীর খাটে গিয়ে শোন, সে-গন্ধ তীব্র হ'য়ে মগজে লাগে, পুরু বেডকভরের আবরণ ভেদ ক'রে মন্তীর বালিশ থেকে এমন একটি সৌরভ উঠে আসে যে তখনকার মতো সমস্ত মানুষটারই উপস্থিতি তিনি যেন অনুভব করেন। ও আজকাল কী তেল মাখে মাথায়? জানেন না, মন্তীর কথা কিছুই জানেন না তিনি আজকাল।

অরিন্দম শুয়ে-শুয়ে ভাবলেন এ-কৃত্রিম বিচ্ছেদ তিনি শেষ ক'রে দেবেন। এ অতি অস্বাভাবিক, রীতিমতো কুৎসিত। মন্তীর না-হয় মাথা-খারাপ হয়েছে, তাঁর তো আর হয়নি। প্রশ্রয় পেলেই পাগলামি বেড়ে চলে। কী আশ্চর্য, এমন নরম, এমন সহিষ্ণু তিনি হ'লেন কবে থেকে? তিনি মানুষটা জবরদস্ত রকমের এই তো তাঁর ধারণা ছিলো। মন্তী বললে, আর অমনি তিনি মেনে নিলেন! মাঝে-মাঝে একটু রূঢ় হ'তে হয়, জোর করতে হয়। ওরা তা-ই চায়।

অরিন্দম পাশ ফিরলেন। না, এ-ই ভালো হয়েছে। এখন ও নিজেই ফিরবে। কতদিন আর থাকতে পারবে আমাকে ছেড়ে! ওর নিজেরও নিশ্চয়ই মন-কেমন করছে, লজ্জায় কাছে আসতে পারছে না। এ না-হ'য়ে পারে! ও মন্তী না? এমন পাগল, বলে কিনা, 'তোমার মুখ দেখলেও পাপ!' পাগল! অরিন্দম অস্ফুট শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন। কাকে কী বলছো, মন্তী—এ যে আমি। আমি, আমি। ভাঙবো ওর লজ্জা, নিজেই যাবো ওর কাছে। কী হ'তো

ঢ় হ'লে, জোর করলে? এত কি ভালো লাগতো! এতদিনে ও নিজেই বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল, চুপ ক'রে ভাবছে কখন আমি ডাকবো।

অরিন্দমের মনে হ'লো তাঁর এই ভাবনাগুলোই যেন ঘটনার শামিল। কল্পনা ও বাস্তবে ভেদ ঘুচে গেলো। যা ভাবছেন, অনুভব করছেন তা যেন হ'য়েই গেছে। ফিরে পেয়েছেন মন্তীকে, শূন্য শয্যার আজকেই শেষ রাত্রি। কাল বুলির বিয়ে। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে লাল টালি-ছাওয়া বাংলো। লাল মোটরে বুলি আর নিরঞ্জন। বুলির চুল রুমালে ঢাকা। মন্তীর চুলে শিশিরের আর ঘাসের গন্ধ, সদ্য-ঘুম-ভাঙা ঠাণ্ডা ভোরবেলায়। কী চুল! যেন আঁকাবাঁকা কালো জল। ছলছল পাখি-ডাকা কালো রাতে নদী। ছায়ামাখা গ্রাম, কী নাম? নামো এখানেই। থামো। বাঁশবন জলে নুয়ে-পড়া, কাশবনে হাওয়া। নৌকো কাঁপে। কাঁপে চমকানো দুটি পাখি মন্তীর বুকে। নুয়ে-নুয়ে জলে ফেলে ছায়া, কাঁপে জল। কমলারঙের রোদে সবুজ শাড়ির ঝিলিমিলি। যেন হাওয়ার দোলা লাগলো গাছে। দৌড়ে চলেছো কোথায়, দোলে দুটি পাখি ভয় পেয়ে। দ্যাখো দ্যাখো কত পাখি! চোখ-ঝলসানো নদীতে বেগনিরঙের ছায়া ফেলে উড়ে গেলো। তুমি এই নদী। মাথায় রুমাল কেন, খোলো। আরে এ যে বুলি। কখন এলি, নিরঞ্জন কোথায়।

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ অরিন্দম জেগে উঠলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মনে নেই, এখন কত রাত? ঘুম ভেঙে অবাক হলেন। রাত্তিরে কখনো তো ঘুম ভাঙে না তাঁর; শূন্যতায়, অন্ধকার স্তব্ধতায় একা-একা অদ্ভুত লাগলো। হঠাৎ মনে হ'লো মন্তীর জন্য অপেক্ষা করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনে ছিলো প্রতীক্ষার চাপ, তাই এই ভূতুড়ে মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙেছে। বালিশের তলায় হাত-ঘড়িটা

ছিলো, রেডিঅম-কাঁটা জলজ্বল চোখে জানালে দুটো বেজে দশ মিনিট। ঘড়িটা আবার রাখতে গিয়ে চমক লাগলো। এ কী! খালিশের তলায় তাঁর উইলটা রেখেছিলেন না? বালিশ দুটো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে হাৎড়িয়ে দেখলেন। না, নেই। ঘুমের জড়তা ছুটলো, উঠে আলো জ্বেলে সমস্ত বিছানা খুঁজলেন। তবে কি বালিশের তলায় রাখেননি? স্পষ্ট মনে পড়ে মোটা খামটা বালিশের তলায় রাখলেন, তারপর আলো নিবিয়ে শুলেন। ভুল হ'লো? তবে কি নিচেই ফেলে এসেছেন? উকিলের বাড়ি থেকে ফিরে প্রথমে নিচেই বসেছিলেন বটে। দেখে আসি। দোতলার সিঁড়ির পিছনে ছোটো একটি ঘর তিনি বানিয়েছিলেন তাঁর আপিশঘর হবে ব'লে, সেখানে টেবিল চেয়ার বইয়ের শেল্ফ্ সবই আছে, কিন্তু ঘরটি প্রায় ব্যবহারই হয় না, প'ড়েই থাকে। মনে হ'লো সে-ঘরে একবার ঢুকেছিলেন। দৌড়ে গেলেন সে-ঘরে, টেবিলের ড্রয়ারগুলো টেনে যত রাজ্যের পুরোনো কাগজ টেনে বের করলেন, আরশোলারা ভয় পেয়ে দিগ্বিদিকে পালালো, ধুলোর পশলা ঢুকলো চোখে মুখে। না, এখানে কোত্থেকে আসবে? ঘোরানো বুক্-শেলফে কতগুলো পুরোনো টেলিফোন ডাইরেক্টরি, রেলগাড়ির টাইমটেবিল, ডাকঘরের আইনকানুনের বই ধুলোয় বিবর্ণ হ'য়ে আছে, ভুল ক'রে ওখানে রাখবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবু একবার নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। তারপর বসবার ঘরে গিয়ে কুশানগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলেন, ঝকঝকে মেঝেটার উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। তবে হ'লো কী? খাওয়ার ঘরে প'ড়ে থাকা অসম্ভব, তবু দেখেই যাই। খাবার টেবিলের কাপড়টা তুলে দেখলেন, সাইডবোর্ডের ড্রয়ারগুলো টানলেন, ঝনঝন ক'রে কাঁটা-চামচ বেজে উঠলো। বুলিদের পড়ার ঘরে যাইনি এটা নিশ্চিত। তবু না-গিয়ে পারলেন না। না, কী আর হবে, বিছানাতেই আছে। দৌড়ে আবার উঠে এলেন দোতলায়।

উকিলের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর থেকে শোয়া পর্যন্ত তিনি কী-কী করেছেন, কোন্-কোন্ ঘরে গিয়েছেন স্পষ্ট মনে করবার চেষ্টা করলেন। উইলটি ছিলো পাঞ্জাবির পকেটেই। কাপড় যখন ছাড়েন ড্রেসিং-গাউনের পকেটে রেখেছিলেন, তারপর শোবার আগে···না, বিছানায় থাকতেই হবে। চাদরটা টেনে তুলে এনে বার-বার ঝাড়লেন, বালিশের ওয়াড়গুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন বার-বার, তোষকটা উল্টিয়ে ফেললেন, মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলাটা দেখলেন। কপালে ঘাম দেখা দিলো, নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো জোরে।

আছে কোথাও ঠিক, কাল সকালেই হয়-তো পাওয়া যাবে। মন্ত্রীকে একবার দেখাবার জন্যেই বাড়িতে এনেছিলেন, নয় তো সোজা ব্যাঙ্কে রেখে দিলেই হ'তো। কিন্তু এ-ই বা কী ক'রে হয় যে বাড়িতে আনামাত্রই হারিয়ে গেলো। হারাবে কোথায়, আছে নিশ্চয়ই কোনোখানে। আছেই যদি, এক্ষুনি বেরোচ্ছে না কেন? চালাকি নাকি, আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান হবো, আর তিনি লুকিয়ে থাকবেন! অরিন্দমের জেদ চেপে গেলো। খুঁজে তিনি বার করবেনই, এই রাত্তিরেই, তাতে রাত যদি ভোর হ'য়ে যায় তো যাক্।

ছাড়া ড্রেসিংগাউনটি খাটের পাশে একটি চেয়ারে প'ড়ে আছে; আগে অন্তত দশবার দেখেছেন, তবু এই প্রথম দেখছেন এইরকম কল্পনা ক'রে নিয়ে পকেট দুটিতে আবার হাত ঢোকালেন। আর-একবার দেখলেন বালিশের ওয়াড়ের ভিতরটা। পাঞ্জাবিটা—পাঞ্জাবিটা কোথায় ছেড়েছিলেন? কী যেন, মনে তো পড়ছে না। নিশ্চয়ই ওর পকেটেই র'য়ে গেছে, আগাগোড়াই তিনি ভুল ভাবছেন। তাঁর রোজকার জামা-কাপড় বাহাদুরই সব সময় তুলে রাখে, রাখে তো বাথরুমের দরজার কাছে পরদা-ঢাকা ঐ আলনাটাতেই। অরিন্দম পা টিপে-টিপে আলনাটার কাছে গেলেন, যেন তাঁর আসবার খবর

পেলেই পকেট থেকে জিনিসটা হাওয়া হ'য়ে যাবে। পরদা সরিয়ে দেখলেন, জুতোগুলো ঝকঝক করছে, কুঁচোনো ধবধবে ধুতিগুলো হাসছে, দুটো রঙিন পা-জামা সুখে এলিয়ে আছে, দু' কোণ থেকে চারটে পাঞ্জাবি টান হ'য়ে ঝুলছে। ঐ শাদাটা আজ পরেছিলেন। পকেটে হাত দিলেন—কই, না তো। অন্য পাঞ্জাবিগুলোর পকেটও দেখলেন, দুটো পাঞ্জাবি রাগ ক'রে মেঝেতে প'ড়ে গেলো, খামকা একটা জুতোকে লাথি দিয়ে কাৎ ক'রে দিলেন। এটাই কি তিনি আজ পরেছিলেন? হঠাৎ যেন মনে হ'লো, না তো, বাহাদুর একটা গরদের পাঞ্জাবি এনে দিয়েছিলো। গরদ, না মটকা? কোন্ পাঞ্জাবি আজ পরেছিলাম? কোন্ পাঞ্জাবি আজ পরেছিলাম? কিছুতেই কি মনে পড়বে না?

রেশমি রাত-কাপড়ের তলায় অরিন্দমের পিঠ ঘামে ভিজে গেলো।

বাহাদুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন? ওর ঘুম পাৎলা, যত রাতই হোক্ একবারের বেশি ডাকতে হয় না, যখন ঘুমোয় তখনো প্রভুর মরজির দিকে ওর মনের এক অংশ খোলা থাকে। কিন্তু এত রাত্তিরে ডেকে এই কথা জিজ্ঞেস করা, 'বল্ তো বাহাদুর আজ আমি কোন্ পাঞ্জাবি পরেছিলাম?' এটা কেমন হবে?

অরিন্দম আস্তে-আস্তে ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসতে যাবেন এমন সময় তাঁর মনে পড়লো যে নিচের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে রেখে এসেছেন, টেবিলের দেরাজগুলো হাঁ হ'য়েই আছে, খাবার টেবিলের কাপড়টা মেঝেয় লুটোচ্ছে, আর বুলিদের পড়ার ঘরের বইগুলো ছত্রখান।

খালি পায়ে আবার নামলেন নিচে, একে-একে সবগুলো ঘর ঠিকঠাক ক'রে রেখে প্রত্যেকটি আলো নিবিয়ে ফিরে এলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো যে রাত্তিরে খাওয়ার আগে একবার মস্তীর

ঘরে ঢুকেছিলেন। পাঞ্জাবিটি হয়-তো সেখানেই ছেড়ে এসেছেন। ও শাদা পাঞ্জাবিটা মোটে পরেনইনি, পরেছিলেন মটকার একটা জামা—না গরদের? যা-ই হোক্‌, জামাটা আছে মন্তীর ঘরেই, উইলটা পকেটেই র'য়ে গেছে। এ-রকম ভুল তাঁর কী ক'রে হ'লো?

মন্তী নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে, তা ওকে ডেকেই তুলবো। তাতে আর কী! উইলটা ওকে দেখানো হয়নি, বুলির বিয়ের কথা বলা হয়নি—অনেক কথা আছে ওর সঙ্গে। এখনই ভালো। হৈমন্তীকে একেবারে না-জানিয়ে যে উইল করেছেন তাতে আজ প্রথম অরিন্দমের মনে একটু অনুতাপ হ'লো। ও কি রাগ করবে ওকে আগে কিছু জানাইনি বলে? কিন্তু ওকে জানাতে গেলে অরুণের সম্বন্ধে এ-ব্যবস্থা হয়-তো করা যেতো না—আর তার জন্যেই তো উইল করা। না, না, রাগ করবে কেন—ওকে বুঝিয়ে বলবো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তাছাড়া উইল একটা কাগজে-কলমেই রইলো, যেমন চলছে তেমনিই চলবে সব। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই। আপাতত ডুমকায় জমির খোঁজ করতে হয়, সম্ভব হ'লে সামনের শীতের আগেই বাড়িটি করিয়ে ফেলবেন। চাকরির এই একটা বছর কোনো রকমে কেটে গেলেই বাকি জীবনের মতো নিশ্চিন্ত। আয় কমবে কমুক; তিনি এখন যা পান অত টাকা দিয়ে কী-ই বা হয়, হয় ফেলা যায়, নয় জমে, কোনোটাই ভালো না।

ভেবেছিলেন হৈমন্তীর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। ভেজানো ছিলো। ওর মনের কথাও আমারই মতো, লজ্জায় বলতে পারে না। হয়তো রোজই ভাবে আমি আসি না কেন, অমন নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ঘুমে কেমন ক'রে রাত কাটাই? আমারই দোষ হয়েছে। আমি একটু রাগ করেছিলুম সেটাই ভুল হয়েছে। আমি কাছে গিয়ে ডাকলে আর কি ও পারে মুখ ফেরাতে?

অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হৈমন্তীকে। পাশ ফিরে শুয়েছে, মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। অরিন্দম আলো জ্বালিয়ে একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে গেলেন। কোথায়, পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় মন্তী তুলে রেখেছে। কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'মন্তী, মন্তী।'

হৈমন্তীর ঘুম ভাঙলো না।

অরিন্দম স্ত্রীর বাহুতে একটু ঠেলা দিয়ে আবার ডাকলেন, 'মন্তী!'

হৈমন্তী চমকে চোখ মেললেন, সঙ্গে-সঙ্গে একটা অস্ফুট বিকৃত আওয়াজ তাঁর গলা দিয়ে বেরুলো।—'তুমি—তুমি কী চাও?'

অরিন্দম ভাবলেন ঘুমের ঘোরে হৈমন্তী ভয় পেয়েছে। তার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মন্তী—আমি—আমি।'

তীব্র ঝাঁকুনিতে হাত সরিয়ে হৈমন্তী বিছানার উপর উঠে বসলেন। কোনো অদৃশ্য হাত যেন তাঁর গলা চেপে ধরেছে, এমনি গলা-ছেঁড়া-বুক-ফাটা স্বরে ব'লে উঠলেন, 'যাও এখান থেকে।'

'মন্তী, শোনো—'

হৈমন্তী ঝট ক'রে খাট থেকে নেমে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। চোখ গোল-গোল, মুখ আতঙ্কে কুৎসিত, একটা কাঁধ নগ্ন। কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'যাও, এক্ষুনি যাও।'

অরিন্দম হাত বাড়িয়ে বললেন, 'মন্তী—'

ঘৃণায় শিউরে উঠে হৈমন্তী দু' পা পেছিয়ে গেলেন। কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'যাও বলছি!' চোখে ভালো দেখছেন না, পায়ের নিচের মেঝেটা কাঁপছে, অরিন্দমের ঠোঁটে একটা বিকট জান্তব হাসি যেন তাকে গিলে খাবার জন্যে একটু-একটু ক'রে এগোচ্ছে। মাগো, বাঁচাও! পুরুষ-পশুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে নিজেকে, যেমন ক'রেই হোক। অন্ধের মতো চারদিক হাতড়াতে লাগলেন হৈমন্তী।

হঠাৎ হাতে ঠেকলো কী এটা? মনে হ'লো অনেক দূর থেকে কে যেন বলছে, 'আরে করো কী। ওটা রাখো। ওটা রেখে দাও।' তারপর যেন অরিন্দমের মুখটা চারটে মুখ হ'য়ে সেই বিকট হাসির তালে-তালে তাঁর চোখের সামনে নাচতে লাগলো।

'কী আশ্চর্য! ওটা রাখো না! হঠাৎ ছুটে গেলে—' বলতে-বলতে অরিন্দম হৈমন্তীর হাতটা ধরতে গেলেন। ছুঁলো, ছুঁলো—মূর্তিমান পাশবিকতা বুঝি ছুঁয়ে ফেললো তাঁকে। ঘোর অবিশ্বাস, ঘোর পাপ, ইন্দ্রিয়ভোগের কদর্য স্থূলতা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আসছে তাঁকে জাপটে ধরতে। ঐ তো সাপের মতো আঙুল, জ্যান্ত সাপ, জ্যান্ত পাপ। অশুচিতার দুঃসহ দুর্গন্ধে রুদ্ধ হ'লো নিঃশ্বাস—একে ঠেকাতেই হবে—নয়তো তিনি বাঁচবেন না।

হৈমন্তীর হাতের মধ্যে কী-একটা ঠাণ্ডা নিঃসাড় জড়পদার্থ যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে উঠলো।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড একটা শব্দ হ'লো। ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার গন্ধে ঘর গেলো ভ'রে। আর বুকে হাত চেপে অরিন্দম খাটের উপর প'ড়ে গেলেন।

—'মন্তী, এ করলে কী!'

এতক্ষণে যেন হৈমন্তীর ঘুম ভাঙলো। এ কী? ঘরে এত লোক কেন? অরুণ, মিনি, বুলি—ওটা বাহাদুর না? বুলিটা চ্যাঁচাচ্ছে কেন? আর কার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে! তুমি! এখানে কেন? কী ক'রে এলে? দরজা বন্ধ ছিলো না? তবে কি আজ দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম? নাও, ওঠো এখন, যাও। জামাটা আবার লাল রঙে ছুপিয়েছো কেন? ঢং! মাঝ-রাত্তিরে এ কী উৎকট তামাশা! আর বুলিটা কী অসভ্যের মতো চ্যাঁচাচ্ছে! থাম্ না! মিনি কাঁদছিস যে? হয়েছে কী?

অরিন্দম আবার বললেন, 'এ করলে কী!'

কাকে বলছো? আমি আবার কী করলুম। এই তো খানিক আগে ফিরে এলুম মায়া-মন্দির থেকে, আমি তো কিছু জানি না। ঘুমিয়েছিলুম, জেগে দেখি গোলমাল চ্যাচামেচি। এখন যাও, ঘুমুতে দাও। কী হৈ-চৈ করতে পারো তুমি বাপু—এই দুপুররাতে বাড়িসুদ্ধ লোক জাগিয়ে হুলুস্থুল। এমন আজগুবি শখ আর দেখিনি। যাও এখন—আর ঐ লাল জামাটা ছেড়ে ফ্যালো—বিশ্রী দেখাচ্ছে।

অরিন্দম বললেন, 'মন্তী, ভয় পেয়ো না। বুলি, বুলি, ওঠ্ তুই, কাঁদিসনে। আমার কিছু হয়নি।'

আহা—রসিকতার ছিরি কী! বুলি, তোদের কী রকম খেলা বল্ তো? খোকা, মিনি, তোরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বল্ না ওঁকে উঠতে। মিনি, তুইও পাগল হলি! বাপের পায়ের উপর পড়লি কেন হুমড়ি খেয়ে? উঠতে বল্, গিয়ে শুয়ে থাকুক। কী যে ন্যাকামি করিস সকলে মিলে—ঘুমুতে দিবি না নাকি?

অরিন্দম একটু ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'খোকা, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন্ কর। হাসপাতাল। আর দেরি না। মিনি, কাঁদিসনে মা।' ব'লে চোখ বুজলেন।

বা রে, এ তো ভারি মজা! ওঠো না তুমি। সত্যি বলছি, এ-সব রঙ্গ ভালো লাগে না এত রাত্তিরে। মেয়ে দুটো কাঁদতে-কাঁদতে ম'রে গেলো যে। কেন ক্ষ্যাপাচ্ছো ওদের? বুলি, বল্ না তোর বাবাকে উঠতে। বল্ না।

অরিন্দম চোখ খুলে হৈমন্তীর দিকে তাকালেন।—'মন্তী, একটা কথা। আমার একটা উইল আছে সেটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। খুঁজে বের কোরো।' অরিন্দমের চোখ সমস্ত ঘর একবার ঘুরে এলো।—'বাহাদুর!'

হঠাৎ অরুণের নজরে পড়লো বাহাদুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে হৈমন্তীর পিস্তল-ধরা হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, 'ভাগ্!' তারপর এগিয়ে এসে হৈমন্তীর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলে।

এটা কী? খোকা, ওঁর রিভলভরটা তোর হাতে দেখছি কেন? এ-সব জিনিস নিয়ে খেলা নাকি? রেখে দে শিগগির। কী, ও-রকম ক'রে তাকাচ্ছো কেন? কী হয়েছে তোমার? আর ঐ জামাটা এখনো ছাড়োনি? এখনো ছেলেমানুষের মতো রংচং পছন্দ! কিন্তু ঐ লালটা বড়ো বিশ্রী—ওটা ছাড়ো।

অরিন্দমের চোখ আবার বুজে আসছিলো, হঠাৎ উদ্দাম দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'কী করছিস সব বোকার মতো দাঁড়িয়ে? হাসপাতাল—হাসপাতালে নিয়ে চল্ এক্ষুনি। মারবি নাকি আমাকে?'

* * *

এরা আবার কারা? এত লোক কেন বাড়িতে? ভুবন, জোয়াত আলি, মোতির মা—তোমরা সব উঠে এসেছো কেন? যাও, যাও, শুয়ে থাকো গে সব, কিছু হয়নি। বা রে, হুড়মুড় ক'রে ঐ লোকগুলো ঢুকছে কেন ঘরের মধ্যে? আহা—হা, বিরক্ত কারো না, উনি ঘুমুচ্ছেন, কথা শুনছো না? তবু গায়ে হাত দিচ্ছো? বেরোও, বেরোও বলছি ঘর থেকে। বুলি, মিনি, তোরা সব যা না রে, তোদের জ্বালায় আর তো পারি না। সেই কখন থেকে চ্যাচাচ্ছিস। থাম্! কেন, কান্নার কী হয়েছে, আমি কি কাঁদছি? যা তোরা, আলো নিবিয়ে দিই। খোকা, বল্ না ওদের চ'লে যেতে। তোরও একটু বুদ্ধি নেই, রাজ্যের লোক ডেকে আনলি! নাঃ, ঘুমটা ভাঙিয়েই দেবে দেখছি। আমার কথা বুঝি গায়ে লাগছে না কারো? ভারি অসভ্য

তো লোকগুলো—ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে! কোথায় নিয়ে যাচ্ছো জানতে পারি? অসুখ করেছে? না—না—না, অসুখ-টসুখ কিছু নয়, কী-রকম মানুষ জানো না তো, এই ওঁর একরকমের ফুর্তি। আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন। দেখছো না, মেয়েগুলো কেমন ফোঁসফোঁস করছে! সত্যি-সত্যি ভয় পেয়ে গেছে আরকি। দুর বোকা—ভয় কী? ওগো শোনো, তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে ছাখো না। আমার কথা তো শোনে না এরা, তুমি বলো। বলো, কিছু বলো, কথা বলো। কী ছেলেমানুষের মতো ঘুম তোমার—আস্ত মানুষটাকে তুলে নিয়ে চলেছে, তবু ভাঙে না। বাহাদুর, দে বাবা আর একটা বালিশ ঘাড়ের তলায়। একটা বালিশে শুতে পারে পুরুষমানুষ! ঘাড় ব্যথা হয় না! জীবন কাটালি ওঁর সঙ্গে, কিচ্ছু শিখলি না! আমার দিকে ও-রকম ক'রে তাকাচ্ছিস কেন রে? আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানি না। ঘুমিয়ে ছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি—আরে! নিয়ে চ'লে গেছে! কোথায় গেলো? কোথায় গেলো? বুঝেছি, বুঝেছি। সবই ঐ খোকার কারসাজি। হতভাগা শয়তান! টাকার লোভে তুই বাপকে মারবি! ঐজন্যেই লোকগুলোকে ডেকেছিলি? সত্যি বল, অজ্ঞান করার ওষুধ দেয়নি ওরা? তারপর ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেলো। এবারে মেরে ফেলবে, এই তো? তুই ভেবেছিস পালাতে পারবি [illegible] নিয়ে? রক্ষে নেই তোর, সব ব'লে দেবো আমি, সব ব'লে দেবো। ও কী! আবার রিভলভরটা পকেটে পুরছিস কেন? ওটা রেখে দে! ওটা রেখে দে! যা শিগগির, ওদের ডেকে নিয়ে যায়, ওঁকে ফিরিয়ে আন। ফিরিয়ে আন বলছি, আমার কথা আছে ওঁর সঙ্গে—এক্ষুনি যা—ওগো, কোথায় গেলে তুমি, কথা শোনো, ফিরে এসো—

অরুণ এগিয়ে এসে হৈমন্তীর কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, '*তুমি শুয়ে থাকো দেখি, মা, আমি চট করে একটু ঘুরে আসছি।*'

৪

হৈমন্তী ফিরলেন প্রায় সাড়ে-দশটায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্রুতপায়ে বারান্দা পার হ'য়ে অদৃশ্য হ'লেন ঘরের ভিতর, অরিন্দম যে ব'সে আছেন ইজি-চেয়ারে তা যেন লক্ষ্যই করলেন না। গরদের শাড়িটি অরিন্দমের চোখের উপর ঝিলকিয়ে চ'লে গেলো, রুপালি তার পাড় ইলেকট্রিক আলোয় প্রায় চোখেই পড়ে না। হৈমন্তীর ফর্শা রঙের সঙ্গে সমস্ত শাড়িটিই যেন মিলিয়ে আছে—এখনো, অরিন্দম মনে-মনে ভাবলেন, এখনো সে এত সুন্দর যে অবাক লাগে। মিনিট পাঁচেব পরেই হৈমন্তী ফিরে এলেন বারান্দায়, একটি কালো পাড়ের মিলের শাড়ি প'রে। কোনোরকম ভূমিকা না-ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়েছো?'

অরিন্দম মাথা নাড়লেন—'তুমি এত দেরি করলে যে?'

'দেরি একটু হ'য়ে গেলো। চলো খেতে।'

মনের রাগ চেপে রেখে অরিন্দম উঠে দাঁড়ালেন। খাওয়াটাই এখন সব চেয়ে দরকারি কাজ; হৈমন্তীকে বলবার জন্যে যে-সব কথা মনে-মনে তিনি সাজিয়ে রেখেছেন সেগুলো পরে বললেও চলবে। নিঃশব্দে, খালি পায়ে, হালকা শরীরের অনায়াস ভঙ্গিতে হৈমন্তী নামলেন সিঁড়ি দিয়ে, আর তাঁর পিছনে অরিন্দম, মোটা, মজবুত চটির চটপট শব্দে পেটেন্ট স্টোন সচকিত ক'রে। সিঁড়িটি মাঝামাঝি এসে যেখানে বেঁকে গেছে সেখানে একটি বড়ো আয়না অরিন্দমই বসিয়েছিলেন—চকিতে তাঁর চোখ পড়লো সেখানে। মিলিটারি কাপ্তান গোছের একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে ছোট্ট ছিপছিপে একটি

মেয়েকে দেখতে পেয়ে তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন। চল্লিশ পেরিয়েও এই ছিপছিপে ভাবটি কী কৌশলে বজায় রেখেছে মন্তী! যত বয়েস বাড়ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীরের ক্ষীণ, ক্ষণ-ভঙ্গুর ভাবটিও যেন বাড়ছে, মুখে তার এমন স্বচ্ছ আভা আগে কি কখনো ছিলো! কী সেই গূঢ়মন্ত্র যার সাহায্যে মধ্যবয়সের মেদবৃদ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? সে কি যোগাসনের ব্যায়াম? সে কি ঈশ্বরের ধ্যান? সে কি কম খাওয়া? ঐ মহামায়া মহিলার সঙ্গে দেখা হ'লে খোঁজ নিতে হবে।

খাবার ঘরে মিনি টেবিল সাজাচ্ছে, আর বুলি একটা চেয়ারে ব'সে তন্ময়চিত্তে কড়ে আঙুলের নখ খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে পড়ছে একটি মাসিকপত্রের গল্প। 'বোসো, বাবা,' মিনি অভ্যর্থনা করলে। 'আমি তোমার স্যুপটা তৈরি করতে গিয়েছিলুম—বেশি ভালো হয়নি।'

অরিন্দম বললেন, 'উজ্জ্বলা—উজ্জ্বলা কোথায়?'

'এক্ষুনি ডেকে আনছি তাকে।' মিনি ছুটলো দোতলায়।

বুলি হঠাৎ গল্প থেকে বাস্তবে বদলি হ'য়ে বললে, 'দাদা বুঝি ফেরেনি এখনো?'

অরিন্দমের মুখে একটা কালো ছায়া নামলো।—'তার জন্যে অপেক্ষা করবার কোনো দরকার নেই।'

হৈমন্তী তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার পিছনের ইতিহাস অনুমান করবার চেষ্টা করলেন। অরুণের সঙ্গে তার বাবার কি দেখা হয়েছে? এ ক'ঘণ্টায় ছেলের সম্বন্ধে কতটা জেনেছেন অরিন্দম? একটু ভেবে তিনি এমন একটা মন্তব্য করলেন যা সম্পূর্ণই নিরপেক্ষ, 'অরুণের ভাত টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখলেই হবে, যখন আসে খাবে।'

এক চামচে স্যুপ মুখে দিয়ে অরিন্দম বললেন, 'এ-বাড়ির ভাত ও আর যাতে কখনো না খায় তার ব্যবস্থা আমি করেছি।'

বাবার অসাধারণ গাম্ভীর্যে বুলির হাসি পেলো। মাসিকপত্রটা

ঝোলেতে ফেলে দিয়ে সে বললে, 'কী ক'রে করলে, বাবা? দাদা যদি বেশি রাত্রে এসে চুপি-চুপি খেয়ে যায়, তুমি কি টের পাবে?'

'তোদের সকলকেই বলা রইলো—অরুণকে আবার যদি এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়, এক্ষুনি আমাকে খবর দিবি। বুঝলে তো?'

শেষের কথাটা স্ত্রীর উদ্দেশে বলা। হৈমন্তী চামচে দিয়ে একটা গেলাশের গায়ে ঠুনঠুন আওয়াজ করতে লাগলেন, কিছু বললেন না, বলা বৃথা। স্বামীর আসুরিক বৃত্তি প্রতিবাদে আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু কৌশলে হার মানে সহজে। হৈমন্তীর জীবনযাপনের যে একটি মধুর শৃঙ্খলা এতদিনে গ'ড়ে উঠেছে, স্বামীর উপস্থিতিতে পদে-পদেই তার ব্যতিক্রম হবে, এ-আশঙ্কা নতুন নয়। এ-বাড়িতে একটি প্রশান্ত আবহাওয়া কত চেষ্টায় তিনি রচনা করেছেন, যে যার মনে থাকে ও চলে, কারো সঙ্গে কারো গা-ঘেঁষাঘেঁষি নেই, একটা চড়া কথাও কখনো শোনা যায় না। শান্তি, শান্তি, মা-র অনুপম করুণা। আর এখন একটা মানুষের অভ্যাগমে—আক্রমণে বলা যায়—হৈ-হৈ, হুল্লোড়, হাসাহাসি লুটোপুটি কান্নাকাটি, কলহ, ক্রোধ—বাস্তবিক, সংযমের এমন অভাব ঐ ভদ্রলোকের! বাড়িতে পা দিয়েই এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন।

'উজ্জ্বলা এখনো আসছে না তো। কী হ'লো ওর?'

'আসবে এক্ষুনি। ততক্ষণে আমরা খেতে থাকি এসো!' মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা মুগের ডাল ভাতের সঙ্গে মেখে বুলি বললে, 'ভুবন, আমাকে একটা মাছ ভাজা দাও।'

আরো দু' চামচে স্যুপ মুখে দিয়ে অরিন্দম ঠোঁট বেঁকিয়ে প্লেটটা সরিয়ে রাখলেন। কাপড়-কাচা জলের মতো হয়েছে। মিনি কেন যে খাবার জিনিস নিয়ে এ-সব ফাজলেমি করতে যায়! আর উপরে যে গেছে তো গেছেই—আসবার নাম নেই। সবাই একসঙ্গে

ব'সে যে ফুর্তি ক'রে খাবো তাও কি এদের জ্বালায় হবার জো আছে!

অবশ্য মিনির এই দেরি মোটেই অকারণ কি ইচ্ছাকৃত নয়। বৌদির ঘরে গিয়ে সে দ্যাখে, উজ্জ্বলা খাটের উপর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, 'বৌদি, খেতে চলো দিদিগির,' কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। দু' তিনবার ডেকেও যখন কোনো ফল হ'লো না, তখন মিনি অগত্যা এগিয়ে খাটের ধারে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলার কাঁধ ধ'রে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তোমার?' উজ্জ্বলা মুখ ফেরালো তার দিকে; ঘরে যে-ম্লান নীল আলো জ্বলছে তাতেও মিনি দেখতে পেলে তার দু' গালে চোখের জলে আঁকা কালো দাগ। আস্তে বললে, 'কী হয়েছে, কাঁদছো কেন?'

উত্তরে, উজ্জ্বলা তার শাড়ির আঁচলের খুঁটটা মিনির সামনে তুলে ধরলো। মিনি কিছুই না-বুঝে বললে, 'কী হয়েছে বলো না।'

আঁচলের খুঁটটা দু' আঙুলের মধ্যে পাকাতে-পাকাতে ভাঙা-ভাঙা রুদ্ধস্বরে উজ্জ্বলা ব'লে উঠলো, 'গেছে, নিয়ে গেছে।'

'কী, কী, নিয়ে গেছে?'

উজ্জ্বলা আবার আঁচলের খুঁটটা তুলে ধ'রে একটা চরম হতাশার ভঙ্গিতে হাত ওল্টালো। হঠাৎ মিনি যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

—'ও, বাবা যে মোহর দিয়েছিলেন কমলকে!'

'হ্যাঁ', ভূতের মতো গলায় উজ্জ্বলা বললে। 'আঁচলে বেঁধে রেখেছিলাম—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—নিয়ে গেছে—বটেই।'

কে নিয়েছে সেটা উজ্জ্বলাও বললে না, মিনিও জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলে না। এর পরে বেশ কিছুদিন দাদাকে আর বাড়িতে দেখাই যাবে না, মিনি ভাবলে। বাবার সঙ্গে দাদার যে বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে, বৌদি কি তা জানেন? অবশ্যি জানলে—বা না জানলে—কিছু কি

এসে যায়? বৌদির পক্ষে একই তো কথা। আপাতত এইটেই দেখতে হবে যে এই মোহরের ব্যাপারটা যাতে ফাঁস না হয়—অন্তত বাবার কানে না ওঠে।

'বৌদি', মিনি তাড়াতাড়ি বললে, 'এর জন্যে এত কাঁদছো তুমি! কী আর হয়েছে—দাদা না-হয় ঐ মোহর ক'টা খরচই করলে—বাবা তো কখনো জানবেন না, তাহ'লেই হ'লো।'

এ-কথা শুনে উজ্জ্বলার গলা চিরে হঠাৎ আর এক দমক কান্না বেরুলো। বিকৃতস্বরে বললে, 'মিনি, মিনি, আমি কেন মরি না, মরলেই তো বাঁচি।'

'ছি, বৌদি, ও-কথা বলতে নেই। চলো খাবে—বাবা ব'সে আছেন।'

ঈষৎ সন্ত্রস্তভাবে খাট থেকে নামলো উজ্জ্বলা। মিনির কথাটা যেন একটা আদেশ, যা সে পালন করতে বাধ্য। এ-বাড়িতে সে এসেছে খুশি করতে, খুশি হ'তে নয়; যদি সম্ভব হয় সকলের সুখ, সকলের সুবিধে জুগিয়ে চলবে সে, তাকে নিয়ে কেউ বিব্রত হবে, বিরক্ত হবে, এ একেবারেই অসম্ভব। তার দুঃখ—যদি কিছু থাকে—তার একলারই ব্যাপার, তার মনের গহনে অন্য কাউকে আমন্ত্রণ করবার অধিকার তার নেই। সকলের সঙ্গে সব সময় হাসিখুশি ভাব বজায় রেখে চলাই তার কর্তব্য—তার কর্তব্য একান্ত বাধ্য, একান্ত বিনীত ও যথাসম্ভব নির্বাক হওয়া। এর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রুটি হয় না উজ্জ্বলার, কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও প্রফুল্ল, পরিতৃপ্ত ভাবটা মুখে আনতে পারে না। আনতে পারে না ব'লে লজ্জারও সীমা নেই তার। মিনির সামনে হঠাৎ ও-রকম একটু কেঁদে ফেলেছিলো ব'লে ইতিমধ্যেই সে লজ্জিত বোধ করতে আরম্ভ করলে। খাট থেকে নেমে গায়ে আঁচলটা জড়াতে-জড়াতে বললে, 'চলো।'

'চোখ-মুখটা একটু ধুয়ে নাও, বৌদি।'

সত্যি, মুখটা ধুয়ে নেয়া উচিত…এতক্ষণ ধ'রে কেঁদেছে, তার মুখ দেখে বাড়িসুদ্ধ লোকের বোধ হয় খিদে নষ্ট হ'য়ে যাবে। তার নিজেরই মনে হওয়া উচিত ছিলো কথাটা। বাথরুমে গিয়ে সে দু' চারবার নাক ঝাড়লে, চোখে দিলে জল ছিটিয়ে, তারপর ড্রেসিং টেবিলে এসে মুখে পাউডর পফ্‌টাও একবার বুলিয়ে গেলো।

দু'জনে যখন খাবার ঘরে গিয়ে পৌঁছলো, অরিন্দম তখন একটি বড়ো চিংড়ির মুণ্ড প্রায় আস্ত মুখের মধ্যে পুরে সশব্দে চিবোচ্ছেন। তাদের দেখেই চিবোনো থামিয়ে বললেন, 'এ-বাড়িতে কারুরই দেখছি আহারে রুচি নেই—আমি ছাড়া।'

'আর আমি, বাবা, আমি?'

বুলির কথা অগ্রাহ্য ক'রে অরিন্দম বলতে লাগলেন, 'মিনি, তোর মা তো শুনলুম রাত্তিরের খাওয়া ছেড়েছেন। তুইও সেই দলে নাকি? আর তুমি, উজ্জ্বলা?'

হৈমন্তী বললেন, 'নিজের যা ইচ্ছে হয় বললেই তো পারো—ওদের রেহাই দাও।'

'আমি জানতে চাই তুমি কেন এখন আমাদের সঙ্গে ব'সে খাবে না।'

'বললুম যে, রাত্তিরের খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি '

'কেন, ছেড়েছো কেন? কবে থেকে ছাড়লে?'

'খেতে ইচ্ছে করে না—আবার কী!'

'সত্যি ইচ্ছে করে না? খিদেও পায় না?' জঠরের—ও রসনার—তাগিদে সর্বদাই চঞ্চল, অরিন্দমের এটা ভেবেই সব চেয়ে অবাক লাগলো যে পুরোপুরি একটা আহার বাদ দিয়ে হৈমন্তীর কোনোই

অসুবিধে হচ্ছে না। 'কিচ্ছু খাও না রাত্তিরে?' অবিশ্বাসের সুরে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'বাঃ, তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী, একবেলা তোমার খাওয়ার কষ্ট হ'লে আমার যেন অনন্ত নরকবাস হয়, এই শপথ ক'রে তোমাকে বিয়ে করেছি—আর তুমি কী খাও তা জিজ্ঞেসও করতে পারবো না? আমি একবেলা একটু কম খেলেও তুমি তো কত ব্যস্ত হও।'

'অবশ্য ব্যস্ত হবার কারণ বড়ো একটা ঘটে না', হৈমন্তী মুচকি হেসে বললেন। আর দু'বোন একসঙ্গে হেসে উঠলো; বাপের ঔদরিকতা সম্বন্ধে রসিকতা তাদের কখনোই পুরোনো ঠেকে না।

সে-হাসিতে যোগ দিয়ে অরিন্দম বললেন, 'বেশ তো, আমি না-হয় পরিমাণে একটু বেশি খাই, কিন্তু এ-বিষয়ে তোদের মায়েরও উৎসাহের অভাব কখনো দেখিনি। জ্যান্ত মুরগি দেখলেও তাঁর জিভে জল আসতো।'

ছোট্ট নাকটি উপরের দিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে হৈমন্তী বললেন, 'কী-সব যা-তা বলো!'

'ও, এ-সব কথা এখন যা-তা হ'লো বুঝি? কিন্তু সত্যি বলো, কিচ্ছু খাও না রাত্তিরে? নিজের ঘরে লুকিয়ে দু' চারখানা কটলেট?'

এবার বুলি একাই হাসলো, কারণ মিনি মাথা নিচু ক'রে খাওয়ায় মন দিলে, আর হৈমন্তী চাপা গলায় ব'লে উঠলেন, 'লজ্জাও নেই!'

বুলি বললে, 'মা তো মাংস একেবারেই খান না আজকাল—জানো না বুঝি, বাবা? আর রাত্তিরে দুধ আর ফল ছাড়া কিচ্ছু খান না।'

'ও, বৈধব্যের রিহার্সেল দিচ্ছো বুঝি? তা এত শিগগিরই এ-সব সদভ্যাস না-করলেও পারো—আমি শিগগির মরছি না।'

হৈমন্তী কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলেন। ভয়, দারুণ

ভয়। প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের মনে। যখন পরিপূর্ণ সুখ, সংসারে যখন শান্তি ও সচ্ছলতা, শরীরে যখন সম্ভোগের উল্লাস, তখনো হঠাৎ এ-কথা মনে প'ড়ে কোন্ স্ত্রীলোকের না মুখ শুকিয়ে যায়—যদি—যদি সর্বনাশ ঘটে, যাবে সব যাবে একজনের অনুপস্থিতিতে, খাওয়া-পরা আমোদ-প্রমোদ ভোগ-বিলাস মান-সম্ভ্রম সব যাবে, নিছক মনুষ্যত্ব তাও যাবে, তারপর যতদিন বেঁচে থাকা হীন, ভীত, লাঞ্ছিত দাসজীবন। এক মুহূর্তে জীবনের এমন সার্বিক, সর্বনেশে রূপান্তর পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনো মানুষের ভাগ্যেই বোধ হয় ঘটে না। তাই ভয়, মর্মান্তিক ভয়। আর হিন্দু স্বামীরাও জানেন তাঁদের জীবনের মূল্য স্ত্রীদের কাছে কতখানি, তাই তাঁরা তার সুযোগ নিতেও ছাড়েন না, যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন স্ত্রীদের, অপব্যবহার, দুর্ব্যবহার করেন, আর স্ত্রীরা খুশি হ'য়ে, বড়ো জোর নীরবে, সহ্য করেন, কারণ ভয়, রক্তশোষণ ভয়। ওগো, তুমি না-থাকলে আমার কী উপায় হবে!—কথাটা আন্তরিক, পুরোপুরি সত্য, যে বয়েসের স্ত্রী যে-ভাবেই বলুন না। সত্যি, কী উপায় হবে! এত প্রিয় যে ইলিশ মাছ তাও এক টুকরো মুখে তোলা যাবে না। কপালে সিঁদুর নিয়ে মরতে পারা যে পুণ্যবতী-সতীত্বের চরম পরিচয়, সে তো এইজন্যেই। যন্ত্রণার যে-সব সূক্ষ্ম কলকব্জা তার শেষ জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে, তাদের মুখে চড় মেরে ফাঁকি দিয়ে পালালো—ধন্য মেয়েমানুষ! একাদশীর উপোস, থানকাপড়, আমিষ খাবার তীব্র গোপন ইচ্ছা, এবং সেই অপূর্ণ ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া রূপ কুৎসিত শুচিবায়ুরোগ, দেওরের, ভাইয়ের, জায়ের, ছেলের, ছেলের-বৌর মুখ-ঝামটা এক ধাক্কায় সব এড়িয়ে চ'লে গেলো—সাবাস! হিন্দুসমাজে স্ত্রীর উপরে স্বামীর যে এমন অগাধ ক্ষমতা, তার প্রধান কারণ বৈধব্যভীতি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বামী যা-ই হোক্, রুগ্ন, উন্মাদ, লম্পট, সন্তানোৎপাদন ছাড়া অন্য সব বিষয়েই অকর্মণ্য···যা-ই হও তুমি,

তোমার পায়ে মাথা রেখেই যেন মরতে পারি, শেষ দিন পর্যন্ত মাছ খাবার মহৎ অধিকার যেন আমার বজায় থাকে।

কিন্তু হৈমন্তী, হৈমন্তী এই আতঙ্ক থেকে মুক্ত। মা-মহামায়ার এটুকুই করুণা আমার উপর, আধো-খোলা চোখে অস্পষ্ট তাকিয়ে হৈমন্তী ভাবলেন, মায়ের সংস্পর্শে এসে এতদিনে এটুকু শক্তি আমার হয়েছে যে ভয়কে আর ভয় ব'লে মানিনে। বৈধব্যকে ভয় নেই, সুতরাং স্বামীকেও ভয় নেই। কোনো কারণেই, কিছুতেই, স্বামীর কোনো জুলুম আর তাঁকে সইতে হবে না; কেননা স্বামিত্বের শেষ অস্ত্র, নিজের মৃত্যুর ভয় দেখানো, তাঁর উপর ব্যর্থ। হৈমন্তী গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে আস্তে-আস্তে ছাড়লেন; মনের মধ্যে তিনি যে-গর্ব, বিজয়ের যে-সুখকর উত্তাপ অনুভব করছিলেন ওটা তারই একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ। দু'মন সাত সের ওজনের যে জাঁদরেল পুরুষটি টেবিলে তাঁর উল্টো দিকে ব'সে আছে, তার প্রতিপত্তি, তার শক্তির সীমানা তিনি ছাড়িয়ে এসেছেন, এসেছেন সেই শান্তির, সেই মুক্তির মোহানায়, যেখানে স্বামী-পুত্র তুচ্ছ, যেখানে চিরযমুনার জল কৃষ্ণের বাঁশিতে উতল। শ্রীরাধিকারও স্বামী ছিলো, বোধ হয় পুত্রও ছিলো, কিন্তু স্বয়ং ভগবান যাকে ডাকেন···মায়ামন্দিরে যে-সব গান এইমাত্র শুনে এলেন সেগুলো গুনগুন ক'রে ফিরছিলো হৈমন্তীর মনে। 'যমুনার জল বাঁশিতে উতল বাঁশিতে পাগল রাধা, আঁধারে একেলা চলিছে অবলা চরণে নূপুর আধা।' চরণে নূপুর আধা, এ-পদটি ঠাকুর কতবার গাইলেন, কী মধুর হেসে, আঙুলে তুড়ি দিয়ে-দিয়ে, পা দুটি তালে-তালে ফেলে। কী সুন্দর গান করেন এই অনঙ্গ ঠাকুর। আর চেহারাই বা কী সুন্দর তাঁর, চোখে-মুখে যেন একটা ঐশ্বরিক জ্যোতি, খালি গায়ে পৈতেটি ঝুলিয়ে গরদের ধুতি প'রে যখনই এসে দাঁড়ান সঙ্গে-সঙ্গে শরীর হর্ষে ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হয়। আহা—কী ভাগ্যবান পুরুষ, এই তরুণ বয়েসেই

ঈশ্বরে মন গেছে। অনন্ত ঠাকুরের বৌ আছে, ছেলেপুলেও আছে, তা সত্য; কিন্তু সংসারে তাঁর মন নেই, শ্যাম নামেই তিনি তন্ময়। তাঁর বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের যে যুগল মূর্তি আছে তার জন্য দুটি সোনার হার তিনি চেয়েছেন—এ-মাসেই গড়িয়ে দিতে হবে।

'তাছাড়া বিধবা হ'লেই বা ভয় কী আজকাল', অরিন্দমের গুমগুমে আওয়াজ আবার শোনা গেলো, 'ফিতে-পাড় ধুতি আর সোনার সরু হার পরা তো চ'লেই গেছে—সকালে চায়ের সঙ্গে দুটো ডিমের পোচ্ খাওয়াও এলো ব'লে।' দ্বিতীয় চিংড়ির মুড়োটা পাতে তুলে নেবার জন্য একটু থামলেন তিনি। মোটা-মোটা, লোমশ গিঁটওয়ালা আঙুল মুণ্ডটার ভিতরে চালিয়ে ঘন হলদে পদার্থটা বা'র ক'রে এনে আঙুলটা সযত্নে চাটতে-চাটতে বললেন, 'আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ বছর পরের বিধবারা ঢাকাই শাড়ি প'রে সরু-সরু আঙুলে এমনি ক'রেই চিংড়ির জীবজন্ম সার্থক করছে।' মুড়োটা চিবোবার জন্য আবার থামলেন তিনি, যে-শব্দটা হ'লো তাকে বাঁশ ফাঁড়ার ছোটো সংস্করণ বলা চলে। 'ওঃ, কী সুখের দিন আসছে! কিন্তু তুমি একটু পেছিয়ে পড়লে হৈমন্তী, তোমার আয়ুতে সকালে ডিমের পোচ্ অবধি পৌঁছতে পারবে—তার বেশি না।'

এর বেশি স্বামীর কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়, হৈমন্তী ভাবলেন, মানুষের সুখদুঃখের একমাত্র পরিমাপ তিনি জানেন শারীরিক সম্ভোগ। ভোজন ও মৈথুন—এ দুই থেকে বঞ্চিত হ'তে না হ'লেই তাঁর স্বামী, এবং আরো অনেক অনেক লোক, যারা শুওরের মতো সংসারের নোংরামিতে গড়ায় (উপমাটি, এবং সত্যি বলতে মূল প্রস্তাবটি মা-মহামায়ার কথামৃত), তারা সকলেই মনে করে যে এ-ই সুখ। আমাদের এই শরীরটা তো পশু, আর পশুত্বের স্তরেই ওদের সকলের জীবন। (অরিন্দমকে ঘাড় কাৎ ক'রে কুড়মুড় শব্দে

কুকুরের মতো চিবোতে দেখে হৈমন্তীর যেন ঈষৎ গা-বমি-বমি ক'রে উঠলো।) হিন্দু বিধবার দুঃখের কথা ভেবে যাঁরা কাঁদে, তারাও পশুপ্রকৃতি অনুসারেই মানুষের বিচার করে—মনে করে সব রকম জিনিস খেতে পারলে, আবরণ ও আভরণের চাকচিক্যে লোকের চোখ ধাঁধাতে পারলে, সন্তানোৎপাদনের প্রবৃত্তি (যদি [illegible] হয় সন্তানোৎপাদন বাদ দিয়ে—এটুকুই যা পশুত্ব থেকে তফাৎ) চরিতার্থ করতে পারলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। পশুত্বের উর্ধ্বে যারা উঠতে পারে, শারীরিক সম্ভোগ ত্যাগ করার, বীতস্পৃহ হবার আনন্দ যারা জানে সংখ্যায় তারা কত কম!—জ্ঞানী গুণী নামজাদা যত বড়ো-বড়ো লোক, তাদের মধ্যেই বা ক'জন সে-আনন্দ চেয়েছেন কি খুঁজেছেন! ভয় ও বাসনা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরকে যে চায়, ঈশ্বরকে যে খোঁজে, সে-মানুষ কোথায়, কোথায়···আর কী ভাগ্য আমাদের, বালিগঞ্জের মাত্র পাঁচ মাইল দূরে এক গরিবের কুঁড়ে ঘরে সেই লাখে-না-মিলল-এক মানুষেরই কিনা আবির্ভাব হ'লো! যে-আনন্দের স্বাদ মা দিয়েছেন, শরীরের কষ্ট তাকে আরো তীব্র, আরো সূক্ষ্ম ক'রে তোলে; সে-আনন্দ যার মনে, তার কাছে বৈধব্যের আত্মাহুতি শুধু-যে ভীতিপ্রদ নয় তা নয়, রীতিমতো বাঞ্ছনীয়। মা-র ভক্তদের মধ্যে যারা বিধবা তাদের কথা ভেবে হৈমন্তীর ছোটো একটি নিঃশ্বাস পড়লো। কত বেশি সুবিধে তাদের, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালীই ধর্মের অনুকূল। হৈমন্তীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা যে তাদের চেয়ে একটুও কম নয়, তা তিনি ইচ্ছা করলেও প্রমাণ করতে পারেন না। রাত্রের খাওয়াটা ছেড়েছেন বটে, মাংস ডিমও ছেড়েছেন, কিন্তু একবেলা যা খান তা থেকে মাছটা কিছুতেই বাদ দিতে পারেননি—তার কারণ সংস্কার দুর্মর, আর তাছাড়া মাছ বাদ দিয়ে একেবারেই তাঁর ভাত রোচে না, যদিও নিজের কাছে কখনো সে-কথা স্বীকার করেন না তিনি। তবু, হাজার করলেও, সত্যি-

সত্যি যারা বিধবা তাদের সঙ্গে উপবাসে, অনুষ্ঠানে, নিয়মরক্ষায় তিনি পেরে উঠবেন কেন?...হৈমন্তীর মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হ'য়ে যায়, কিন্তু তখনই মা প্রায়ই তাঁকে যে-কথা বলেন তা মনে ক'রে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন। মা বলেন, 'বিধবারা তো শুকনো চিবচ্ছে, আর তুই খাস্‌নো বসে টুসটুসে। তোর ত্যাগই বড়ো।' ঈশ্বরে মন না দিয়ে যাদের উপায় নেই, আর বিবিধ ভোগ-বিলাস অনায়াসে অধিগম্য হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় যে ঈশ্বরে মন দিয়েছে ...না, কোনো সন্দেহ নেই যে প্রচণ্ডতম বিধবার চেয়েও হৈমন্তী ধর্মের পথে কম অগ্রসর নন। একাদশীর দিন নির্জলা উপোস ক'রে তেষ্টায় ছটফট করলেই মস্ত পুণ্য হ'লো এ-কথা যারা ভাবে তাদের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—ও-সব বাজে ভড়ং-এর ধার ধারেন না হৈমন্তী, খাঁটি জিনিস নিয়ে তাঁর কারবার।

'সকালে চায়ের সঙ্গে এগ্‌-পোচ্‌ অবধি পৌঁছতে পারবে', অরিন্দম আবার বললেন।

বুলি ব'লে উঠলো, 'আমরা বুড়ো হতে-হতে তাহ'লে চপ-কটলেটও চলবে।'

হৈমন্তী মুচকি হেসে বললেন, 'খেতে পারলেই সব দুঃখের অবসান হ'লো বুঝি?'

বুলি পরম বিজ্ঞের মতো বললে, 'না, না—স্বামীর জন্যে শোক কি আর চপ-কটলেটে জুড়োয়!'

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অরিন্দম, মিনিও হাসলো, এমন কি উজ্জ্বলার ম্লান মুখেও একটু হাসির আভা ঝিলকিয়ে উঠলো। হাসলেন না শুধু হৈমন্তী, বরং একটু আগে তাঁর ঠোঁটে যে-হাসির রেখাটি খেলছিলো তা গেলো মিলিয়ে। তাঁর মুখের ভাব এই রকম যেন ঐ ষোলো বছরের মেয়ে একটা ভাববার মতো কথা বলেছে। একটু

পরে তিনি বললেন, 'খেতে না-পারাটা আমরা যতটা খারাপ মনে করি আমাদের দিদিমারা তা মনে করতেন না।'

চিংড়ি শেষ ক'রে অরিন্দম মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত মাখছিলেন; চোখ তুলে বললেন, 'অ্যা, তাই নাকি?'

'তখনকার দিনে এমন স্ত্রীলোক দেখা যেতো, যারা একটু বয়েস হ'লে বিধবা হ'তেই চাইতেন।'

'সত্যি?' অরিন্দম মুখে আর-কিছু বললেন না, কিন্তু মনে-মনে ভাবলেন যে চল্লিশের পরে স্ত্রীলোকের জীবনে যে-আমূল পরিবর্তন ঘটে, এ হয়তো তারই একটা প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। যে-স্ত্রী সন্তান-ধারণের অযোগ্য হ'য়ে গেছে, সে তার স্বামীকে (যে তখনো সম্ভাব্য পিতা) একটা আপদ মনে করতে পারে বইকি—যদি না তাদের মধ্যে থাকে স্নেহের বন্ধন, যা, সুখের কথা, মানুষ-দম্পতির মধ্যে সাধারণত থাকে। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো থাকেও না, এবং সেই সব স্ত্রীরাই একটু বয়েস হ'লে, অর্থাৎ চল্লিশোত্তরে, বিধবা হ'তেই চান। খুব হয়তো দোষও দেয়া যায় না বেচারাদের, কারণ দশ-বারোটি সন্তান বহন ও পালন ক'রে তারা চল্লিশেই নিতান্ত ক্লান্ত; এবং এই উপদ্রব থেকে প্রকৃতিই যখন তাদের মুক্তি দিলো, তখন সম্পূর্ণ অন্য রকমের, পুরুষস্পর্শহীন জীবনের প্রতি লোভ স্বভাবতই তাদের হ'তে পারে। সধবা অবস্থাতেও কোনো স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা তাদের (অন্তত হৈমন্তীর দিদিমার আমলে) ছিলো না, সুতরাং সে-দিক থেকে বৈধব্যে তাদের কোনো ক্ষতি নেই। বরং বিধবার অন্য ধরনের একটা মর্যাদা আছে, যেটা লোভনীয়; অর্থাৎ ভুলক্রমে কোনো শিশু যদি চিঁড়ে চিবোতে-চিবোতে ছুঁয়ে দেয় তাহলে ঠাস্ ক'রে তার গালে এক চড় বসিয়ে শীতের রাত্রে পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে এসে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে তোমাদের সকলের চাইতে আমি ঢের উঁচু ধরনের

জীব। হ্যাঁ, অবস্থাবিশেষে বৈধব্য লোভনীয় হয়, তাতে সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটার এইভাবে মীমাংসা ক'রে অরিন্দম আবার মুর্গির ঝোলে মন দিলেন।

'মায়ের বাপের বাড়ির গ্রামে', হৈমন্তী বলতে লাগলেন, 'ছিলেন এক মুখুজ্জে ঠাকরুন। কর্তার ছিলো হাঁপানি, আজ মরে কি কাল মরে। সেবারে শীতকালে বুড়োর অবস্থা খারাপ হ'লো, ঠাকরুন ঢাকায় লোক পাঠিয়ে আনালেন পাথরের থালা পেতলের ডেকচি, এমনকি দু' জোড়া থান কাপড়, নিজের হাতে পাতলেন নতুন উনুন, কর্তার খড়ম জোড়া সরিয়ে রাখলেন ঠাকুরঘরে রাখবে ব'লে। আমার দিদিমার কাছে এসে বলতেন—আমার স্পষ্ট মনে আছে—"সংসারে সুখ নেই, দিদি, ধম্মকম্মই সার। কর্তার শেষ কাজটা সেরেই আমি একবার বেরুবো বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে। হরি! হরি!" কিন্তু কর্তা সে-যাত্রা সামলে উঠলেন—গরম পড়তেই দিব্যি চাঙ্গা হ'য়ে উঠে হুঁকো হাতে খড়ম পায়ে ঠুকঠুক ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।'

'কী অন্যায় ভদ্রলোকের!' অরিন্দম ব'লে উঠলেন। 'কিন্তু ঠাকরুনেরও জানা উচিত ছিলো যে হাঁপানি রোগী সহজে মরে না।'

'সহজে মানে! ঠাকরুন যতই বৈধব্যের সরঞ্জাম জড়ো করেন, কর্তা যেন ততই জেদ্ ক'রে বেঁচে থাকতে লাগলেন। আস্তে-আস্তে সবই এলো—রুদ্রাক্ষের মালা, পুজোর কোষাকুষি, শাঁখ, নারায়ণের বিগ্রহ—তালতলার অমৃতানন্দ বাবাজির কাছ থেকে ঠাকরুন মন্ত্রও নিয়ে ফেললেন—তারপর সকালে সন্ধ্যায় তাঁর শাঁক বাজাবার, গাল ফুলিয়ে ববম্-ববম্ করবার কী ঘটা। ঝাড়া চার ঘণ্টা নাকি ঠাকুর-ঘরেই থাকতেন! সবই একরকম হ'লো—কিন্তু চাঁছা মাথায় থানকাপড়

প'রে পেতলের হাঁড়িতে আতপ চাল কাঁচকলা সেদ্ধ রেঁধে খাওয়া—তা আর কিছুতেই হচ্ছে না।'

'কী অন্যায়! কী অন্যায়!' অরিন্দম আবার বললেন। 'কিন্তু এ-সব আয়োজন দেখে মুখুজ্জে মশাইর মনটা একটু খারাপ লাগতো না কি?'

'কই, তা তো মনে হ'তো না। বরং তিনিই আরো গরজ ক'রে ঠাকরুনকে সব জিনিসপত্র আনিয়ে দিতেন। বিধবা অবস্থায় জপ-তপ ক'রে স্ত্রী যে-পুণ্য কুড়োবেন, তার উপর বুড়োরও যেন বেশ একটু লোভ ছিলো।'

'বাঃ চমৎকার সতী স্বামী তো। তারপর? কবে মরলো বুড়ো?'

'এক বছর, দু'বছর কাটে—বুড়োর শরীরে হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছু নেই, তবু ধুঁকতে-ধুঁকতে সে বেঁচেই রইলো। এদিকে ঠাকরুন মাছের গন্ধ সইতে পারেন না, হরিনাম শুনলেই আহা-আহা ক'রে ওঠেন আর মালা জপেন সারাদিন—সবই গুছিয়ে এনেছেন, এখন শাঁখা-সিঁদুর ঘুচলেই হয়। একদিন আমার দিদিমার কাছে এসে দুঃখ ক'রে বললেন, "দিদি, আমার কপালে বুঝি আর হবিষ্যান্ন নেই!"'

'আহা বেচারা!' অরিন্দম বললেন। 'তা শেষ পর্যন্ত ঠাকরুনের শখ মিটলো তো?'

'আর বলো কেন দুঃখের কথা! হঠাৎ নিউমনিয়া হ'য়ে তিনি স্বর্গে গেলেন, আর তার মাসখানেকের মধ্যেই—'

'কর্তাটিও গেলেন স্ত্রীর বিরহব্যথা দূর করতে!' হৈমন্তীর কথাটা শেষ ক'রে অরিন্দম হাসিতে ফেটে পড়লেন একেবারে। 'বেচারা! বেচারা! স্বর্গে গিয়েও একটা মাস বিধবা হ'য়ে থাকতে পারলে না—হুঁকো হাতে খুক খুক ক'রে কাশতে-কাশতে বুড়ো গিয়ে উপস্থিত—থুড়ি, স্বর্গে তো কাশি নেই!' মুরগির ঠ্যাং তখনকার মতো উপেক্ষা ক'রে অরিন্দম চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসতে লাগলেন।

'গ্রামের সবাই বললে যে মুখুজ্জে মশাই ঠাকরুনকে নাজেহাল করবার জন্যেই এতদিন টি*কে ছিলেন—সেই মরাই তো মরলেন, অথচ বেচারাকে একটা দিন হবিষ্যান্ন করবার সুযোগ দিলেন না।'

'তা যা-ই বলো, এ কিন্তু কোনো পুরুষের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। পাছে ঐ-বস্তুটি হারায় এ-ভয়ে আমরা সকলেই সর্বদা তটস্থ। এই ধরো না—তোমার আজ ফিরতে এত দেরি হওয়াতে আমিই কি কম ব্যস্ত হয়েছিলুম! গাড়ির কোনো অ্যাকসিডেন্ট হ'লো কিনা এ-ভাবনাই খুব বেশি হচ্ছিলো—যে বিশ্রী রাস্তা যাদবপুরের।'

'তা একটা-কিছু হ'লে মন্দ হয় কী—তুমি দিব্যি আবার বিয়ে ক'রে সুখে ঘর করতে পারো।'

অরিন্দমের মুখের মধ্যে আস্ত একটা মুরগির ঠ্যাং ছিলো ব'লে কথাটার তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারলেন না। ঠ্যাংটার গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে হাড়টা পরে ধীরে-সুস্থে চিবোবার জন্য পাতের এক কোণে রেখে বললেন, 'যা বলেছো। স্ত্রী বর্তমানে বিপত্নীক হ'য়ে থেকে লাভ নেই। এবার তোমাকে নাগপুরে নিয়ে যাবোই।'

'না যাই যদি?' ক্ষীণ একটি হাসিতে হৈমন্তীর ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেলো।

'না যাও যদি, তাহ'লে আর-একটা বিয়েই ক'রে ফেলবো—তখন টের পাবে মজা।'

মিনির মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো। কী চমৎকার কথাবার্তা, সে ভাবলে, নিজের মেয়েদের, নিজের পুত্রবধূর সামনে! এ-কথা কিন্তু মিনির একবারও মনে হ'লো না যে বিষয়টির অবতারণা তার মা-ই প্রথমে করেছিলেন, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে। এটা কেমন ক'রে হয় যে মা যা বলেন তা-ই যেন কেমন মানিয়ে যায়, কিন্তু বাবা—! এর পরে তিনি আরো কী ব'লে ফেলেন, সে-ভয়ে মিনি খুব

'তুমি যখন এত সহজেই নিজের সর্ত ত্যাগ করছো', অরিন্দম বললেন, 'তখন আর ভাবনা কী! একটা প্রশ্ন তবু থাকে। মাসে পঁচিশ টাকা মাসোহারায় তোমার চলবে তো?'

হৈমন্তীর চোখ দুটিতে যেন একটা ঠাণ্ডা আগুন ঝিকমিক ক'রে উঠলো। এমন হীনতা, এমন নির্লজ্জ হীনতা পুরুষমানুষেই সম্ভব! উনি টাকা রোজগার করেন এ-জন্যে আমরা সকলেই যেন ওঁর ক্রীতদাস। 'টাকার ভয় দেখাচ্ছো!' হঠাৎ হৈমন্তীর কণ্ঠস্বর যেন সাপের ফোঁসফোঁসানির মতো শোনালো, 'তুমি বুঝি ভাবো তোমার টাকা না হ'লে আমার চলবে না?'

'আমার তো সেইরকমই ধারণা।'

'ভুল ধারণা তোমার। তোমার ছেলেপুলের জন্যেই খরচ। আমার কী—দু'বেলা দু' মুঠো ভাত জুটবেই কোনোরকমে।'

'ভুল বললে, মা', বুলি ব'লে উঠলো, 'একবেলা এক মুঠো ভাত, আর আর-এক বেলা—'

'চুপ কর্!'

বুলি থামলো, কিন্তু মা-র ধমকে বিশেষ বিচলিত হ'লো না; বাপের উপস্থিতিতে আজ সে নিরঙ্কুশ।

'আমার টাকা না-হ'লে তোমার হয়তো চলতে পারে, কিন্তু মা-মহামায়ার চলবে কি?' বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মিনি ভাবলে, বড্ড বাড়াবাড়ি।

হৈমন্তী নিচের ঠোঁট আস্তে কামড়ে ধ'রে একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর পরস্পরে-জড়ানো আঙুলগুলো মুক্ত ক'রে বাঁ হাতের উপর রাখলেন গাল, আর ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন টেবিলের উপর। 'আর-একটু মাংস দিক্ তোমাকে', হঠাৎ, নিতান্ত অবান্তরভাবে তিনি বললেন।

'না, আর না। বরং আর-একটু চাটনি হ'লে ভালো হয়।'

ছবির মতো ভঙ্গিটি পরিহার ক'রে হৈমন্তী নিজেই স্বামীর পাতে আর-একটু চাটনি দিলেন। চামচেটি যথাস্থানে ফিরিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, 'তোমার খুব টাকার দেমাক হয়েছে, দেখছি।'

'দেমাক কিছু না', চাটনি-মাখা আঙুল সশব্দে চেটে অরিন্দম বললেন, 'টাকা ছাড়া কারুরই চলে না—এই আর কি।'

'মায়া-মন্দিরে কত সব বড়ো-বড়ো ধনী অজস্র টাকা দিচ্ছেন তার খবর রাখো? কী-ই বা তোমার টাকা, তা নিয়ে আবার কথা শোনাও!'

'সেতুবন্ধনে সামান্য কাঠবিড়ালি আমি—তাও তোমার প্রক্সিতে। বাস্তবিক, টাকা জিনিসটার মতো সুখকর আর-কিছুই নয়, বিশেষ ক'রে তা যখন হয় পরের টাকা।'

'তিনি তো কিছু চান না—তবু লোকে দেয় কেন?'

'সকলেই দেয় বুঝি?'

'এই তো সেদিন নয়নপুরের রাজা বিশ হাজার টাকা দান করলেন—আলমোড়ায় মায়ের একটা আশ্রম হবে।'

'বাঃ, বেশ, বেশ—আর?'

'তুমি কি ঠাট্টা করছো?'

'না, ঠাট্টা না, শুনে রাখছি। ভাবছি, মা-মহামায়ার এতই যখন দৌলত, তখন আমার টাকায় নিশ্চয়ই তাঁর আর দরকার নেই। সামনের মাস থেকে আড়াই শো ক'রে টাকা পাঠাবো—আমি ভেবে দেখেছি এতেই তোমাদের চলা উচিত।'

'যা খুশি পাঠিয়ো—এক পয়সাও পাঠিয়ো না—এ-সংসার চলুক কি না চলুক আমার তাতে ব'য়েই গেলো! আমি এর মধ্যে নেই।'

একমাত্র এ-ই যা অসুবিধে। এ-অসুবিধে না থাকলে তো ভাবনাই

ছিলো না। 'দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটবেই', এ-কথা জোর ক'রে যখন বলেন, মায়া-মন্দিরের কথাই তাঁর মনে ছিলো। কত ভক্ত সেখানে রোজ প্রসাদ পাচ্ছে; তিনি যদি শুধু মুখের কথাটি খসান, মা তাঁকে তক্ষুনি, তক্ষুনি আশ্রমে ভর্তি ক'রে নেন। কিন্তু স্বামীর স্বচ্ছন্দ আয় থেকে বঞ্চিত হ'লে মা-র কাছে তাঁর এ-প্রতিপত্তি থাকবে কি? ঘরের দেয়ালে ছবি টাঙাতে হ'লে, বাগানে ক্রিসেনথিমমের চারা পুঁততে হ'লে, শ্রীরাধিকার জন্য বেনারসি শাড়ি কিনতে হ'লে আর কি তাঁর ডাক পড়বে? অপরূপ মধুর হেসে মা কি বলবেন—'তুই তো এখনো রসে টুসটুসে?' হৈমন্তী যতই প্রবলভাবে নিজের মনে বলেন, 'থাকবে, থাকবে—ঠিক এখন যেমন আছে, তেমনি থাকবে সব', ততই তাঁর মনের এক গোপন কোণ থেকে লুকোনো সাপের মতো সংশয় ফণা তুলে ধরে। তিনি যদি মায়া-মন্দিরে একটি পয়সাও না দিতে পারেন তাহ'লে তিনি কি সেই অগুনতি স্ত্রীলোকেরই একজন হবেন না, যারা রোজ সন্ধ্যাবেলা কীর্তনের সময় বাইরের বারান্দায় এসে বসে, আর মা যদি কারো দিকে একবার হেসে তাকান কি একটা কথা বলেন তাহ'লে জীবন ধন্য মনে করে? হৈমন্তীর নিজের একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে হাজার পাঁচেক টাকা বহুকাল ধ'রে প'ড়ে আছে—কিন্তু সে-টাকা আর কতটুকু!—আর তাছাড়া তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন সে-অ্যাকাউণ্টটার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে।

এই যা মুশকিল, এই যা মস্ত মুশকিল!

'আহা—রাগ করো কেন—সত্যি-সত্যি তো আমি তোমাকে ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করছি না! আর তা ছাড়া, এই টেকো বুড়োকে বিয়েই বা করছে কে? বরং তোর মা-কেই এখন আবার দিব্যি বিয়ে দেয়া যায়—কী বলিস, মিনি?'

মিনি অনেকক্ষণ ধ'রেই যে-অস্বস্তি ভোগ করছিলো, এবারে তা চরমে

পৌঁছলো। জল খাবার ভাণ ক'রে সে গেলাশের মধ্যে মুখ লুকোলো।

'দিব্যি তাজা টসটসে চেহারা, ইলেকট্রিক আলোয় তোর দিদি মনে হয়, মিনি। শোন্—তোর মা-কে এবার নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে। পারবিনে তোরা থাকতে? কী বলো, উজ্জ্বলা, সংসার চালাতে পারবে তো?'

উজ্জ্বলার নিজের ধারণা যে হৈমন্তী না-থাকলে তারও এ বাড়িতে থাকবার কোনো মানে হয় না, তবু সে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে জানালে যে হ্যাঁ, পারবে।

'বেশ, তাহ'লে তুইও যাবি নাকি, বুলি?'

বুলির খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো; মেঝেয় পরিত্যক্ত মাসিকপত্রখানা বাঁ হাতে কুড়িয়ে নিয়ে কোলের উপর রেখে সে আধখানা-পড়া গল্পের শেষের দিকটা তাড়াতাড়ি দেখে নিচ্ছিলো; বই থেকে চোখ না-তুলেই বললে, 'না, বাবা, আমার কলকাতাতেই ভালো লাগে।'

'বাঃ, তখন যে যেতে চাইলি আমার সঙ্গে?'

'তুমিও যেয়ো না, বাবা, এখানেই থাকো, তাহ'লেই সব চেয়ে ভালো হয়।'

'আর তুমি—তোমার কী মত?' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললেন।

'আমি যাবো না।'

'তোমাকে চুলে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবো—বুঝলে?'

'এই না বললে আবার বিয়ে করবে?'

অরিন্দম হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'আমার দ্বিতীয় বার বিয়ে দেবার চেষ্টা না-ক'রে মেয়ে দুটোর বিয়ের কথা ভাবলে ভালো করবে।'

'তা হবেই একদিন বিয়ে', হৈমন্তী মৃদুভাবে বললেন।

'এ-ভাবে চললে কোনোদিনই হয়তো হবে না।'

'না-হয় না-ই হ'লো।'

'না-ই হ'লো! তার মানে?'

'বিয়ে হওয়াটাই খুব ভালো, আর না-হওয়াটাই খারাপ এ-কথা আমি মানিনে।'

অরিন্দম স্তম্ভিত হ'য়ে বললেন, 'তাই ব'লে ওদের কোনোদিনই বিয়ে হবে না নাকি?'

হঠাৎ মাসিকপত্র থেকে চোখ তুলে বুলি ব'লে উঠলো, 'এ তোমার ভারি অন্যায়, মা! নিজেরা কবে বিয়ে-টিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছো, আর এখন আমাদের বিয়ে দেবার নামও নেই।'

হাসি চাপতে গিয়ে উজ্জ্বলার নাক দিয়ে বেড়ালের হাঁচির মতো ফ্যাঁচ ক'রে একটা শব্দ বেরুলো, ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো মিনির দু'কান, আর হাসির বেগে অরিন্দমের প্রকাণ্ড শরীরে যেন মং চিট্টুনের পেশী-নৃত্য শুরু হ'য়ে গেলো।

'বা, তোমরা হাসছো কেন?' বুলি প্রায়-আহত স্বরে বললে। 'সত্যি কথাই তো বলেছি—না, বাবা? আমাদের তো এখন বিয়ে হওয়াই দরকার—মিনির তো এক্ষুনি।'

রাগ, লজ্জা, আহত রুচিজ্ঞান—এতগুলো উত্তেজনার সঙ্গে সংগ্রাম করতে-করতে মিনি তীব্রস্বরে ব'লে উঠলো, 'বুলি, ফের যদি তুই এ-সব কথা বলবি তাহ'লে তোকে আর আস্ত রাখবো না।'

চেষ্টা ক'রে হাসি থামিয়ে অরিন্দম বললে, 'তা বুলির সঙ্গে আমি কিন্তু একমত—বিশেষত মিনির সম্বন্ধে।'

'মিনির নিজের মত হয়তো তা নাও হ'তে পারে,' বললেন হৈমন্তী।

'তুমি কি বলতে চাও যে মিনি এখন বিয়ে করতে পারলে বেঁচে যায় না?'

'ওকে জিগেস ক'রে গ্যাখো।'

'জিগেস করতে হয় না, দেখলেই বোঝা যায়।'

'বেশ, তাহ'লে তুমি যা হয় ব্যবস্থা করো। সেকেলে লোকদের মতো মেয়ের বিয়ের জন্য পাগল হ'য়ে যাওয়া—আমার ধাতে ও-সব পোষায় না।'

'বাঃ, এ তো চমৎকার কথা বললে। ওরা কি তোমার মেয়ে নয়? তোমার কি কোনো দায়িত্ব নেই?'

'দায়িত্ব আবার কী—ওরা নিজেরা বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে যা ভালো বোঝে করবে। আমরা কিছুই বুঝতুম না—বাপ-মা বিয়ে দিয়েছেন, বিয়ে হ'য়ে গেছে। জানলে কি আর বিয়ে করি!'

এক চামচে পুডিং মুখে দিয়ে অরিন্দম বললেন, 'কী জানলে? কী সেই দিব্যজ্ঞান, যা লাভ করলে তুমি আর এ-অভাগার পাণিগ্রহণ করতে না?'

'সে যা-ই হোক, তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'তাহ'লে তুমি নিজে বিয়ে ক'রে অসুখী হয়েছো, সেইজন্যেই মেয়েদের আর বিয়ে দিতে চাও না?'

বুলি আবার তার মাসিকপত্রের গল্পে ডুব দিয়েছিলো, হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'কে বিয়ে ক'রে অসুখী হয়েছে, বাবা? তারপর কী হ'লো? ট্র্যাজিডি, না পুনর্মিলন?

'সেটা এখনো দেখতে বাকি আছে,' ব'লে অরিন্দম চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। খুবই আশ্চর্য যে আধখানা পুডিং তাঁর পাতে প'ড়ে রইলো।

৫

এ-বাড়ির যে-ঘরটি আদিযুগে অরিন্দমের শোবার ঘর ব'লে পরিচিত. ছিলো, এবং যে-ঘরে বরাবরকার অভ্যেসমতো বাহাদুর প্রভুর বাক্স-বিছানা এনে রেখেছিলো, সে-ঘর কিছুদিন ধ'রে হৈমন্তী তাঁর একলার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন। জিনিসপত্র যেখানে যা ছিলো সবই আছে; পাশাপাশি দুটি খাট লক্ষ্ণৌ ছিটে ঢাকা, কিন্তু সে-ঢাকা কখনোই তোলা হয় না, কারণ হৈমন্তী শোন ঘরের দেয়াল ঘেঁষে সরু একটি লোহার খাটে। পাশের ছোটো ঘরটি তাঁর ঠাকুরঘর, সেখানে বিবিধ দেবতার প্রতিকৃতির সঙ্গে, ও সকলের চেয়ে বড়ো হ'য়ে, মা মহামায়ার মস্ত একটি ফোটোগ্রাফ। দু'বেলা খাবার আগে, এবং অসময়েও সময় পেলে, হৈমন্তী ঐ ছবিটির সামনে ব'সে অনেকক্ষণ ধ্যান করেন—যেদিন খুব খিদে না পায়, সেদিন চাই কি ঘণ্টাখানেকই কাটিয়ে দেন দরজা বন্ধ ক'রে। বোজা চোখের লাল-নীল, সবুজের সঙ্গে তাঁর কল্পনা মিশে অসংখ্য অদ্ভুত মূর্তি রচনা করে, তার ঠিক কোন্‌টি যে ভগবানের ছবি তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। কখনো (এটা হয় খুব জোরে চোখের পাতা চাপলে) শর্ষে ফুলের মতো হলদে ফুটকি ছাড়া আর-কিছুই দেখা যায় না, আর সেই সঙ্গে কিছু-দিন আগে তাঁর পিঠেও ঘামের শর্ষে ফুল ফুটতো—কারণ ঘরটি মূলত ছিলো কাপড় ছাড়বার ঘর, পাখারও তাই ব্যবস্থা ছিলো না। ঘাম ধর্মসাধনার মস্ত শত্রু, এটা হৈমন্তী যেদিন আবিষ্কার করলেন, সেদিনই তিনি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকিয়ে একটা টেব্‌ল্‌-ফ্যান চালাবার ব্যবস্থা

ক'রে নিলেন, এখন কালাপাহাড়ি ঘাম পরাজিত। এই ঠাকুর-ঘরটি অরিন্দম আবিষ্কার করলে যে-একটি বচসার সৃষ্টি হবে, তা ভাবতেও হৈমন্তী শিহরিত হ'লেন—এটা তাঁর চোখে একেবারেই যদি না পড়ে, বাঁচা যায়।

খাওয়ার পরে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসলেন অরিন্দম, সঙ্গে-সঙ্গে বাহাদুর একটি হুইস্কির পেগ যথোচিত সোডার সঙ্গে মিশিয়ে তাঁকে দিয়ে গেলো। গেলাশটি হাতে নিয়ে অরিন্দম রাখলেন চেয়ারের হাতলে, তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেন সত্যি কি হৈমন্তীর একটু মাথা-খারাপ হ'য়ে গেলো? আট মাস আগে তিনি শেষ যেবার বাড়ি এসেছিলেন, তখনো তো মন্তী বেশ স্বাভাবিক মানুষই ছিলো, এরই মধ্যে তার ধর্মের জ্বর প্রায় ডিলিরিয়মে পৌঁছলো কেমন ক'রে? আমি দূরে থাকাতেই এটা সম্ভব হয়েছে, এবার ওকে নিয়ে যাবো যেমন ক'রেই পারি।...অরিন্দম হুইস্কির গেলাশে চুমুক দিলেন।

এদিকে হৈমন্তী তাঁর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। লক্ষ্ণৌ ছিট উড়ে গেছে; জোড়া খাটে ধবধবে শাদা বিলিতি চাদরে দু'জনের বিছানা পাতা। দুটো ক'রে বালিশ আরামের আমন্ত্রণে ফুলে রয়েছে, সূক্ষ্ম নেটের মত মশারিটির উপর পাখার চারটে ব্লেডের প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে।

নিশ্চয়ই বাহাদুরের কাণ্ড! হতভাগা আকাট মূর্খ! ঘর থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি আস্তে ডাকলেন, 'নিবারণ!' গলায় কাঠের মালা পরা হৈমন্তীর নব-নিযুক্ত চাকর উঠে এলো। লোকটা খাশ বৈষ্ণব, নবদ্বীপে বাড়ি, হৈমন্তী একে বারো টাকা মাইনে দেন। ছ'টাকা দিলেই চলতো; কিন্তু বাহাদুরের মাইনে সতেরো টাকা, জোয়াত আলি স্রেফ ব'সে-ব'সে মাসে পঁচিশটা ক'রে টাকা নেয়—তার মতো শিক-কাবাব কেউ নাকি আর পাকাতে

পারে না। এ-অবস্থায় নিবারণের মাইনে অন্তত বারোটা টাকা না হ'লে হৈমন্তীর মান থাকে কেমন ক'রে। সে তাঁকে ডাল ভাত কুমড়োর ছেঁচকি রেঁধে দেয় (মাছ ছোঁয় না, তার জন্যে জোয়াত আলির সহকারী ভুবনের শরণাপন্ন হ'তেই হয়—আর সত্যি-সত্যি জোয়াত আলি রাঁধলেই বা কী, ভগবানের চোখে তো আর হিন্দু মুসলমান নেই—ও-সব ছোঁয়াছুঁয়ি হিঁদুয়ানি নিয়ে যারা দিন কাটায়, তাদের মতো সেকেলে, অনগ্রসর, মূঢ় নাকি হৈমন্তী! মা-মহামায়া এ-সব বিষয়ে রীতিমতো মডর্ন যে!) আর দিনের মধ্যে তিন-চারবার আশ্রমে যাতায়াত করে। (মা-কে বলতে হবে একটা টেলিফোন আনিয়ে নিতে, এক-এক সময় বড়ো অসুবিধে হয়।)

নিবারণ এসে দাঁড়াতেই হৈমন্তী বললেন, 'আমার খাট ঠাকুর ঘরে নিয়ে দাও।' ঘরটা ছোটো, গরম হবে—তা হোক্, ও-ঘরেই শোবেন তিনি।

দশ মিনিটের মধ্যে ঠাকুর ঘরে লোহার খাটে হৈমন্তীর বিছানা প্রস্তুত হ'লো, জোড়া খাটের একটি আবার ঢাকা পড়লো লক্ষ্ণৌ ছিটে, অন্যটিতে অরিন্দমের ক্লান্ত শরীরের অভ্যর্থনা। এর পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে হৈমন্তী ঠাকুরঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

নিচে নামবার সময় নিবারণ দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলো, অরিন্দমের হঠাৎ মনে হ'লো এ-ব্যক্তিকে ইতিপূর্বে তিনি দ্যাখেন নি। আঙুল ইশারা ক'রে ডাকলেন তাকে। গৃহস্বামী সম্বন্ধে একটা অহৈতুক ভয় নিবারণ প্রথম থেকেই পোষণ করছিলো, তার উপর তাঁকে লাল জল পান করতে দেখে তার ঘাস-পাতা-খাওয়া বৈষ্ণব আত্মার ধুকধুকানি শুরু হ'য়ে গেছে। ইশারাটা যেন দ্যাখেনি, এইরকম ভাণ ক'রে সে সিঁড়ির দিকে প্রায় দৌড় দিলে।

অরিন্দম গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'এই, শোনো।'

লোকটা কাঁপতে-কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেলো।

'তোমাকে ডাকছি যে শুনতে পাও না?'

'আজ্ঞে।'

'কী নাম তোমার?'

'নিবারণ।'

'কবে থেকে আছো?'

'এই—চার মাস।'

'কী কাজ করো?'

'মা-র কাজ করি।'

মা শব্দটি এ-বাড়িতে দ্ব্যর্থবোধক ব'লে অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করতে হ'লো, 'কোন্ মা?'

নিবারণ কী বুঝলে সে-ই জানে, সোৎসাহে মাথা নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আশ্রমে যখনই যেতে হয়, এই নিবারণ। তাঁকে চোখে দেখলেও পুণ্যি।'

'কত মাইনে পাও?'

'বারো টাকা।'

'কাল থেকে তোমার চাকরি গেলো।'

'আজ্ঞে?' নিবারণের নিচের ঠোঁটটা হঠাৎ ঝুলে পড়লো।

'যে-ক'দিনের মাইনে পাওনা আছে, কাল সকালে আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়ো। বুঝলে?'

'আ—আজ্ঞে।'

'যাও এখন।'

নিবারণ আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো—ব্যাপারটা তার মগজে ঠিক ঢুকলো কিনা তা-ই বোঝা গেলো না।

আস্তে-আস্তে, অনেকগুলো সিগারেট সহযোগে অরিন্দম তাঁর

পেগটি পান করলেন। রাত বেড়েছে, অরিন্দম হাত-ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন, বারোটা প্রায় বাজে। ঘুম পেয়ে গেছে। উঠে, আলো নিবিয়ে তিনি বারান্দা পার হ'য়ে ড্রেসিং রুম দিয়ে বাথরুমে ঢুকতে গেলেন, কিন্তু ড্রেসিং রুমের দরজা খুললো না। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঢুকলেন নাবার ঘরে। হৈমন্তী কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—না-খেয়েই ঘুমুলো না তো? গ্রীষ্মকালে রাত্রে ঘুমোবার আগে তাঁর একবার স্নান করাই চাই—যদিও ডাক্তাররা প্রায়ই তাঁকে বারণ করেছেন—হুইস্কির পরে চট্‌ ক'রে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ডাক্তারদের কথায় স্নানের ঘরে একটা গরম জলের কল তিনি বসিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা ব্যবহার করেন কদাচ, ঠাণ্ডা জলের মতো আরাম নাকি আর কিছুতে—ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে বোধ হয় লক্ষ বারের বার তিনি ভাবলেন।

জলের ঝরঝর শব্দ আর সেই সঙ্গে স্বামীর বেসুরো গলার গান (তিরিশ বছর আগেকার খুব চলতি রেকর্ড থেকে তোলা) কার্পেটের আসনে উপবিষ্ট, আধো-নিমীলিত-চোখ হৈমন্তীর কানে পৌঁছলো। আশ্রম থেকে ফিরে এসে যে-মুহূর্তে স্বামীর সঙ্গে দেখা, সে-মুহূর্ত থেকে একটা অস্বস্তি তাঁর শরীরে মনে আঁকড়ে রয়েছে; অনেকদিনের যত্নে এই বাড়ির মধ্যে যে একটা মনের মতো পরিবেশ তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, যেখানে মলিনতা নেই, কোলাহল নেই, কথা-কাটাকাটি কি মন-কষাকষি নেই, যেখানে সবাই টিপিটিপি হাঁটে, চুপচাপ থাকে (এক বুলি ছাড়া—তা বুলির সঙ্গে তাঁর কতটুকুই বা দেখা!)—এই নিটোল, দুর্লভ আবহাওয়াটি যেন একটা অনিপুণ জানোয়ারের চ্যাঁচামেচি চলাফেরায় চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো। এমনকি এই নিভৃত ও পবিত্র ঠাকুরঘরটিতেও আজ আর শান্তি নেই—জলের ঝরঝর শব্দের সঙ্গে বেসুরো গলার নির্লজ্জ চীৎকার এসে হানা দিচ্ছে। কী অদ্ভুত

মানুষ, বাস্তবিক; পরিপাটি হওয়া, মসৃণ, মার্জিত ও নিঃশব্দ হওয়া যে কাকে বলে জীবনে জানলেনই না! যেখানে তিনি আছেন সেখানেই হৈ-হৈ দাপাদাপি ব্যাপার, খাবেন গোগ্রাসে হাম্‌-হাম্‌ ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, শোবেন বালিশগুলোকে নির্মমভাবে দলিত ক'রে, স্নান করবেন সমস্ত বাথরুম ভিজিয়ে, তাঁর যে-কোনো কাজেরই ভাবটা যেন আসুরিক। স্বামীর আহারের দৃশ্য স্মরণ ক'রে কেমন একটা ঘৃণায় হৈমন্তীর ভিতরটা মুচড়িয়ে উঠলো। কী সশব্দ, কী অজস্র, কী প্রচণ্ড উৎসাহিত ভোজন! ঘাড় কাৎ ক'রে আধো চোখ বুজে যখন কুড়মুড় শব্দে মাংসের হাড় গুঁড়ো করেন তখন সত্যি মনে হয় কোনো মাংসাশী জন্তু ভুল ক'রে টেবিলে এসে বসেছে। ভোজনে, স্নানে, বেশ-বিন্যাসে, জীবনের ছোটো-বড়ো সব রকম সম্ভোগে যে তাঁর আগ্রহ কি ক্ষমতা কোনোটাই পঞ্চাশ পেরিয়েও একটুও ঢিলে হয়নি এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে হৈমন্তীর—আর সব চেয়ে অশ্লীলও ঠেকে। স্বামীর স্নানের ছলছলানি শব্দ, আর মাঝে-মাঝে উৎকট গান তাঁর স্নায়ুকে এমনভাবে পীড়ন করতে লাগলো যে কিছুতেই ধ্যানে নিবিষ্ট হ'তে পারলেন না, কখন সে-শব্দ থামবে সেই অপেক্ষায় উৎকর্ণ হ'য়ে সমস্ত মন দিয়ে শব্দগুলোই শুনতে লাগলেন, যেমন হয় ইনসম্‌নিয়া রোগীর, যখন সে তার অনিদ্রার জন্য রাস্তার বিশেষ-কোনো শব্দকে মনে-মনে দায়ী করে, আর সেটা থামবার অপেক্ষায় সে-শব্দই শুধু শোনে, আরো বেশি ঘুমোতে পারে না।

জলের ছলছলানি থামলো। লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম রগ্‌ড়ে-রগ্‌ড়ে গা মুছছেন এই ছবিটি হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো হৈমন্তীর চোখের সামনে। অসভ্য লোকের শরীর সম্বন্ধে লজ্জা থাকে না, স্বামীও অনেকটা ঐ রকম। কিন্তু ঠিক ঐ রকম নয়, কেননা অসভ্য লোক শরীর সম্বন্ধে সচেতনই নয়,

আর অরিন্দম সর্বদাই নিজের শরীরের প্রেমে প'ড়ে আছেন। আমরা সব স্নান ক'রে কোনোরকমে মাথা মুছে বেরিয়ে আসি, ঘাড় বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে, আর তাঁর গা মোছাই একটি ছোটোখাটো অনুষ্ঠান। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন মূর্তি দেখতে তাঁর লজ্জা তো নেই-ই, বরং সেটা তাঁর পক্ষে সুখের শুধু নয়, গর্বেরও ব্যাপার।

খুট ক'রে একটু শব্দ হ'লো, বাথরুম থেকে অরিন্দম বেরোলেন।

শোবার ঘরের আলো জ্বেলে তিনি ড্রেসিংরুমের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলেন শোবার ঘরেরই এক কোণে আয়নার টেবিলের উপর তাঁর প্রসাধনের বিবিধ উপকরণ সাজানো। বিছানাটা এমন ক'রে পেতেছে কে—যেন একজন শোবে ওখানে! নিশ্চয়ই ঐ বোষ্টম ব্যাটার কাণ্ড! কাল সকালে উঠে প্রথম কাজই ওকে তাড়ানো।

মসৃণ চুলে চিরুনি চালিয়ে, গায়ের জামাটায় একটু গন্ধ মেখে অরিন্দম ভাবলেন একেবারে শুয়েই পড়েন, কিন্তু তার আগে হৈমন্তীর একবার খোঁজ নেয়া দরকার। কোথায় সে? খেয়েছে তো? এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে তিনি ডাকলেন, 'মন্তী—মন্তী।'

কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

অরিন্দম বেরিয়ে এলেন বাইরের বারান্দায়। অন্ধকার। মিনি বুলি অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু উজ্জ্বলার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে শিশুর ক্ষীণ গোঙানি। ছেলেটা কাঁদতেও পা[illegible]! কী অসুখ ওর? অরুণ কি চুপি-চুপি ফিরে এসেছে—না কি ওর প্রবৃত্তি যা চায়, সেই জাহান্নামেই রাত কাটাচ্ছে? হৈমন্তীর অবহেলায় এ-বাড়িতে অনেক জঞ্জাল, অনেক অন্যায় জ'মে উঠেছে, এবার তিনি ঝেঁটিয়ে সব সাফ করবেন।

আপাতত বেশ গাঢ় একটি ঘুম।

বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসতে তাঁর চোখে পড়লো কাপড় ছাড়বার ঘরটিতে মৃদু নীল আলো জ্বলছে। ও, হৈমন্তী তাহ'লে ঐখানে! সেইজন্যেই দরজা বন্ধ। কী করছে ঐ ছোট্ট খুপরিতে একলা? পুজো-টুজো করার ভড়ং ধরেনি তো?

শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে তিনি সোজা ঐ ছোটো ঘরটিতে ঢুকতে গেলেন, কিন্তু ওদিকেও দরজা বন্ধ দেখে হঠাৎ একটু ধাক্কা খেলেন মনে। দরজায় কয়েকবার টোকা দিয়ে ডাকলেন, 'মন্তী, শোনো।'

মিনিট দুয়েক পরে দরজা খুলে হৈমন্তী—বেরিয়ে এলেন না, দরজা জুড়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। মা-মহামায়ার লাবণ্য-মাখা তাঁর এই ঘরটির দরজায় সিল্কের স্লিপিং স্যুট পরা সুগন্ধি অরিন্দমকে দেখে তাঁর এমন বেখাপ্পা লাগলো যে হঠাৎ বলতে ইচ্ছে হ'লো, 'কী চাও এখানে?' সে-ঝোঁক সামলে নিয়ে বললেন, 'স্নান হ'লো?'

'হ্যাঁ, হ'লো। তুমি খেয়েছো?'

'আমার খাওয়া নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি শোও।

'তুমি শোবে না?'

'আমার শুতে দেরি আছে।'

'কত দেরি?'

হৈমন্তী আন্দাজে ব'লে ফেললেন, 'ঘণ্টাখানেক।'

'অতক্ষণ তুমি কী করবে?'

'আমি যা-ই করি না, তোমার তাতে কী?'

হৈমন্তীর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে অরিন্দম ছোটো ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'বাঃ, অনেকদূর এগিয়েছো তো। জপ-তপও করা হয়! তা যা-ই বলো, এ-সব ক'রে-ক'রে চেহারাটি শানিয়েছো বেশ! চলো শুতে, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আর দেরি ক'রে লাভ নেই, হৈমন্তী ভাবলেন, বোঝাপড়াটা হ'য়ে

যাওয়া ভালো। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, 'তোমার বিছানা তো পাতাই রয়েছে, শোও না গিয়ে। আমি এই—' মুখে এসেছিলো 'ঠাকুরঘরে', কথাটা বদলে নিয়ে বললেন, 'এই ছোটো ঘরটাতেই শোবো।'

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে মুহূর্তে অরিন্দমের চোখ থেকে ঘুমের নেশা ছুটে গেলো।

'তার মানে?'

'মানে আর কী? এ-ঘরেই আমি শুই আজকাল।'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম স্পষ্ট বুঝলেন যে সে মিথ্যে বলছে। হৈমন্তীর জন্য দুঃখ হ'লো তাঁর, দয়া হ'লো। যে-সম্মোহনের চোরাবালিতে ডুবছে সে, তা থেকে এখনো যদি আমি তাকে উদ্ধার না করি, তাহ'লে সে একেবারেই তলিয়ে যাবে, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতক্ষণ যা ছিলো তাঁর পক্ষে হাসিঠাট্টা আমোদের বিষয়, হঠাৎ তা একটা হিংস্র মেঘের মতো তাঁর মনের আকাশে আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

'বুঝলুম। আজ থেকে এ-ঘরেই শোবে, এই তো?'

হৈমন্তী চকিত একটু হেসে ঈষৎ লীলায়িত ভঙ্গিতে বললেন, 'যদি তুমি রাগ না করো।' তারপর, স্বামীকে নীরব দেখে দরজা থেকে একটু স'রে গিয়ে: 'এসো না ভিতরে।—জুতোটা বাইরেই থাক্।'

আর সত্যি অরিন্দম বাইরে জুতো ছেড়ে এমন একটা বিনীত, এমনকি ঈষৎ লজ্জিত ভঙ্গিতে সেই ঘরটিতে ঢুকলেন যেন হৈমন্তীর এই অনুগ্রহে তিনি বিশেষ বাধিত। ছোটো ঘরটি যেন অরিন্দমের উপস্থিতিতে ভ'রে গেলো, আর প্রথমটায় অরিন্দমেরও যেন দম আটকে এলো, কারণ ধূপের, চন্দনের আর মা-মহামায়ার ছবির ফ্রেমে ঝোলানো একটি মস্ত টাটকা মালার নানারকম ফুলের গন্ধ মিলে ঘরের হাওয়াকে

শুধু ভারি নয়, রীতিমতো আবিল ক'রে তুলেছে—হৈমন্তী যে কী ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে ওখানে এতক্ষণ কাটালো, তা-ই ভেবে অবাক লাগলো অরিন্দমের। মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় একদিকে যেমন সব চেয়ে সূক্ষ্ম, তেমনি ক্লান্তও হয় সব চেয়ে সহজে, তাকে বেশি খাওয়াতে গেলে ফল হয় উল্টো, মাথা ধরে, স্নায়ু বিদ্রোহ করে। ঘরে পা দিতেই অরিন্দমের মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো, ব'লে উঠলেন, 'এ করেছো কী! একেবারে গন্ধের বোমা!'

হৈমন্তী পাখাটা পুরোপুরি চালিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।' শাসক যেমন শাসিতকে মাঝে-মাঝে অল্প-স্বল্প সুবিধে দেয়, যাতে সে বেশি দাবি না করে, তেমনি হৈমন্তীরও চেষ্টা খুচরো-খুচরো খুশির ভেটে স্বামীর মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে নিজের অবাধ খেয়ালই খাটাবেন।

ইলেকট্রিক পাখার তাড়নায় গন্ধের ঘন কুয়াশা কিছু কাটলো। কম্বলে—টুকটুকে লাল, নরম বিলেতি কম্বলে—ঢাকা লোহার সংকীর্ণ খাটটিতে তিনি বসলেন, প্রথমে পা ঝুলিয়ে, একটু পরেই উপরে পা তুলে, তারপর কম্বলের তলা থেকে হৈমন্তীর বালিশ দুটো বা'র ক'রে দুমড়িয়ে প্রায় গোল ক'রে নিয়ে কনুইয়ের নিচে দিয়ে বেশ আরাম ক'রেই বসলেন।

বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'সে কী! তোমার ঘুম পায়নি?'

'ঘুম ছুটে গেছে। আর তুমিও যখন জেগে আছো তখন কথাটা শেষ ক'রেই ফেলি।'

'খুব দরকারি কথা?' হালকা স্বরে বললেন হৈমন্তী।

'হ্যাঁ, দরকারি।' অরিন্দম গম্ভীর।

একটি লোহার জালিতে ঢেকে নিবারণ রোজ রাত্রে হৈমন্তীর খাবার ঠাকুর-ঘরে রেখে যায়। হৈমন্তী খাটের তলা থেকে একটি শাদা পাথরের

মস্ত থালা বার করলেন, কার্পেটের আসন পেতে বসলেন তার সামনে। স্বামীর সামনে ব'সে খেতে তাঁর একান্ত অনিচ্ছা ছিলো, কিন্তু মানুষটাকে এক্ষুনি ডেকে এনে এক্ষুনি আবার তাড়ানো যায় না, তাছাড়া মায়া-মন্দিরে যদিও সন্ধেবেলায় একবার 'ভোগ' হয়েছিলো, ক্ষীরের মালাপো আর ছানার অমৃতি কোনোটাই ফেলবার মতো ছিলো না, তবু এতক্ষণে আবার খিদে পেয়ে গেছে বইকি। এমনি ছোটোলোক আমাদের শরীর! খাওয়াও, পরাও, আদর-যত্ন করো, আর সেই শরীরই কিনা নানা প্রবৃত্তির জাল ছড়িয়ে আমাদের আত্মাকে বাঁধে, পিষে মারতে চায়! শরীরটা পশু, যখন যা চাই, তা চাই-ই, খিদে পেলে খাবার দিতেই হবে, তেমন খিদে পেলে অত্যন্ত মহৎ, অত্যন্ত গভীর চিন্তাগুলিকে ফেলে' মন যে শুধু খাদ্যেরই ধ্যান করে, এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে হৈমন্তী গোপনে মর্মাহত। ধর্মসাধনাও নাকি ভরাপেটে সব চেয়ে ভালো জমে! ছি ছি! তাঁহ'লে আর সাধারণ সাংসারিক কর্মের সঙ্গে এর প্রভেদ কী? অনশনে, জলে, আগুনে শরীরকে যাঁরা নির্মম প্রহার করেছেন, শুঁটকি মাছের মতো শুকনো শরীর নিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করেছেন—সে-সব কি তাহ'লে গল্প? তাঁরও ইচ্ছে করতো শরীরকে ন্যূনতম যেটুকু না দিলেই হয়, যেটুকু না হ'লে প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুই শুধু দেবেন, তার বেশি এক তিলও নয়, কিন্তু এ কী কাণ্ড যে গরমের ক্ষমতা মা-মহামায়ার করুণার চেয়ে বেশি, মা-কে মনে আনবার জন্য কিনা পাখা খাটাতে হ'লো!

মনের এ-সংশয় হৈমন্তী একদিন উদ্‌ঘাটন করেছিলেন মা-মহামায়ার কাছে। তিনি তাঁকে মীরার বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—জলে ভিজলেই যদি মোক্ষলাভ হ'তো তাহ'লে তো মাছ—ইত্যাদি। তারপর অপরূপ হেসে বলেছিলেন, 'ছাখ, এটা খাবো না, ওটা পরবো না, সেটা ছোঁবো না, দিন-রাত্তির যারা এ-সবই ভাবে, চির-প্রেমময়কে তারা

স্মরণ করবে কখন? অন্তরের মধ্যে সেই প্রেম অনুভব কর্, অন্য-কিছু ভাবিসনে।' আরো বলেছিলেন, 'যৌবন, সৌন্দর্য, মানুষের শরীরের সুষমা—এ-সবও তাঁরই লীলা। ঈশ্বরকে পেতে হ'লেই কুৎসিত হ'তে হবে এ-কথা ভাবে শুধু অশিক্ষিত গ্রাম্য বিধবা, ন্যাড়া মাথা আর এক-ফেরতা থানকাপড়ে যাকে আর মানুষ ব'লেই চেনা যায় না। ঈশ্বর সত্যিই যার বাঞ্ছিত, তার রূপ তো আগুনের মতো জ্বলবে—তবে কেন এই দীন কুশ্রীতা? শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীদের কথা ভাব্।'

বোধ্ হয় গোপিনীদের কথা ভালো ক'রে ভাববার জন্যই এখানে মহামায়া চোখ বুজেছিলেন।

এ-সব কথা শুনে হৈমন্তী ভারি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি যে দেখতে ভালো, এই বয়েসেও যে তাঁকে সুন্দরী বলা চলে, এটা মনে হয়েছিলো লীলাময়েরই অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাঁর প্রতি বিশেষ করুণা-মাখানো লীলা। এই নশ্বর শরীরের তুচ্ছ সুশ্রীতা এমন গভীরভাবে সার্থক মনে হয়নি আর কখনো। মনে আছে বাড়ি ফিরে এই নশ্বর বস্তুটাকে আয়নায় তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণও করেছিলেন—অতি সহজেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁর জৈব আকৃতিটা নিপীড়নের কি অবহেলার যোগ্য নয়। এমনকি, শরীরটাকেও হয়ত তার স্বাভাবিক পশুত্ব থেকে টেনে তোলা যায়, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই যায়, চোখের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছেন মা-মহামায়া। এত রূপ, আর তার সঙ্গে এমন অপরূপ শুচিতা! হৈমন্তী তাঁর শরীরে একটি কুমারী-শুচিতা অনুভব করেন, ভাবতে চেষ্টা করেন তাঁর কখনো বিয়ে হয়নি, ছেলে-পুলে হয়নি, তিনি যেন সেই যমুনাতীরের চির-অভিসারিকাদেরই একজন। পুরোনো শাড়িগুলো আর পছন্দ হয় না, নানা দোকান ঘুরে ফিকে রঙের শাদাশিধে পাড়ের নানারকম শাড়ি জোগাড় করেন, সেগুলোতে বাহার নেই, কিন্তু মর্যাদা আছে, পরলে হৈমন্তীকে বিশিষ্ট

কেউ একজন মনে হয়, এবং ঐ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে গিয়ে প্রতিটি শাড়ি বেশ চড়া দামেই কিনতে হয়। এদিকে মা-র দেখাদেখি মিনিও শাদাশিধে কাপড় ধরেছে, তাই তার পরনে শস্তা দামের মিলের শাড়ি ছাড়া আর-কিছু দেখাই যায় না আজকাল।

মা-মহামায়ার প্রভাবে হৈমন্তীর মন শরীরকে মেনে নিয়েছে, এমনকি বরণ ক'রে নিয়েছে, কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে ধর্মসাধনার অসঙ্গতি এখনো তাঁকে নিরন্তর পীড়া দেয়। বার-বার খেতে হয় ব'লে নিজেকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। মানুষের মুখে যে ঠোঁট দুটি প্রকৃতি এঁকে দিয়েছে তা যে কেবল শোভা নয়, তা যে অত্যন্ত দরকারি একটি দরজার কপাট, আর সে-দরজার ভিতর দিয়ে শস্য, গাছপালা ও জীবজন্তু দাঁতের জাঁতায় পিষ্ট হ'য়ে কণ্ঠনালী দিয়ে পেটে চ'লে যায়, এই নিত্যনৈমিত্তিক, সার্বিক ও অতি সাধারণ ঘটনা হৈমন্তীর ঠিক বরদাস্ত হয় না। ব্যাপারটায় যেন শালীনতার বড়োই অভাব। খাদ্যের যে-অংশ শরীর রাখতে চায় না তার নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়া যেমন সভ্যসমাজে গোপন, তেমনি খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়াও গোপন হওয়া উচিত ছিলো। কোনো নিমন্ত্রণে তো তিনি যানই না, এমনকি পুত্রবধূর কি মেয়েদের সামনেও পারতপক্ষে খান না তিনি—দিনের বেলায় ওদের খাওয়া হ'য়ে গেলে সকলকে উপরে পাঠিয়ে তবে বসেন খেতে, আর রাত্রে যখন খান তখন তো ওরা সবাই ঘুমিয়ে, তাছাড়া ঠাকুরঘরে কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্বামী যে-ক'দিন আছেন এ-সব নিয়ম হয়তো থাকবে না, ভাবতে হৈমন্তী একটু বিষণ্ণ বোধ করলেন। মায়া-মন্দিরেও উৎসবের দিনে কখনো পংক্তিভোজনে বসেন না তিনি, তাঁকে আলাদা ঘরে একলা খেতে দেয়া হয়—কখনো-কখনো অবশ্যি মা স্বয়ং হঠাৎ সে-ঘরে ঢুকে প'ড়ে বলেন, 'খা, খা, তোকে খেতে দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে'—আহা, কী মধুর সে-স্বর! শুনলে মনে হয়—যা আমি কখনো

মনে হয় না—যে এই খাওয়াতেও যেন সেই প্রেমেরই স্পর্শ লাগলো, যমুনাজল যাতে উত্তল—অথচ তাঁর নিজের বাড়িতেই কিনা তাঁর ইচ্ছা হবে খর্ব, রুচি হবে আহত! আমরা যে যার মতে জীবনটাকে গুছিয়ে নিই, কেন বাইরে থেকে আসে বাধা, দেখা দেয় এমন উৎপাত যা সহ্যও করা যায় না, অস্বীকারও করা যায় না?

লাল আর সবুজ রঙের বড়ো-বড়ো ফুল-তোলা একখানা কার্পেটের আসন পেতে হৈমন্তী বসলেন মেঝেতে, বললেন, 'কী কথা, বলো!'

ব'লে, উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে খাটের তলা থেকে টেনে বের করলেন শাদা পাথরের একটি থালা। তাতে রয়েছে কয়েকখানা ত্রিকোণ, গাঢ়-রক্তিম, ঢাকাই পরোটা, দু' রকমের সন্দেশ, গোটা দুই পান্তুয়া, মস্ত একটা ফজলি আম, মোটাসোটা সুশ্রী হলদে দুটি শবরি কলা, আর একটু পাতক্ষীর। আর পাথরের গেলাশ ভরা দুধ।

আহার্যগুলোর দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রেই হৈমন্তী ব'লে উঠলেন, 'সর্বনাশ! কত দিয়েছে! ঐ নিবারণ ব্যাটার আর বুদ্ধি হবে না।'

অরিন্দম থালাটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এত মিষ্টি খেতে কবে থেকে শিখলে, মন্তী? আগে তো মিষ্টি মুখেও তুলতে না।'

হৈমন্তী সংক্ষেপে বললেন, 'রাত্তিরে ভাত না-খেয়ে বেশ ভালো আছি।'

অরিন্দম একটু হেসে বললেন, 'বৈধব্যের মহড়াটা বেশ ভালোই দিচ্ছো, বলতে হবে। তবে আমি বলি কী, এর কিছু দরকার নেই। তোমার সুবিধের কথা না-ভেবে আমি যদি ম'রেই যাই, তুমি সব রকমই খেয়ো, ওতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি নিরামিষ ব'লে কিছু নেই, গোরুর দুধটাও একটা জৈব পদার্থ।

আবার উল্টোটাও প্রমাণ করা যায়, অর্থাৎ সব খাদ্যই নিরামিষ, কারণ যে-সব প্রাণী আমরা খাই তারা সকলেই শেষ পর্যন্ত ঘাসপাতা খেয়েই বাঁচে, অর্থাৎ উদ্ভিদেই তাদের দেহ গঠিত। আমিষ আর নিরামিষের ভেদ, এও একটা মায়া।'

হৈমন্তী একটু পরোটা ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, 'আর কোন্-কোন্ জিনিস মায়া লিষ্টি ক'রে দাও, মুখস্থ ক'রে রাখি!'

'যা-ই বলো, মাছের ঝোল ভাত খেলে যে-রকম নিটোল পেট ভরে, হাজার ফল-মিষ্টিতেও কি আর তা হয়! এত মিষ্টি খেয়ো না, দাঁত খারাপ হবে।'

'এখনো তার কোনো প্রমাণ পাইনি।'

অরিন্দম স্ত্রীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, 'তবে যদি বলো ও-সব খেয়েই তুমি অমন ছিপছিপে সুন্দর চেহারাটি রেখেছো তাহ'লে না-হয় আমিও কিছুদিন চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। আর কি আমার রোগা হবার আশা আছে—কী বলো তুমি? মাংস ছেড়ে দিয়ে কি দুধ ধরবো? তোমার মনে নেই, মন্তী, দিল্লির ডাক্তার দুনিরাম একবার বলেছিলেন যে তরুণ চেহারা রাখতে হ'লে দুধের মতো কিছু নয়।'

হৈমন্তী একটা পান্তুয়া ভেঙে বললেন, 'কী না কাজের কথা বলবে?'

'কাজের কথা একটা নয়, অনেকগুলো।' আধ শোয়া অবস্থা থেকে উঠে অরিন্দম খাটের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলেন, প্রথমে একটা পরে দুটো বালিশ টেনে নিলেন কোলের উপর। কোমরের উপর থেকে শরীরটাকে বারকয়েক দুলিয়ে যেন বসবার সব চেয়ে আরামের ভঙ্গিটি ঠিক ক'রে নিলেন। নিজের শয্যার নির্দয়-দলিত চেহারা দেখতে-দেখতে হৈমন্তীর গায়ে যেন কাঁটা ফুটতে লাগলো।

'সত্যি ক'রে বলো, মন্তী, সংসারে তোমার মন নেই কেন?'

নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়লো, হৈমন্তীর হাতের আধখানা পান্তুয়া

ক্ষণকাল মুখের কাছে থেমে রইলো, টেব্‌ল্‌ফ্যানের মৃদুগুঞ্জনে, ঘর গেলো ভ'রে। বাস্তবিক, প্রশ্নটা বড়ো অস্বাভাবিক শোনালো, স্বচ্ছন্দ আলাপের মধ্যে বই থেকে ধার ক'রে বলা কোনো কথার মতো।

পান্তুয়াটি গিলে হৈমন্তী পাথরের গেলাশ থেকে এক ঢোঁক জল খেলেন।—'এ-কথা তোমাকে কে বললে?'

'বলবে আবার কে? চোখেই দেখছি।'

'কেন, তোমার সংসারে তুমি কি কোনো বিশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছো?'

'সংসার আমার নয়, তোমারই। বরং, তুমিই সংসার। তুমি না-থাকলে আমার কোনো সংসার হ'তো না।'

'আঠারো বছর বয়েস থেকে এ-সব কথা শুনে-শুনে কান প'চে গেছে। দয়া ক'রে আর আউড়িয়ো না।'

'করবো দয়া। তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো। বিশৃঙ্খলা নেই, তা সত্যি। কিন্তু শৃঙ্খলাও নেই। যা আছে তা উদাসীনতা, এমন কি, হৃদয়হীনতা। যে যার মনে আছে, কেউ কারু তোয়াক্কা রাখে না, কেউ কারো খোঁজ নেয় না, একে কি শৃঙ্খলা বলে! নিয়মিত খাওয়া হ'লেই মানুষ বাঁচে না তা তো জানো।'

'এও জানি যে নিয়মিত খাওয়া হ'লে তবেই মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে।'

'সে তো দেখাই যাচ্ছে। তোমার ফজলি আমটা কেটে দিয়ে গেছে কেন? অমন একটা ভালো জিনিস নষ্ট করলে! কেটে রাখলে কি আর আমের কিছু থাকে!'

হৈমন্তী কিছু না-ব'লে আর-এক টুকরো আম মুখে দিলেন। অন্যান্য দিন তাঁর খাবার কাছে থাকে মোতির মা, আম কেটে দেয়, কলার খোসা ছাড়িয়ে দেয়, হঠাৎ কিছু দরকার হ'লে নিচে থেকে নিয়ে আসে। গৃহস্বামী উপস্থিত ব'লে মোতির মা আজ আর উপরে

আসেনি, আর নিবারণের যে আজ আমটা কেটে দেবার মতো বুদ্ধি হয়েছে এমন অঘটন কী ক'রে ঘটলো হৈমন্তী তা ভেবে একটু অবাকই হ'লেন। নিবারণ অক্ষরে-অক্ষরে আদেশ পালন করতে পারে, আর-কিছু পারে না। নিজের বুদ্ধিতে ভালো কি মন্দ কোনোরকম কাজ সে করতে পারে তা বিশ্বাস করা শক্ত। এ-বুদ্ধিটাও নিশ্চয়ই মোতির মা-ই জুগিয়েছিলো। ভাগ্যিস আর-একটু বুদ্ধি ক'রে কলাটাও খোসা ছাড়িয়ে দেয়নি!

হৈমন্তী ভেবে দেখলেন মোতির মা কাছে না-থাকলে তাঁর খেয়ে ঠিক সুবিধে হয় না। সকলের চোখের আড়ালে একলা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে খাওয়ার কথা ভাবতে যতই ভালো লাগুক, তাতে অসুবিধে ঢের। আজকাল এমনই হয়েছে যে কারো সামনে ব'সে খেতে হ'লেই তিনি আড়ষ্ট হ'য়ে যান, কিন্তু মোতির মা তাঁর একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাছাড়া ও তো দাসী।

'নিশ্চয়ই তোমার ঐ বোকা বোষ্টমের কাণ্ড,' বললেন অরিন্দম।

'কার কথা বলছো? নিবারণ?'

'নিবারণই হবে। কুষ্মাণ্ডটাকে রেখেছিলে কেন?'

'দরকার হয়, তাই রেখেছি।'

'হোঃ, ও একটা মানুষ, ওকে দিয়ে আবার দরকার! ওর মুখ দেখলে গা-ঘিনঘিন করে। ওকে তাড়িয়ে বেঁচেছি।'

হৈমন্তীর হাত ফসকে এক টুকরো আম মেঝেয় প'ড়ে গেলো। সরু চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'বাড়িতে পা দিয়েই খুব তো কর্তাগিরি ফলাচ্ছো!'

'তুমি তো কিছু করবে না, অগত্যা আমাকেই করতে হয়।'

'ছেলেকেও তো তাড়িয়েছো শুনলুম।'

'হুঁ।'

'এর পরে বোধ হয় আমার পালা ?'

বালিশ দুটো কোল থেকে খাটের পায়ের দিকে নামিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে অরিন্দম বললেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমাকে তাড়াবো। কলকাতা থেকে নাগপুর।'

'জো হুকুম।' নরম আঙুলে একটা সন্দেশ চটকিয়ে হৈমন্তী একটু-একটু ক'রে মুখে পুরতে লাগলেন।

'কী এলোমেলো খাচ্ছো!' অরিন্দম হঠাৎ ব'লে উঠলেন। 'আগে খাবে ফল, তারপর মিষ্টি, তারপর—ঐ কলা আর পাতক্ষীর কোথায় পেলে ?'

'একজন এনেছে মুন্সিগঞ্জ থেকে।'

'ও, মায়া-মন্দিরে যে-সব ভেট যায় তাতে তোমারও ভাগ থাকে বুঝি ?'

'চায়ের সঙ্গে তোমাকে দেয়নি কলা ?'

'কী যেন, মনে পড়ছে না।'

'মিনিকে তো ব'লে গিয়েছিলাম। পাতক্ষীরের কথা বলতে সাহস পাইনি, তোমরা সায়েব মানুষ!'

'সাবধান, মন্তী, সাবধান। কলা আর পাতক্ষীর কিন্তু মোটা হবার পক্ষে অব্যর্থ,' এই ব'লে অরিন্দম বালিশে মাথা দিয়ে একেবারে লম্বা হ'য়ে শুয়েই পড়লেন। এতক্ষণ কেবল বাজে কথাই বললেন; ছেলের প্রসঙ্গ, মেয়েদের প্রসঙ্গ, এ-সব দরকারি কথাগুলো কেবলই দূরে স'রে যাচ্ছে। অথচ ভেবেছিলেন হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা হ'তেই কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে আরম্ভ করবেন। ছেলেমেয়ের কাছে, পরিবারের বৃহত্তর পরিধিতে কিংবা বাইরের কর্মজগতে অরিন্দমের যে-বলশালী, উচ্চভাষী ব্যক্তিত্ব, স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে তা যেন একদম উবে যায়, দেখা দেয় অন্য একটি মানুষ যে মৃদু, পারতপক্ষে নির্বিবাদী,

এমনকি কোমল। আসলে, অরিন্দমের চরিত্রের এটাই প্রধান দুর্বলতা যে এখনো তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন। এ-বয়েসে—এবং এ-বয়েসের অনেক আগে থেকে—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে একটি অতি অভ্যস্ত নিরুত্তাপ সংসারিয়ানা নামে, এই দম্পতির জীবনে যে এখনো তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস লাগেনি তার কারণ হয়তো এই যে মাঝে-মাঝে পরস্পরকে ছেড়ে দীর্ঘকাল তাঁদের কেটেছে, কি হয়তো অরিন্দমের তীব্র কামুক প্রকৃতি, যার ফলে স্ত্রী এখনো তাঁকে শরীর দিয়ে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ, যা থেকে ভালোবাসার জন্ম, ভালোবাসার জীবনও তা-ই। এ-আকর্ষণ যেখানে সত্যই গভীর, যেখানে উভয় পক্ষ পরস্পরের শরীরের বিদ্যুৎ-শিখাকে স্পর্শ করেছে ও লালন করেছে, সেখানে অনেক বছরও জীবনকে জীর্ণ করে না, দাম্পত্যকে অন্ধ অভ্যাসে নামায় না। এই শরীর-চেতনার জন্যই স্ত্রীর সান্নিধ্যে অরিন্দমের অন্য মূর্তি; হৈমন্তীর সঙ্গে যত বিরোধ, জীবন-যাপনের যে-মস্ত ব্যবধান এবার পদে-পদে তাঁকে পীড়িত করছে, সে-সমস্ত ছাপিয়ে এই চেতনাই এখন বড়ো হ'য়ে উঠলো; অরিন্দম নিজেই অবাক হ'য়ে দেখলেন যে এই ঠাকুর-ঘর, এই জপতপ, মানুষ-পুজো, তরল ভাবাবেগের মাতামাতি, যা তিনি কোনোদিন দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তাও কত সহজে তিনি সহ্য করছেন, গম্ভীর কথাগুলো ঠাট্টার হাওয়ায় ফেঁসে যাচ্ছে, মনে-মনে তিনি যেন সায় দিতেই ইচ্ছুক, হৈমন্তী যেমনই হোক, তাকে গ্রহণ করতেই প্রস্তুত।

তবু, ছেলের কথা, মেয়েদের কথা, এ-সব না বললেই নয়। চিৎ হ'য়ে শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ উপুড় হ'য়ে বালিশ দুটো বুকের তলায় টেনে হাঁক দিলেন, 'বাহাদুর!'

হৈমন্তী আস্তে বললেন, 'উঃ, চটকাতেও পারো বিছানা! ওতেই তো একজন মানুষ আবার শোবে!'

অরিন্দম কথাটা গায়েই মাখলেন না। দরজার ধারে দেখা দিলো চির জাগ্রত বাহাদুর।

'সিগ্রেট।'

একটি কাচের টেবিলের উপরে সিগারেটের টিন, দেশলাই আর ছাইদান সাজিয়ে বাহাদুর রেখে গেলো।

অরিন্দম শুয়ে-শুয়েই একটি সিগারেট ধরালেন, কিন্তু দু' চার টান দিয়েই উঠে বসলেন। খাট থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে হঠাৎ বললেন, 'খোকা কি বাড়ি ফিরেছে?'

'কে, অরুণ?' ছেলের শিশু-নামটি সম্প্রতি বাড়িতে একেবারেই অপ্রচলিত, হৈমন্তী সেটি কদাচ ব্যবহার করেন না, কেন কে জানে। অরিন্দমও মুখোমুখি অরুণই ডাকেন, কিন্তু আড়ালে এখনো মাঝে-মাঝে খোকা বেরিয়ে পড়ে।

'কে জানে? বোধ হয় ফেরেনি।'

'একবার খোঁজ করবে?'

'কী হবে খোঁজ ক'রে? ফিরলে ভাতও পাবে, শোবার জায়গাও আছে।'

'তাহ'লে না-ও ফিরতে পারে?'

'সে তো তোমারই হুকুম।'

'রাত্তিরে বাড়ি না-ফেরা সম্বন্ধে ও তো শুনলুম পিতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষা রাখেনি।'

হৈমন্তী চুপ ক'রে রইলেন।

'তোমার চোখের উপর ছেলেটা এমনি উচ্ছন্নে যেতে পারলো। আশ্চর্য!'

'আমি কী করবো? জল যখন নিচের দিকে গড়ায় কেউ কি আটকাতে পারে?'

'বাঃ, চমৎকার কথা! তাহ'লে কোনো বিষয়েই আমাদের কিছু করবার নেই?'

'তুমি থাকলেই বা কী করতে পারতে? বকাবকি চ্যাচামেচি করতে, এই তো? তাতে বাড়িতে প্রতিদিন অশান্তি লেগে থাকতো, কিন্তু অরুণকে কি ফেরাতে পারতে?'

'অশান্তিকে এত ভয় কেন? অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে থাকতে গেলে কিছু-কিছু অশান্তি বাধ্‌বেই।'

'আমার ও-সব পোষায় না।'

'তাই ব'লে তোমার ছেলেমেয়ের সর্বনাশ হ'তে দেখে?'

'বেশ তো, তুমিই তো এখন সশরীরে উপস্থিত আছো, যা পারো করো না।'

'ছাখো মন্তী, তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি একজন ভয়ানক মস্ত লোক, এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপারে মন দেবার তোমার ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই।'

'মস্ত লোক না হ'তে পারি, কিন্তু সত্যি এখন আর এ-সব ভালো লাগে না। অনেক তো হ'লো, আর কেন?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অরিন্দম বললেন, 'অরুণের ছেলেটার যে অসুখ সে-খবরও কি তুমি রাখো না?'

এর উত্তরে হৈমন্তী কিছু বললেন না, শুধু চোখ তুলে একবার তাকালেন।

'কদ্দিন ভুগছে ও?'

'কদ্দিন? জন্ম থেকেই তো রোগাপটকা।'

'ডাক্তারও দেখাওনি?'

'কী হবে ডাক্তার দেখিয়ে? ডাক্তার কি অসুখ সারাতে পারে?'

'কে পারে তবে?'

'কেউ পারে না। যখন সারবার আপনিই সারে।'

'মা-মহামায়ার কাছ থেকে এই শিক্ষাই কি শুধু পেয়েছো, না মন্ত্র-পড়া জল-টলও তিনি দিয়েছেন?'

'সব খবরই তো রাখো দেখা যাচ্ছে।' হৈমন্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই চটবেন না, নিছক ঠাণ্ডা মেজাজ দিয়েই স্বামীর সব আক্রমণ ব্যর্থ করবেন।

'ও-সব তুকতাক মন্তর-তন্তর আর চলবে না। ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে।'

'বেশ, যা-খুশি কোরো।'

'একটু আগেও শুনলুম ছেলেটার কান্না। সারা রাতই ট্যাঁ-ট্যাঁ করে বুঝি?'

'মনে তো হয়।'

'তুমি ছাখো না ওকে মাঝে-মাঝে? বেচারা উজ্জ্বলা বুঝি সারা রাত ঘুমুতে পারে না?'

'ছেলের মা হ'লে অমন একটু কষ্ট করতেই হয়। তাও তো ওর একটা আয়া আছে।'

'এমন নিষ্ঠুর কথা কী ক'রে তুমি বলতে পারলে, মন্তী!'

'নিষ্ঠুর মানে? ছেলে যতদিন ছোটো, মা-র কি আর শরীরের সুখ ব'লে কিছু থাকে!'

একটু চুপ ক'রে থেকে অরিন্দম বললেন, 'রোজ রাত্তিরেই কাঁদে এ-রকম?'

মুড়মুড় শব্দে তিন-কোণা পরোটার এক কোণ ভেঙে জবাব দিলেন হৈমন্তী, 'কাঁদেই যদি, তুমি কী করতে পারো? থামাতে পারো কান্না?'

'মন্তী, তুমি এ-সব বলছো কী! সোজা কথায় বললেই পারো

এ-সব ঝঞ্ঝাট তোমার পোষায় না—পাশের ঘরে একটা মানুষ ম'রে গেলেও তোমার এই বুড়োবয়েসের পুতুলখেলার নেশা টুটবে না!'

হৈমন্তী ট্যারচা চোখে একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর, হঠাৎ অত্যন্ত মধুর হেসে বললেন, 'যা বলেছো! শিশুও যা, বুড়োও তা-ই। তোমার মতো চিরযৌবন নিয়ে তো আর কেউ আসেনি।'

যে-তীর হৈমন্তী হানলেন তা ঠিক জায়গায় বিঁধলো না, পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। অরিন্দমের গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটলো না, উজ্জ্বলার ঘর থেকে হঠাৎ শোনা গেলো শিশুর ক্ষীণ গোঙানি। চুপচাপ মাঝরাত্তিরে সে-শব্দ শোনালো কেমন গা-ছমছম-করা; কোনো মানুষ-শিশুর ক্ষুদ্র দেহই যে এ-কান্নার উৎস তা অনুমান করা যায় না, যেন কোনো অশরীরী অনির্ণেয় কান্না এ-বাড়ির হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

একটা কলার খোশা ছাড়িয়ে নিয়ে হৈমন্তী সেটা চামচের মতো ক'রে ধ'রে তার মাথায় খানিকটা পাতক্ষীর বিঁধিয়ে তুলে আনলেন। তারপর এক কামড় কলা আর সেই সঙ্গে ক্ষীর মুখে পুরে বললেন, 'আজকালকার মেয়েরা শিশুর যত্ন একেবারেই জানে না।'

'সেকালের মেয়েরাও জানতো না—তুমিই যদি তাদের প্রতিনিধি হও।'

হৈমন্তী খিলখিল ক'রে একটু হেসে উঠে বললেন, 'আমি আমার কথা আর কেন! আমাকে নিয়ে কোনো সুখই তোমার হ'লো না!'

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি খুব কাজের মেয়ে এ অপবাদ তো কোনোদিন তোমাকে দিইনি। টাকা দিয়ে যত আরাম কেনা যায় সবই ছিলো, দাসদাসীর অভাব ছিলো না—তবু ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোটো, ততদিন হয় তোমার মা নয় আমার পিসিমা নয় অন্য

কেউ আমাদের সঙ্গে এসে থেকেছেন, যেতে চাইলে তুমি ছাড়োনি—সে-কথা তোমার মনে নেই?'

চাঁপার কলির মতো আঙুলে ক্ষীর, কলা আর সন্দেশ চটকাতে-চটকাতে হৈমন্তী বললেন, 'তোমার তো সবই মনে আছে দেখছি। আর এত সব দিকে তোমার নজর—এও খুব সুখের কথা। নতুন দেখছি এটা। ভাবছো আমি কত সুখেই ছিলুম! এদিকে কত রাত যে ওদের তাড়নায় নির্ঘুম কেটেছে, তুমি তার কী জানো! তোমার তো কোনোদিন মুহূর্তের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। আমি ঘুমোতে পারিনে ব'লে তোমাকে দুশ্চিন্তাও করতে দেখিনি কোনোদিন। আর এখন পুত্র-বধূর জন্যে তো খুব দরদ দেখছি। বেশ, বেশ।'

'আশ্চর্য!' অরিন্দম হঠাৎ ব'লে উঠলেন।

হৈমন্তী ভাবলেন, ক্ষীর-কলা খাওয়ায় তাঁর আন্তরিক উৎসাহটা স্বামীর চোখে ধরা প'ড়ে গেছে। আধ-বোজা চোখে বললেন, 'যা-ই বলো, ক্ষীর-কলা তুমি যতটা অখাদ্য মনে করো আসলে তা নয়। একদিন খেয়ে দেখো।'

অরিন্দম স্ত্রীর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'বলতে পারো আমাদের দেশে ছেলের বৌয়ের উপর শাশুড়ির এই বিদ্বেষ কেন?

'বিদ্বেষ? বিদ্বেষ মানে?'

'এর ব্যতিক্রম তো দেখলুম না। তুমিও শেষটায়—'

ফর্শা, লম্বা ঘাড় সোজা ক'রে হৈমন্তী বললেন, 'আমি—কী?'

'কী যে তোমাদের ঈর্ষা—ছি! তোমরাই নাকি আবার মায়ের জাত—কত মহিমার কথা শোনা যায় তোমাদের! নিজের ছেলে তার বৌকে ভালোবাসলে যারা সইতে পারে না, তারা আবার মানুষ!'

দ্বিতীয় কলাটির খোশা ছাড়িয়ে হৈমন্তী বললেন, 'ভুল বললে। আমার ছেলে তো তার বৌকে ভালোবাসে না।'

'সেই তো তোমার গর্ব! সেই তো তোমার আনন্দ! চোখের সামনে দেখছো ছেলেটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, অথচ তাকে বাধা দেবার চেষ্টাও করো না, তার কারণই তো এই! ছেলে নরকে ডোবে ডুবুক, বৌটা মনের কষ্টে ম'রে যায় যাক্, তবু ছেলে যে বৌকে ভালোবাসছে না এতেই তুমি খুশি। পাছে বৌয়ের দিকে ওর মন ফেরে সেই ভয়ে ওর জঘন্য অভ্যেসগুলিকে প্রশ্রয় পর্যন্ত দাও। তা কি আমি বুঝি না!'

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য অরিন্দমের ছিলো না, কথাগুলো আগে তিনি ভাবেনওনি, বলতে-বলতে হঠাৎ যেন হৈমন্তীর অন্তরের গূঢ় কথাটি তিনি আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ব'লে ফেলেই তাঁর মনে হ'লো, এতটা না-বললেও হ'তো। কথাগুলো বড়োই সাংঘাতিক।

কিন্তু এত সব সাংঘাতিক কথা শুনেও হৈমন্তী একটুও উত্তেজিত বা বিচলিত হ'লেন না। আস্তে-আস্তে দ্বিতীয় কলাটি ও অবশিষ্ট পাতক্ষীর সম্পূর্ণ খেলেন; তারপর আধ গেলাশ জল খেয়ে বাকি জল দিয়ে হাত ধুয়ে ডাকলেন, 'মোতির মা!'

অরিন্দম তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'ও কী! তোমার দুধ তো প'ড়ে রইলো।'

শুধু দুধই নয়, আস্ত দু' খানা পরোটা, দেড়খানা পান্তুয়া ও একটি সন্দেশও প'ড়ে রইলো পাতে। স্বামী কাছে ব'সে অবিশ্রান্ত বকরবকর ক'রে যাচ্ছেন, ঠিক স্বাধীনভাবে খাওয়া গেলো না। কাল থেকে অন্যরকম ব্যবস্থা করতে হবে।

'দুধটা খেয়ে ফ্যালো', অরিন্দম আবার বললেন।

'নাঃ, দুধ আর আজ খাবো না।'

ঘোমটা-ঢাকা মোতির মা লজ্জার বন্যা হ'য়ে ঘরে ঢুকলো, ক্ষিপ্র

হাতে পাত কুড়িয়ে নিয়ে অন্তর্হিত হ'লো, দুধে ভরা গেলাশটি নিয়ে ভুললো না। পাতের দিকে তাকিয়ে, মা-র অসামান্ত অগ্নিমান্দ্য লক্ষ্য ক'রে সে পুলকিত হ'য়ে উঠলো; তার পোড়াকপালে এমনই কর্ত্রী জুটেছে যে কোনোদিন পাতে কিছু প'ড়ে থাকে না, বুদ্ধি ক'রে আগেই কিছু সরিয়ে রাখতে হয়। রোজ রাত্রে সমস্ত কাজকর্ম শেষ হ'লে ভুবনের ঘরে ব'সে তাদের দু'জনের সামান্ত এক জলযোগ হয়— দুধ, মিষ্টি, ফল, এটা-ওটার ছিটেফোঁটা। আজ এতখানি ঘন দুধ দেখে ভুবনের মুখের চেহারা কী-রকম হবে সেটা আন্দাজ ক'রে ঘোমটার আড়ালে মোতির মা-র কালো-কালো কয়েকটি দাঁত বেরিয়ে পড়লো। মিন্সে আবার যা রসিক!

'তোমার এই মোতির মা ভারি অসভ্য দেখছি,' ব'লে উঠলেন অরিন্দম। 'লজ্জায় যেন আর বাঁচে না। দেখতে পারিনে এই মাগি-গুলোর ঢং।'

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে হৈমন্তী বললেন, 'ঢের ঢের সুন্দরী তো দেখেছো জীবনে, মোতির মা-র মুখশ্রী না-দেখলেও চলবে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, অত্যন্ত কদাকার।'

একা ঘরে অরিন্দম একটি সিগারেট ধরালেন। উজ্জ্বলার ছেলের কান্না আর শোনা যাচ্ছে না, হয়তো একটু ঘুমিয়েছে। কত নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তি উজ্জ্বলার চোখে! কিছু বলে না, কিছু ভাবে না, কেবল সহ্য করে। আমাদের সকলের অপরাধের বোঝা ব'য়ে এ কী নিষ্প্রাণ, নিঃসাড় জীবন!

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে অরিন্দম উঠে দাঁড়ালেন।

হৈমন্তী ঘরে ঢুকে বললেন, 'যাও এখন, শোবো।'

'আমিও শোবো, চলো।'

'তোমাকে বললুম না আমি এ-ঘরে শোবো!'

'কী বাজে বকছো। চলো।'

'বাজে বকিনি মোটেও। অন্য সব বিষয়ে তুমি যা খুশি কোরো, কিন্তু এ-বিষয়ে তোমাকে যা বলেছি তার নড়চড় হবে না জেনে রেখো।'

'যদি জোর করি?'

'তা পারো বইকি করতে। পশুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পুরুষ না-করতে পারে এমন কাজ নেই। স্ত্রীলোক দেখলেই তার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে—যে-কোনো স্ত্রীলোক। হোক্ সে দাসীবাঁদি, হোক সে কদাকার, হোক সে মেয়ের বয়েসি—চোখে একবার পড়লেই হ'লো। স্ত্রীলোকের দিকে ভদ্রদৃষ্টিতে তাকাতে শিখেছে নাকি পুরুষ!'

অরিন্দম হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।—'তুমি তোমার প্রতিভার বাজে খরচ করছো, মন্তী। মা-মহামায়ার ভক্ত না হ'য়ে তুমি নিজেই একটি মা হ'য়ে বসতে পারতে। ভালো পশার জমতো। ভেবে ছাখো, এখনো সময় আছে। ভালো মাইনে পেলে আমি তোমার পব্লিসিটি অফিসর্ হ'তে রাজি আছি। বলো তো কালই রটিয়ে দিই যে তুমি স্বপ্নে কালী পেয়েছো।'

'সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না। যাও তুমি, আমাকে ঘুমুতে দাও।'

'তবে তোমার কথার উত্তরে আপাতত বলতে পারি যে যে-স্ত্রীলোকের দিকে আমার তাকানোটা কিছুতেই ভদ্র হচ্ছে না সে দাসীও নয়, কুৎসিতও নয়, আমার মেয়ের বয়েসিও নয়, যদিও রাস্তায় একসঙ্গে বেরুলে হয়তো অনেকে আমার মেয়ে ব'লেই তাকে ভুল করবে।'

হৈমন্তী মুহূর্তকাল স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ধন্য তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের একটু ক্লান্তিও আসে না!'

'এখানে তুমি একটু ভুল করছো, মন্তী,' অরিন্দম হেসে বললেন। 'বেশির ভাগ পুরুষেরই ক্লান্তি আসে। বড়ো সহজেই আসে। আমার মতো অক্লান্ত, একনিষ্ঠ প্রেম লাখে একটাও পাবে না।'

'প্রেম!—ও-কথাটা তুমি আমার সামনে মুখে এনো না।'

'কেন বলো তো? তোমাদের মা-মহামায়াও তো রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভাঁড়িয়েই—'

'চুপ করো!' তীব্রস্বরে হৈমন্তী ব'লে উঠলেন, 'তোমার বর্বরতা অনেক সয়েছি, আর না।'

ফুরিয়ে-যাওয়া সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে অরিন্দম চটি দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন। 'যে-বিষয়ে কিছুই বোঝো না,' হৈমন্তী আবার বললেন, 'সে-বিষয়ে কথা বলতে এসো না। পুরুষের শরীরের ক্ষুধাকে প্রেম নাম দিয়ে কলঙ্কিত করে যে, সে মূঢ় ছাড়া আর কী!'

অরিন্দম বললেন, 'আমার তো ধারণা ছিলো যে ক্ষুধাট মেয়েদেরও আছে।'

এ-কথার সোজাসুজি কোনো উত্তর না-দিয়ে হৈমন্তী বললেন, 'নেহাৎই জীবের জন্য, না-হ'লে সৃষ্টি টেঁকে না—নয়তো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো বীভৎস—তা ছাড়া আর কী!'

'বীভৎস!' আর-কোনো কথা অরিন্দমের মুখ দিয়ে বেরুলো না। মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হ'লো তিনি যেন আর জীবন্ত মানুষ নেই, পাথরের মূর্তি হ'য়ে গেছেন।

'বীভৎস বইকি', হৈমন্তী কথাটায় যথাসম্ভব জোর দিলেন। 'মেয়েরা তবু ও থেকে উঠে আসতে পারে, কিন্তু পুরুষ সারাজীবন ওতেই গড়াগড়ি করে।'

'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বীভৎস! তুমি এ-কথা বললে, মন্তী! তুমি!'

'মেয়ে দুটোকে কেন ধ'রে-বেঁধে ঐ নোংরামির মধ্যে ফেলছি না, ছেলেটা কেন বৌয়ের আঁচল-ধরা হ'য়ে ঐ ক্লেদাক্ত রসে ডুবে নেই— এই তো তোমার রাগ?'

হৈমন্তী আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফস্ ক'রে একটা উত্তর অরিন্দমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'ছেলে তার বদলে কোন্ রসে ডুবে আছে তার কি খবর রাখো?'

'রাখি খবর। ছেলের বাপের খবরও কিছু-কিছু রাখি। তোমার না-হয় বিয়ে ক'রে স্বভাব শুধরেছিলো, ওর না-হয় তাও শোধরালো না। এমন আর কী তফাৎ!'

একটা প্রচণ্ড অন্ধ ক্রোধ অরিন্দমের বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারতে লাগলো। হাত-পা কাঁপছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে, দৃষ্টি ঝাপসা। তবু সেই ক্রোধের চেয়েও বলশালী চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু শোধরাবে ব'লেই ওর বিয়ে দেয়া হয়। তুমিই তখন ছেলের বিয়ে দিতে পাগল হয়ে গিয়েছিলে! আমারই মত ছিলো না।'

অরুণের বিয়েটা হয়েছিলো মা-মহামায়ার প্ররোচনায়, বিয়ে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে, এ তাঁরই বাণী। তা যখন হ'লো না, হৈমন্তী একদিন মা-কে এ-বিষয়ে প্রশ্নও করেছিলেন। মধুর হেসে মা জবাব দিয়েছিলেন, 'হবে, হবে, অরুণ যেদিন ফিরবে, একেবারে প্রেমময়ের দিকেই ফিরবে। ওকে আসতে বলিস মাঝে-মাঝে আমার কাছে।' কথাটা শুনে বড়ো আনন্দ হয়েছিলো হৈমন্তীর। আহা— সে-দিন কবে আসবে যেদিন মা-র করুণা ওকে স্পর্শ করবে! ছেলেকে একবার বলেওছিলেন মায়া-মন্দিরে যাবার কথা, অরুণ হাঁ-না কিছু বলেনি, চুপ ক'রে ছিলো। মা যদি সত্যিই তেমন ক'রে টানেন, সাধ্য কী অরুণের না গিয়ে পারে!

অবশ্য এ-সব কথা স্বামীকে বলবার কোনো দরকার বোধ করলেন না হৈমন্তী। শুধু বললেন, 'যা ভাবা যায় সব সময় কি তা-ই হয়!'

'মাঝখান থেকে একটা নিরপরাধ মেয়েকে ধ'রে এনে বলি দিলে! বৌয়ের আঁচল-ধরা না হ'য়ে ছেলে যে ঘোর লম্পট হয়েছে এতে তোমাকে বরং খুশিই দেখা যাচ্ছে, কারণ এতে সব চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে ছেলের বৌ!'

সিগারেটের টিন আর দেশলাই হাতে তুলে অরিন্দম বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।—'বাহাদুর!'

তক্ষুনি জবাব এলো, 'জু!'

বাহাদুর নিঃশব্দে ব'সে ছিলো বারান্দায়; কোনো রাতেই এমন হয়নি যে প্রভু যতক্ষণ না শুয়েছেন সে ঘুমিয়েছে। অরিন্দম যদি রাত তিনটেয় শোন তবু সে জেগে থাকে—কে জানে হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়।

'বারান্দায় ক্যাম্পখাটে আমার বিছানা পাতো।'

'জু?'

বেশির ভাগ কাজের কথা বাহাদুরকে বলতেই হয় না, কোনো কথাই একবারের বেশি বলতে হয় না, কিন্তু এটা দু' বার বলতে হ'লো।

'কাল ও-ঘরের একটা খাট এনে দিস বারান্দায়—চমৎকার হাওয়া, এখানেই আরামে ঘুমুবো। মন্তী, তুমি এ-ঘরেই শোও, ছোটো ঘরটায় বড্ড গরম, ঘুমুতে পারবে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিপাটি বিছানা পাতা হ'লো বারান্দায়, নেটের মশারিও খাটানো হ'লো। অরিন্দম মশারির মধ্যে ঢুকে বললেন, 'আলোটা নিবিয়ে দে।'

একাদশীর চাঁদ উঠে গেছে মাথার উপরে, এতক্ষণে হয়তো পশ্চিমেই হেলেছে। এখন আর বারান্দায় চাঁদের আলো নেই, কিন্তু তার আভা

আছে। স্বাস্থ্য তাঁর এতই ভালো যে স্ত্রীর সঙ্গে এই উত্তেজিত কথা-কাটাকাটির পরেও বালিশে মাথা ঠেকাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে এলো। হঠাৎ খুট ক'রে একটু শব্দে তন্দ্রা গেলো ভেঙে—মন্তী কি তার ঘরের দরজার খিল এঁটে দিলে? সেই ছোট্ট শব্দ অরিন্দমের মগজে একটা পোকার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো—যতই চোখ চেপে থাকেন ঘুম আর আসে না। এ কী কাণ্ড! আমার অনিদ্রা-রোগ! কিন্তু মগজের মধ্যে সেই পোকাটার বিরাম নেই—খুট খুট খুট—যেন বিশাল এক প্রাসাদের হাজার ঘরের হাজার দরজা একটার পর একটা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

এমন সময় আবার শোনা গেলো উজ্জ্বলার ছেলের কান্না। সঙ্গে-সঙ্গে অরিন্দম গভীর আরাম বোধ করলেন। মগজের পোকাটা থামলো, নামলো অতল নিঃশব্দতা, আর তারই মধ্যে রুগ্ন শিশুর কান্নার একঘেয়ে স্বর শুনতে-শুনতে অরিন্দম ঘুমিয়ে পড়লেন।

৬

অরিন্দম দিল-খোলা মানুষ ; মন-খারাপ করা, অসুখী হওয়া—এ-সব তাঁর ধাতে নেই। হৈ-চৈ ফূর্তির চড়া সুরে তাঁর মনটা বাঁধা ; মেজাজ যখন খারাপ হয়, সেটাও অকুণ্ঠে প্রকাশ করেন হৈ-চৈ চীৎকারে, অর্থাৎ মেজাজ খারাপ হওয়াটাকে এত বেশি প্রশ্রয় দেন যে বেশিক্ষণ খারাপ থাকতে পারে না। অপরিমিত আত্ম-প্রশ্রয়ই অরিন্দমের জীবনধর্ম। সংযম শেখেননি কোনোদিন ; মানসিক লুকোচুরির অভ্যেস নেই ; ছোটো-বড়ো সমস্ত ঘটনার সঙ্গে তাঁর হাতে-হাতে নগদ কারবার, যক্ষুনি হ'লো, তক্ষুনি ফুরুলো, কিছুরই জের টেনে আনেন না, মনে-মনে গুমরে মরেন না কোনো-কিছু নিয়েই।

তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাল রাত্রের ঘটনা ভুলে যাওয়া। কিন্তু নিজেই অবাক হ'য়ে গেলেন যখন দেখলেন যে ভোলেননি। বুকের মধ্যে কোথায় একটা টনটনানি। সমস্ত বাড়ির আবহাওয়াই যেন গেছে বদ্‌লে। এতদিন পরে এত আকাঙ্ক্ষিত বাড়ি ফেরা, তাঁর মেয়েরা, তাঁর পুত্রবধূ, তাঁর প্রথম ও প্রথম-দেখা পৌত্র—গভীর কামনার এই বস্তুগুলোর উপর একটা অবাস্তবতার ছায়া নেমেছে যেন। গতরাত্রে যে-চেষ্টায় তাঁর প্রচণ্ড রাগ সামলে গিয়েছিলেন তা অস্বাভাবিক বললে কিছুই বলা হয় না, তাঁর পক্ষে তা অমানুষিক—এত বড়ো আত্মসংবরণ এই প্রথম তাঁর জীবনে। কেন সামলে গেলেন ? কেন ঘোরতর গর্জন ক'রে উঠলেন না, কেন রূঢ় পৌরুষের আঘাতে হৈমন্তীর অসহ্য ন্যাকামি দীর্ণ ক'রে পায়ের তলায় লোটালেন না তাকে ?

তাহ'লে, আর যা-ই হোক্, তিনি সুস্থ বোধ করতেন; আজ সকালে এই অবাস্তবতার চেতনা নিয়ে তাঁকে জেগে উঠতে হ'তো না।

ভেবেছিলেন হৈমন্তীর এ-সব ছেলেখেলা, অনায়াসে ভেঙে দিতে পারবেন। ভেঙে দেবারও দরকার হবে না, তাঁর উপস্থিতিতে আপনিই যাবে ভেঙে। তা হ'লো না। হৈমন্তী সম্মোহিত; তীব্র আঘাত ছাড়া এ-সম্মোহন টুটবে না। আফিম-খাওয়া রোগীকে যেমন ধ'রে মারতে হয়। প্রস্তুত হওয়াই দরকার হৈমন্তীর; সে-সুযোগ—চরম সুযোগ—এসেছিলো কাল রাত্রে, অরিন্দম তা হারালেন। হেরে গেলেন তিনি। কুটিল, সর্পিল স্ত্রী-সত্তারই জয় হ'লো। দুর্দান্ত পুরুষ মাথা নামিয়ে চ'লে এলো বাইরে, বারান্দায় ঘুমোলো। অরিন্দমের এত তেজ, এত বিক্রম কোনো কাজেই লাগলো না; মেনে নিলেন, হার মানলেন, হৈমন্তীর শক্তিকে স্বীকার ক'রে তাকে আরো শক্তিময়ী ক'রে তুললেন।

ঘুম ভাঙবার আগেই বাহাদুর কফি দিয়ে গেছে। শুয়ে-শুয়ে কফি খেলেন, খবরের কাগজে চোখ বুলোলেন। এই সকালবেলায় সমস্তটা বাড়ি মাঝরাত্তিরের মতোই চুপচাপ, কে যে কোথায় আছে বোঝবার উপায় নেই। বুলি—বুলিই বা কোথায়?

উঠে গেলেন প্রাক্তন শোবার ঘর পার হ'য়ে বাথরুমে। মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছিলো, পাছে হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। শোবার ঘরটি তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে গেলেন, যেন তাকাতে না-হ'লেই বাঁচেন, তবু চোখে পড়লো যে হৈমন্তীর ঠাকুরঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা-বন্ধ। তক্ষুনি বুঝলেন হৈমন্তী বাড়ি নেই, খুব ভোরে উঠেই ছুটেছে মায়া-মন্দিরে।

সকালবেলার কর্তব্যগুলো সমাপন করতে ঘণ্টাখানেক লাগে অরিন্দমের, আজও তা-ই লাগলো। বাহাদুর একখানা জরি-পাড়

ঢাকাই ধুতি কুঁচিয়ে রেখেছিলো, স্নানের পরে তা-ই পরলেন, গায়ে চড়ালেন ফুরফুরে আদ্দির পাঞ্জাবি, পকেটে ফরাসি সিল্কের রুমাল।

নিচে নামতেই মিনির সঙ্গে দেখা। সেই কালো পাড়ের শাদা মিলের শাড়ি পরনে, ফর্শা মুখে গাল দুটি টুকটুকে লাল, এইমাত্র বোধ হয় রান্নাঘর থেকে এলো।

—'বাবা, তোমার ব্রেকফাস্ট তৈরি। খাঁটি বিলেতি ব্রেকফাস্ট, বেকনশুদ্ধ।'

'তোকে যে বিয়ে করবে সে সুখী হবে—এ আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।'

কথাটা ব'লেই খচ্ ক'রে বিঁধলো। উজ্জ্বলার বাবাও কি তার সম্বন্ধে এ-ই ভাবতেন না? সুখী কেউ কাউকে করতে পারে না—যে যাতে সুখী হয়। এখন মেয়ে দুটো সুপাত্রে পড়লেই বাঁচি।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়লো কাল রাত্রে শোনা শিশুর কান্না! নীরদ ডাক্তারকে এক্ষুনি খবর দিতে হয়।

—'একটু দাঁড়া, একটা ফোন ক'রে আসি।'

বসবার ঘরে গিয়ে দ্যাখেন, বুলি বিস্রস্ত বেশে প্রকাণ্ড সোফায় ব'সে নভেল পড়ছে আর প্রাণপণে আঙুলের নখ খাচ্ছে।

—'বুলি! এই নখ খাওয়ার অভ্যেসটা তোকে ছাড়তেই হচ্ছে এবার।'

বুলি তাড়াতাড়ি মুখ থেকে হাত সরিয়ে এনে বললে, 'বাবা, ভোরবেলা তোমাকে কত ডাকলুম, কিচ্ছুতে উঠলে না।'

'চিমটি কাটলেই পারতিস।'

'ভেবেছিলুম কাটবো, তোমার ঐ বাহাদুর এমন কটমট ক'রে আমার দিকে তাকাতে লাগলো যে পালিয়ে এলুম।'

অরিন্দম হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

'বাহাদুর মনে করে তুমি ওরই সম্পত্তি। ভোর না-হ'তেই বারান্দার চিক ফেলে দিয়েছে, পাছে রোদে তোমার ঘুম ভাঙে। আমি হ'লে কিন্তু ফেলতুম না, চোখে রোদ লেগে তোমার ঘুম ভেঙে যেতো—কী মজা হ'তো তখন!'

একটু পরে বুলি আবার বললে, 'বাবা, তুমি বারান্দায় শুয়েছিলে কেন?'

'এমন সুন্দর বারান্দা থাকতে ঘরের গুমোটে পচে কোন্ বোকা!'

'আমাদের সকলকেই বোকা ব'লে দিলে এক কথায়! খুব সাহস তো তোমার! আজ থেকে, বাবা, আমিও বারান্দায় শোবো।'

অরিন্দম টেলিফোন তুললেন। নীরদ ডাক্তার বললেন এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে পৌঁছবেন। অরিন্দমের বাল্যবন্ধু নীরদ ঘোষ, কলকাতার সব চেয়ে নাম-করা ডাক্তারদের একজন, আগে একটা খবর পাঠালে হয়তো ছেলেটা এতদিনে সেরেই উঠতো।

খাবার টেবিলে উজ্জ্বলাও উপস্থিত। স্নানের পরে একটি ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরেছে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা উজ্জ্বল। কাল সারাটা রাতই হয়তো তার বিনিদ্র কেটেছে, তবু সকালবেলা যথাসম্ভব সুশ্রী ও পরিপাটি হ'য়ে এসেছে—আমার সম্মানরক্ষার চেষ্টায়, ভাবলেন অরিন্দম। কী নির্মম পরিহাস ওর ঐ সিঁদুরের ফোঁটা তা বোঝবার সাহস যদি ওর থাকতো, তাহ'লে ঘ'ষে-ঘ'ষে তুলে ফেলতো সিঁথি থেকে সিঁদুরের শেষ চিহ্ন। তাহ'লে ভাঙতো হাতের শাঁখা, রঙিন শাড়ি পিঠে বেণী দুলিয়ে বেরিয়ে যেতো যে-কোনো জায়গায় ওর আশ্রয় জোটে। ...কিন্তু কোথায় আশ্রয়?

উজ্জ্বলা রীতিমতো হাসিখুশিভাবে কিছু কথাবার্তাও বললে। কাল ভারি ম্লান হ'য়ে ছিলো, তাতে যদি বা কিছু দোষ হ'য়ে থাকে, অরিন্দম ভাবলেন, সেই দোষ কাটাবারই চেষ্টা এ। পাছে শ্বশুর ভাবেন

এ-বাড়িতে ও সুখে নেই, পাছে কারো মনে হয় ওর দীর্ঘশ্বাসই অকল্যাণ ডেকে এনেছে, ওর মুখে হাসি নেই ব'লেই খোকার অসুখ।

অরিন্দমের মনে হ'লো এক্ষুনি তাঁর দম আটকে যাবে। ব্যবহারের কোনো-না-কোনো বিশেষ আদর্শ মেনে চলতে এরা সবাই এত বেশি সচেষ্ট যে মানুষ হ'তেই প্রায় ভুলে গেছে। উজ্জ্বলা তো কলের পুতুল, মিনিও প্রায় তা-ই, ভরসা এক মিনি।

'কাল রাত্রে টাটা বড্ড কেঁদেছে, না?' জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকার ছিলো না, কিছু বলবার জন্যেই বললেন অরিন্দম।

উজ্জ্বলার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়লো। হয়তো খোকার কান্নায় শ্বশুরের ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে? সে তো চেষ্টা করে, কত চেষ্টা করে ওকে শান্ত রাখতে; নিজের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবে না, রাত্তির দুটোয় বিছানা ছেড়ে উঠে ছেলে কোলে পায়চারি করে, কিন্তু একবার কান্না শুরু করলে সহজে ও থামে না, কী অভিশাপ নিয়ে ও জন্মালো! আর কী অভিশাপ উজ্জ্বলার জীবনে, শিশুকে নিয়ে মায়ের যে আনন্দ, তার স্বাদ এখনো জানলো না, কখনো কি জানবে? খোকা হাসে না, খেলা করে না, মা-কে দেখলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, এমনকি উজ্জ্বলা যখন তার উদ্বেল স্তন ওর মুখের সামনে ধরে, তখনো অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে থাকে। আয়া অনেক চেষ্টায় বিলিতি টিনের দুধ ওকে একটু-একটু ক'রে খাওয়ায়, এদিকে উজ্জ্বলার শেমিজ ভিজে যায়, বুকের টনটনানি অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, বড্ড কেঁদেছে', ক্ষীণস্বরে বললে উজ্জ্বলা। তারই অপরাধ।

'এখন ঘুমুচ্ছে?'

'আজ যেন একটু ভালোই আছে।'

হয়তো উজ্জ্বলারই কল্পনা এটা, কিংবা শ্বশুরকে খুশি করবার জন্য বানিয়ে বলা।

অরিন্দম বললেন, 'ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। এক্ষুনি আসবে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, উজ্জ্বলা, নীরদ খুব ভালো ডাক্তার, দু'দিনেই সারিয়ে দেবে।'

* * *

'সেরে যাবে', গম্ভীর মোটা গলায় নীরদ ডাক্তার বললেন। ক্ষুদ্র রোগীটিকে পরীক্ষা করতে দু'মিনিটও তাঁর লাগলো না। চোখ, নাক, জিভ দেখলেন, পা দুটো টেনে দেখলেন একবার। তারপর মাথার এক গোছা চুল ধ'রে আস্তে একটু টান দিতেই চুলগুলো পরিষ্কার উঠে এলো।

অরিন্দম বললেন, 'এ কী! চুলগুলো উঠে এলো যে!'

উজ্জ্বলা মৃদু স্বরে বললে, 'ক'দিন থেকেই ওর চুল উঠে যাচ্ছে। নাওয়াবার পর মাথা যখন মুছে দিই, তোয়ালেটা চুলে কালো হ'য়ে যায়।'

'কেন, কেন হচ্ছে এ-রকম?' অরিন্দমের স্বরে বেশ একটু উদ্বেগ প্রকাশ পেলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জ্বলাই জবাব দিলে, 'পেটের চুল নাকি অনেক সময় থাকে না, প'ড়ে গিয়ে তারপর ভালো চুল ওঠে।'

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'বুকের দুধ খাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হাঁ, তা খাচ্ছে বইকি', অরিন্দম তাড়াতাড়ি বললেন।

'ক'বার খায়?'

উজ্জ্বলা মাথা নিচু ক'রে বললে, 'খায় না।'

'সে কী! খায় না! এ-কথা তো কই তুমি আমাকে বলোনি।' ব'লেই অরিন্দমের খেয়াল হ'লো যে এ-সব কথা ঠিক তাঁকে বলবার নয়; তাছাড়া তিনি বাড়ি এসেছেন এখনো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি।

'একেবারেই খায় না?' নীরদ ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

লজ্জার মাথা খেয়ে উজ্জ্বলাকেই সবিস্তারে বলতে হ'লো যে মাতৃদুগ্ধে সে-রকম কোনো আসক্তি এই শিশুর জন্ম থেকেই নেই। এতদিন তবু দু'তিনবার খাওয়ানো চলছিলো, ক'দিন ধ'রে একেবারে মুখেই তুলছে না।

'ক'দিন ধ'রে?'

'বেশিদিন না—এই তিন-চারদিন।'

'তিন-চারদিন ধ'রে একেবারেই খাচ্ছে না?'

'একেবারেই না।'

নীরদ ডাক্তার আর একবার চোখটা দেখলেন, তারপর বোরিক তুলোর ছোট্ট একটা তুলি পাকিয়ে কানের ভিতর চালিয়ে দিলেন। কঁকিয়ে উঠলো শিশুটা। তুলোটা বাইরে এনে চোখের সামনে ধ'রে ভালো ক'রে দেখলেন।

অরিন্দম নিচু গলায় বললেন, 'পুঁজ?'

কথাটা উজ্জ্বলার কানে গেলো। ভীত চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর কানে আবার কী হ'লো, ডাক্তারবাবু?'

'কিছু না, সেরে যাবে', গম্ভীর মোটা গলায় নীরদ ডাক্তার বললেন। 'তারপর, অরিন্দম, কতকাল পর তোমার সঙ্গে দেখা! চলো নিচের ঘরে গিয়ে একটু বসি।'

নিচে বসবার ঘরে সিগারেট ধরিয়ে বসলেন দুই প্রৌঢ় বন্ধু। নীরদ ঘোষ বললেন, 'ভারি সুন্দর হয়েছে তো তোমার মেয়ে দু'টি!'

'বৌমাকে কেমন দেখলে?'

'সুন্দর বৌ। আমার ছেলেটাকে কত বলছি বিয়ে করতে—কিছুতেই রাজি হয় না।'

'লভ-টভ আছে বোধ হয় কোথাও। খোঁজ নিয়ে ছাখো।'

'তা লোকে লভ করে তো বিয়ে করবার জন্যেই—কী বলো?'

'হয়তো ভাবছে তোমাদের মত হবে না।'

'কী যে বলো! মত দেবার জন্যে তো তৈরি হ'য়ে আছি—ছেলের মুখেই রা নেই।...তা তোমার ছেলেকে তো বেশ অল্প বয়েসেই বিয়ে দিলে।'

অরিন্দম একটু শুষ্ক স্বরে বললেন, 'হ'য়ে গেলো তো।'

'ছেলে কোথায়? তাকে তো দেখলুম না।'

অরিন্দম আরো একটু শুষ্ক স্বরে বললেন, 'এই তো এইমাত্র ছিলো ...এক্ষুনি বুঝি বেরুলো কোথায়।' অরুণ যে রাত্রে বাড়ি ফেরেনি সে-খবর একটু আগেই পেয়েছিলেন বুলির মারফৎ। ফিরবে, এমন আশাও তাঁর মনে ছিলো না। বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, ইয়ার-মহলে এই মস্ত খবরটা ভাঙিয়ে দু' একদিন চ'লে যাবে নিশ্চয়ই।

'ভালো করোনি ছেলেকে এত অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়ে।'

'কেন বলো তো?'

'বিয়ে করবার আগে ওর নিজের রোগটা সারিয়ে নেয়া উচিত ছিলো।'

অরিন্দমের মুখের রং ছাইয়ের মতো হ'য়ে গেলো। ঢোঁক গিলে বললেন, 'কী রোগ?'

'রোগটা ভালো না। সিফিলিস।'

'সিফিলিস!' সাপের মতো ফোঁস ক'রে উঠলো কথাটা।

'ওর ছেলেরও তা-ই। ছেলেই বাপের পরিচয় দিলে।'

অরিন্দমের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না।

একটু পরে নীরদ ডাক্তারই আবার বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তোমাকে আমি খুব খোলাখুলিভাবে বললুম। ছেলেগুলো নেহাৎ বোকা, সারিয়ে ফ্যালে না কেন—স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট তো রয়েছে। এই ছাখো না, বৌমাকে ইনফেক্ট করলে, তারপর

ছেলে-পুলে···একে ক্রাইম বললে ভুল হয় না—আমি অন্তত তা-ই বলবো।'

বেশ একটু চেষ্টা ক'রে অরিন্দম বললেন, 'একটা কথা জিগেস করি। ছেলেটা···কি বাঁচবে?'

'বলা শক্ত।···আমি যদ্দূর চেষ্টা করবার করবো।··আজ চলি।'

নীরদ ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। অরিন্দমও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁর হাঁটু দুটো যেন জল হ'য়ে গেছে।

'প্রেস্ক্রিপশন যেটা দিয়েছি এক্ষুনি আনিয়ে নাও। আর শোনো—বৌমারও বড্ড স্ট্রেন হচ্ছে, মাঝে-মাঝে ওঁকে বিশ্রাম দিতে হবে।'

গাড়িতে ওঠবার মুখে নীরদ ডাক্তার হঠাৎ পিছনে ফিরলেন।—'তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে। পুষে রাখলে এমন পাজি রোগ আর নেই। দিব্যি ভালো কাটছে বছরের পর বছর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেয় না। আর তখন সাক্ষাৎ যমদূত। তাছাড়া বৌমারও ভয় আছে বইকি। আর ছেলেপুলে যদি আরো হয়···দেখছোই তো।'

নীরদ ডাক্তারের মোটরের শব্দ অরিন্দমের কানে প্রলয়ের জল-কল্লোলের মতো শোনালো। তক্ষুনি তিনি আর উপরে গেলেন না, বসবার ঘরেই বসলেন। কতক্ষণ যে কাটলো, কী তিনি ভাবলেন, কিছুই টের পেলেন না। হঠাৎ ছাখেন, উজ্জ্বলা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তক্ষুনি মুখে হাসি টেনে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'কী, উজ্জ্বলা?'

'কী বললেন ডাক্তার?'

'তোমাকে খুব বকলেন।'

'আমাকে বকলেন!'

বললেন, 'শরীরের উপর এ-রকম অত্যাচার ক'রে চললে একটা শক্ত

অসুখে পড়তে কতক্ষণ। আজ থেকে তোমাকে একজন নর্স রেখে দেবো, সে সারা রাত থাকবে, রাত্তিরের ঘুমটি তোমার পুরোপুরি চাই।'

'আয়া তো আছে একটা।'

'না—না, তোমার কোনো ওজর-আপত্তি আমি শুনতে চাইনে। তোমার কিছু ভয় নেই, তোমার কাছে যত ভালো থাকে, নর্সের কাছে তার চেয়ে কম থাকবে না। ওদের পাকা হাত, অসুখ-বিসুখে ওরাই ভালো। তুমি ইচ্ছে করলে মিনিদের ঘরেও শুতে পারো।'

নিজের রুগ্ন ছেলে নর্সের কাছে দিয়ে নিজে সে সারা রাত প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুবে, এ-চিন্তা উজ্জ্বলার অসহ্য, কিন্তু সে ভাবলে যে তার সেবা যথেষ্ট নিপুণ হয় না ব'লেই হয়তো এই ব্যবস্থা। মনে হ'লো, তার উপর এঁদের বিশ্বাস নেই। না-থাকতেই পারে—আমি কী? কী পারি? কতটুকু জানি? বেশ, আজ থেকে মিনিদের ঘরেই শোবে সে, এঁরা যদি বলেন ছুঁয়েও দেখবে না ছেলেকে—তাতেই যদি খোকা ভালো হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে উজ্জ্বলা বললে, 'খোকার কথা ডাক্তারবাবু কী বললেন?'

'আর-কিছু তো বললেন না।'

'আমার কাছে কিছু লুকোবেন না,' বলতে গিয়ে উজ্জ্বলার গলা কেঁপে গেলো।

অরিন্দম গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার চেহারা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে, উজ্জ্বলা। যথেষ্ট ঘুমিয়ে নিয়ে নিজের শরীর আগে ঠিক করো, তারপর অন্য কথা।'

*　　　*　　　*

বুলি, কোমরে আঁচল জড়ানো, হাতে একটা কাঠের বল, সেটা

আদ্ধেক লাল, আদ্ধেক হলদে, খালি পা, মাথার চুল দুটো মোটা বেণীতে ভাগ হয়ে দু'কাঁধের উপর দিয়ে এসে বুকে লোটাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো লাল কাঁকরের রাস্তায়, তারপর রাস্তা ছেড়ে লন্-এ, সেখানে বর্ষার পুরু সবুজ নরম সুগন্ধি ঘাস, বর্ষার স্পর্শ তার পায়ে। বিকেল শেষ, সন্ধ্যার ছায়া নামলো, একটা গাছের ফাঁক দিয়ে একটি সূর্য-ছেঁড়া লাল লম্বা বর্শা বুলির চোখে এসে বিঁধলো। ভুরু কুঁচকে স'রে দাঁড়ালো, শিষ দিলে আস্তে, তারপর জোরে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই মরি-কি-পড়ি দৌড়তে-দৌড়তে হা-হা-জিভ-বার-করা টপ্‌সি মুখ থুবড়ে পড়লো এসে তার দু'পায়ের মধ্যে।

নিচু হ'য়ে পিঠে একটু হাত বুলোলো, ঘাড় চুলকে দিলে। হাতের বল্‌টা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'শ্‌শ্‌!'

দৌড়, টপ্‌সি, দৌড়। দশ গোনবার আগে বল্‌টি মুখে ক'রে এসে হাজির।

আবার।

এবার টপ্‌সি বল্ মুখে নিয়ে এমন বেগে ফিরে এলো যে বুলির সঙ্গে লাগলো ধাক্কা, আর বুলি টাল সামলাতে না-পেরে ব'সে পড়লো ঘাসে।

খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠলো, আর টপ্‌সি লেজ নেড়ে-নেড়ে ঘুরতে লাগলো তাকে ঘিরে কুঁই-কুঁই শব্দে—ভাবখানা এই, লাগেনি তো?

বুলি ঘাসের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে চোখে হাত চেপে কান্নার মতো আওয়াজ বের করতে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে টপ্‌সির কী করুণ আর্তনাদ! বার-বার প্রদক্ষিণ করতে লাগলো কর্ত্রীকে; এক বার মুখের কাছে, একবার পায়ের কাছে মুখ নিয়ে শোঁকে, কখনো আকাশের দিকে চোখ তুলে তার বুক-ভাঙানো চ্যাঁচানি। এমনি যখন মিনিট পাঁচেক কেটেছে, বুলি চোখ থেকে হাত সরিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো।

—'কেমন জব্দ ! টপ্‌সি, কেমন জব্দ !...এ কী !'

নিরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, 'এই তো।'

'আপনি কখন এলেন ? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন এখানে ?' বুলি তাড়াতাড়ি উঠে বসলো।

'ঘড়ি দেখিনি, তবে দু'মিনিট হবে, কি আড়াই মিনিট।'

'আমাকে ডাকেননি কেন ?'

'দেখছিলাম।'

কাল মিনি তাকে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলো, তা মনে ক'রে বুলি গম্ভীর হ'য়ে গেলো। সে যে কত বড় জংলি তার পরিচয় ভদ্র-সমাজে সে আর দেবে না, দস্তুরমতো চাল-চলন কায়দা-কানুন শিখবে এবারে। নিরঞ্জনবাবুরও অন্যায় হয়েছে, ডাকা উচিত ছিলো।

'চলুন ঘরে গিয়ে বসি।'

বুলি উঠতে যাচ্ছিলো, নিরঞ্জন বাধা দিলে।—'বসি না এখানেই একটু। ঘরের চেয়ে এ অনেক ভালো।'

'তবে দুটো চেয়ার আনাই ?'

'চেয়ার দিয়ে কী হবে, এই তো বেশ।' নিরঞ্জন ব'সে পড়লো বুলির একটু দূরে, বেশ আরামের ভঙ্গিতে।

'একটু আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে কিন্তু। আপনার কাপড়—'

'তোমার কাপড়ে তার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি বটে।'

বুলি পিঠের কাপড়টা সামনে টেনে এনে দেখলো তাতে কাদার ছোপ-ছোপ দাগ। হঠাৎ তার কেমন যেন একটু লজ্জা করতে লাগলো—এ-রকম তার কখনো করে না।

নিরঞ্জন বললে, 'তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।' ব্রাউন পেপারে জড়ানো একটা বাক্স তার হাতে ধরাই ছিলো, দিলে সেটা বুলিকে।

'আমার জন্যে!' বুলি লজ্জায় একেবারে লাল উঠলো—আজ ওর হলো কী? 'আমার জন্যে কেন? কী এটা?'

'খুলেই ছাখো।'

অন্য সময় হলে এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে দেখতো ভিতরে কী আছে, কিন্তু এখন বাক্সটা হাতে নিয়ে বুলি শুধুই নাড়াচাড়া করতে লাগলো। 'দাও, আমিই খুলে দিই', ব'লেই নিরঞ্জন বুলির হাত থেকে টেনে নিলে বাক্সটা, উপরের কাগজটা খুলে ফেলতে বেরিয়ে এলো রঙিন ছবি-আঁকা একটা কাগজের বাক্স।

বুলি ব'লে উঠলো, 'ওমা! এ যে চকোলেট!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আমার জন্যে চকোলেট এনেছেন কেন? আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি নাকি?'

'ওঃ! মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে দেখছি। তা বড়োরাও মাঝে-মাঝে চকোলেট খায়।'

'আমি তো খুব ভালোই বাসি,' গাম্ভীর্যরক্ষার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে বুলি ব'লে ফেললো।

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললে, 'তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমি অনেক চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের লোকও দেখেছি, যারা দিন-রাত চকোলেট খায়।...খাও একটা,' বাক্সের ডালা খুলে নিরঞ্জন বুলির দিকে এগিয়ে দিলে।

নানা রঙের রাংতায় মোড়া নানা আকৃতির চকোলেটগুলো পড়ন্ত আলোয় চিকচিক ক'রে উঠলো। বুলি বললে, 'আপনি খাবেন না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটা চকোলেটের রাংতা ছাড়িয়ে নিরঞ্জন আস্তে কামড় দিলে।

তার দেখাদেখি বুলিও তা-ই করলে, যদিও ও-রকম তিন-চার খণ্ড চকোলেট একসঙ্গে খেয়ে ফেলা তার পক্ষে কিছুই না।

টপ্‌সি একবার এসে চকোলেট-ভরা বাক্সটা শুঁকে গেলো। তারপর ঘুরে এসে বুলির দিকে তাকিয়ে লেজ নেড়ে-নেড়ে মৃদুস্বরে নানারকম আওয়াজ করতে লাগলো।—এসো না, আর-একটু খেলি।

'আপনি আসাতে টপ্‌সি কিন্তু মোটেও খুশি হয় নি। ওর খেলাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।'

নিরঞ্জন বললে, 'দু'জনের মধ্যে একজন খুশি হ'লেই মস্ত লাভ। তাছাড়া টপ্‌সিও আমাকে চিনতে পারলে দুঃখিত হ'তো না।'

'সেবারে আপনি ওকে ক—ত ছোটো দেখেছিলেন—না?'

'এই এইটুকু,' নিরঞ্জন এক হাত বাটির মতো ক'রে ধ'রে তার একটু উপরে আর-এক হাত রেখে দেখালো। 'কত মস্ত হয়েছে!'

'আপনি কুকুর ভালোবাসেন?'

'খুব। খেলতেও ভালোবাসি কুকুরের সঙ্গে।' নিরঞ্জনের হাতের কাছেই হলদে-লাল বল্‌টা প'ড়ে ছিলো, টপ্‌সির দিকে একবার ইশারা ক'রে এমন ভাবে ছুঁড়লে যে সে মাঝ-রাস্তাতেই সেটা ধ'রে ফেললে বটে, কিন্তু চলতি বল্ আটকাতে গিয়ে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো গড়িয়ে।

বুলি হেসে উঠলো।—'বাঃ, বেশ তো।'

নিরঞ্জন আবার বললে, 'বাস্তবিক মস্ত বড়ো কুকুর হয়েছে,—আর কী সুন্দর! তোমাকেও সেবার কত ছোটো দেখেছিলাম। তুমিও মস্ত বড়ো হয়েছো।'

বল্-মুখে টপ্‌সি দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বাঁ হাতে ওর মুখ চেপে ধ'রে ডান হাতে গালে ছোট্ট কয়েকটা চড় দিতে-দিতে বুলি বললে, 'আর খেলা না। যা এখন।'

বল্‌টা ফেলে' দিয়ে একটু দূরে কুঁকড়িয়ে শুয়ে পড়লো টপ্‌সি।

'ভারি মন-খারাপ ক'রে দিলে বেচারার।'

'কী-রকম বাধ্য দেখলেন? আমি যা বলি তা-ই ও করে।'

'এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে ওর মিল আছে দেখতে পাচ্ছি।'

বুলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললে, 'কী রকম?'

'আমিই বা কম বাধ্য কী? বলেছিলে কাল আসতে, আজই এসে হাজির।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'দিদির শিক্ষায় একদিনেই তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে তো।'

বুলি হেসে ফেললো।

'আমার প্রশ্নের উত্তর ভেবেছিলেন?'

'কোন্ প্রশ্ন?'

'এ-যুগের অবতার কে?'

নিরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, 'বোধ হয় মা-মহামায়া।'

'ওমা! তার খবর আপনিও জানেন!'

'আজকেই শুনেছিলুম অরুণের কাছে।'

'দাদার কাছে! দাদা গিয়েছিলেন আপনার ওখানে?'

'গিয়েছিলো একবার সকালে।'

'কী বললে?'

'এ-যুগের অবতারের কথা? সে আর না-ই শুনলে।'

বুলি আর-কিছু জিজ্ঞেস করলে না, পাছে কথায়-কথায় ফাঁস হ'য়ে যায় যে কাল রাত্রি থেকে এখন পর্যন্ত অরুণ ফেরার।

অরুণ তার কথা রেখেছিলো, সকাল সাতটার আগেই উপস্থিত হয়েছিলো পার্ক হোটেলে সাতাশ নম্বর ঘরে। রাত বারোটা পর্যন্ত সে কাটিয়েছে মস্ত দল নিয়ে ডন জুয়ান নামক বিলিতি শুঁড়িখানায়,

তারপর দলের যারা ঝরতি-পড়তি তারা যে যেমন পেরেছে বাড়ি ফিরেছে কি অন্য কোথাও গেছে; শাঁসালো জনচারেক মোটারে চেপে ঘণ্টাখানেক অবাধ ভ্রমণের পরে গেছে তাদের অনেকদিনের আলাপি এক বেশ্যার কাছে, সেখানে প্রায় সারা রাত ঢলাঢলির পর ভোর হবার একটু পরেই অরুণ বেরিয়েছে, এক নাপিতের দোকানে ঢুকে ছোকরাটাকে দু'. পয়সা দিয়ে মাথা টিপিয়ে, চুলে তেল-জল ঢেলে চেহারাটা একটু দুরস্ত ক'রে সোজা পার্ক হোটেল। পকেটে নোট আর খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিলো তার আট আনা মাত্র বাকি আছে —আর অবশ্য সেই মোহর চারখানা এখনো তার পকেটে লুকিয়ে আছে রুমালের তলায়।

নিরঞ্জন সবে ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছিলো, বন্ধুকে দেখে মহা খুশি হ'য়ে বললে, 'এসো, এসো, চা খাও।'

সকালের চা-টা বেশ ভালোই খাওয়া হ'লো বন্ধুর ঘরে। অরুণ জিজ্ঞেস করলে, 'কাল আমাদের ওখানে কতক্ষণ ছিলে?'

'বেশিক্ষণ না। তুমি তো দেখছি খুব সকালেই বেরিয়েছো বাড়ি থেকে।'

'হ্যাঁ, আজকাল খুব ভোরে উঠি কিনা,' বলে অরুণ হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।

'অবাক করলে! তুমি ভোরে ওঠো!'

অরুণ গম্ভীরভাবে বললে, 'সকলের জীবনেই পরিবর্তন আছে হে। ...মিনিকে কেমন দেখলে?'

'ঐ তুমি যা বললে।'

'খুব বদ্‌লে গেছে তো? বলো কেন আর! আমার মা—তিনি তো আজকাল মা-মহামায়া ছাড়া কিছুই জানেন না, মিনিরও সেই ভাব।'

'কে তিনি ?'

'অবতার-টবতার গোছের কিছু হবেন। ভারি খাপসুরৎ মাগি !'

'ছি-ছি ! কী যা-তা বলো !'

অরুণ ইংরিজিতে বললে, 'She's a peach !' এবার নিরঞ্জনের অত খারাপ লাগলো না। বাংলা বললে যে-কথা আমাদের কানে অসহ্য, ইংরিজিতে বললে তা-ই যেন অনেকটা ভদ্র শোনায়। এ থেকেই প্রমাণ হয় হাজার ভালো শিখলেও বিদেশী ভাষার মর্মে প্রবেশ করা কত শক্ত। 'বুদ্ধিও ঘোরেল—দু'হাতে পয়সা লুটছে, লাল হ'য়ে গেলো।'

মিনির অদ্ভুত ব্যবহারের একটা কারণ নিরঞ্জন এতক্ষণে খুঁজে পেলো। মুখে সে তখন যতই হালকাসুরে কথা ব'লে থাকুক, মিনির কাছ থেকে কাল সে মোটেও জমকালো অভ্যর্থনা পায়নি, এটা সে ভালোই বুঝেছিলো। দু'বছর সময় নেহাৎ কম না, যৌবন সহজেই ভোলে, তবু লাহোর থেকে কলকাতার সমস্ত দীর্ঘ পথ থেকে-থেকে তার বুকের মধ্যে যে একটা সুখের পাখি ডেকে উঠছিলো, তার কারণ কি শুধু এই যে কিছুদিন আবার তার চিরকালের চেনা শহরে কাটবে ? কলকাতায় থাকে এমন-কোনো মানুষের কথা কি বিশেষ ক'রে মনে পড়েনি ?··· অথচ মিনি এমন একটা ভাব দেখালো যেন তাকে ভালো ক'রে চেনেই না। ভাগ্যিস বুলি তখন এসে পড়েছিলো, নয়তো তার মতো সপ্রতিভ মানুষকেও একটু লজ্জাই পেতে হ'তো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, 'তোমাদের বাড়ির সবাই বুঝি এই মায়ের ভক্ত ?'

'মা তো আত্মহারা। মহামায়ার আদেশেই তো আমার বিয়ে হ'লো—আমার চাকরিও নাকি তাঁর দয়াতেই হবে। আমার বৌও চোখ বুজে ধ্যান-ট্যান শুরু করেছে।'

নিরঞ্জন মৃদু একটু হাসলো।—'আর তোমার বাবা ?'

'তিনি সাক্ষাৎ কালাপাহাড়। অনেকটা আমার মতো বলতে পারো', অরুণ আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। দু'বারের একবারও নিরঞ্জন তার হাসির মানেটা ঠিক বুঝতে পারলে না।

'তিনি কিছু বলেন না ?'

'থাকেন নাগপুর, কী আর বলবেন ? এখন তিনি এসেছেন—দেখি, বাড়ির যদি হাওয়া ফেরে।' একটু থেমে অরুণ আবার বললে, 'সে-আশা কম, কারণ এদিকে আবার তিনি বেজায় বৌ-ন্যাওটা—'

'যাঃ !'

'সত্যিই যে তা-ই। মা-র কথার উপরে একটি কথা তিনি বলেন না কখনো। একেবারে পত্নীপ্রাণ পতি। এই একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মিল নেই।'

অরুণ আবার হেসে উঠলো।

'বুলিও কি জপ-তপ ধরেছে নাকি ?'

অরুণ একটা হাই চেপে বললে, 'নাঃ, ও এখনো ঠিক আছে। তবে মা-র পাল্লায় প'ড়ে কতদিন আর ঠিক থাকে বলা যায় না। আমার মা-র কথা আর বলবো কী তোমাকে—এ-পর্যন্ত এই মহামায়ার পায়ে কম-সে-কম পনেরো হাজার টাকা ঢেলেছেন।'

'প-নে-রো হা-জা-র ! বলো কী !'

'আমার বৌয়ের নামে শ্বশুর পাঁচ হাজার টাকা রেখেছিলেন—তা পর্যন্ত শ্রীচরণেই গেছে। এদিকে, ত্যাখো, আমি ক্যাপিটেলের অভাবে বিজনেসটা দাঁড় করাতে পারছি না। ওঁরা ঐ এক চাকরি জানেন—ব্যবসার দিকে আমাকে একটা চান্সই দিলেন না !'

'কিসের বিজনেস করবে ভাবছো ?'

'ওঃ সে আমাদের সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে—বাড়ির টাকা না-

পেলেও এখন আমার চলবে। নয়ানগড়ের রাজার ছোটো ছেলে আমার বন্ধু, কাজ শুরু করবার মতো ক্যাপিটেল সে-ই দিচ্ছে, তারপর শেয়ার-হোল্ডরদের টাকা তো আছেই। লিমিটেড কোম্পানি সামনের সপ্তাহেই রেজিস্টার্ড করা হবে, অথরাইজ্‌ড্‌ ক্যাপিটেল এক লাখ, পঞ্চাশ হাজার পেড-অপ। আমি হলাম ওআর্কিং পার্টনর, অর্থাৎ কোম্পানির ম্যানেজর, আমার থাকবে দশ হাজার টাকা দামের শেয়ার, মাইনে নেবো শো পাঁচেক ক'রে আর কার্‌-অ্যালাউন্স দেড় শো। হিসেব ক'রে দেখা গেছে প্রথম বছরে অন্তত পাঁচ পর্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড্‌ দিতে পারবোই, তারপর দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ পর্যন্ত হ'তে পারে।'

এত কথার পরে অরুণ হঠাৎ বললে, 'তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

'নিশ্চয়ই।' নিরঞ্জন বার করলে কালকের সেই দামি সিগারেটের কৌটো।

অরুণ ব্যগ্র হাতে সিগারেট নিয়ে বললে, 'তোমার সেই টিন দেখি তেমনি রয়েছে। সত্যি কি তুমি সিগারেট খাও, না লোককে দেখাও?'

কথাটা নিরঞ্জনের বেশি ভালো লাগলো না। সে আস্তে জবাব দিলে, 'সিগারেট আমি একটু কমই খাই।'

সিগারেট ধরাবার সময় অরুণের যে প্রচণ্ড হাইটা এলো তা আর সে চাপতে পারলে না। মস্ত হাঁ ক'রে সমস্ত মুখগহ্বর দেখিয়ে সে হাই তুললো, সিগারেটটি ঠোঁট থেকে প'ড়ে গেলো খ'সে। আবার তুলে নিয়ে ধরিয়ে বললে, 'ক'দিন যায় তোমার এক টিনে?'

'তিন দিন।'

'তি-ন দি-ন! বলো কী হে!' বেশ একটু মাতব্বরি ধরনে হেসে উঠলো অরুণ। 'আমার তো এক টিনে এক দিনও ভালো ক'রে যায় না। খুব পয়সা জমাচ্ছো, উঁ? বেশ বেশ।'

নিরঞ্জন একটু গম্ভীরভাবে বললে, 'দামি সিগারেট খাই, এক টিনে তিন দিন না গেলে আমার চলে না।'

'হ্যাঁ, একটা কথা—তোমার কাছ থেকে গোটা দশেক সিগারেট নিতে হবে।'

'বেশ তো, নাও।'

'মুশকিল হয়েছে কী, মনের ভুলে শুধু ট্র্যামের টিকিটটি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এদিকে ঠিক আটটার সময় একটা জরুরি অ্যাপয়ন্টমেণ্ট।

'অত বলছো কেন? নাও, যে-কটা দরকার।'

টিনটা উপুড় ক'রে কয়েকটা সিগারেট ঢেলে নিলে অরুণ, দশটার জায়গায় পনেরোটা উঠে এলো কিনা, অত লক্ষ্য ক[illegible] না।

'সন্ধেবেলা তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'কী যে বলো! সামান্য কয়েকটা সিগারেট—'

মুখে বিষয়োচিত একটু গাম্ভীর্য এনে অরুণ বললে, [illegible] আমার বিজনেস-এর টর্ম্‌স্‌ নেহাৎ মন্দ হয়নি, কী বলো? [illegible] অবশ্যি মাত্র পাঁচশোতে, তা ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে বাড়[illegible] তো। তাছাড়া, শেয়ারের উপর ডিভিডেণ্ডও পাবো। মো[illegible] উপর ভালোই, না?'

'বেশ ভালোই তো।' কিন্তু নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বরে বি[illegible] উৎসাহ ফুটলো না। বন্ধুর এই সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষা জাগলো তা[illegible]নে। সে যাচ্ছে কুলিগিরি করতে কোন দূর চীন সীমান্তে, মাইনে অবশ্যি এ-সুযোগে তার দেড়শো থেকে এক লাফেই আড়াই শো হ'য়ে গেছে—তার মতো বি. এ. পাশ, অতি সাধারণ বঙ্গযুবকের পক্ষে এটা মস্ত সৌভাগ্য ব'লেই সে বরণ করেছিলো। কিন্তু তারই মতো অতি সাধারণ আর একটি বি. এ. পাশ ছেলে হঠাৎ এক লাফে একেবারে

একজন মস্ত বিজনেসম্যান হ'য়ে বসছে, এ-খবরে, অনেক চেষ্টা ক'রেও, সে খুব খুশি হ'তে পারছিলো না।

'হ্যাঁ, বেশ ভালোই। প্রস্‌পেক্ট আছে,' টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে অরুণ সিগারেট টানতে লাগলো।

'কিন্তু বিজনেসটা কিসের?' নিরঞ্জন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে।

'কেমিকেল্‌স্‌। এ-ব্যবসায় কী দারুণ লাভ তোমার কোনো ধারণা নেই। যেমন ধরো, ফীনাইল, মেথিলেটেড স্পিরিট—'

কেমিকেল্‌স্‌-এর পরেই ফীনাইল আর মেথিলেটেড স্পিরিটের উল্লেখের জন্য নিরঞ্জন ঠিক প্রস্তুত ছিলো না, তার দু ঠোঁট হঠাৎ ফাঁক হ'য়ে গেলো। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার আগেই, তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে অরুণ তাড়াতাড়ি ব'লো উঠলো, 'অবশ্য আরো নানারকম আছে,—এই ধরো নানারকম ইঞ্জেকশন, তাছাড়া হেভি কেমিকেল্‌স্‌ও কিছু করবো—যদি যুদ্ধ বাধে তবে লাল। ও-সবের জন্য সব স্পেশলিস্ট রাখা হচ্ছে।'

'কিন্তু ব্যবসা চালাতে হ'লে তোমাকেও তো কিছু-কিছু শিখে নিতে হবে।'

'ও, সে-বুঝে নেবো দু'দিনে—ও আর বেশি কী!...ভালো কথা, তুমি কিছু শেয়ার কেনো না এ-কোম্পানির।'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'পাগল!'

'পাগল কেন? খুব ভালো শেয়ার। তাও তো মোট চল্লিশ হাজারেরই শেয়ার আছে—এক লাখের পঞ্চাশ হাজার তো হ'য়েই গেছে, আর দশ হাজার তো আমার। আমার তো মনে হয় যেদিন আমরা স্টক-এক্সচেঞ্জে ছাড়বো তার পরের দিনই ওভর-সব্‌স্ক্রাইব্‌ড্‌ হ'য়ে যাবে।'

'তা হ'তে পারে।'

'তুমি নিয়ে রাখো না হাজারখানেক টাকার। পরে আর পাবে না।'

'টাকা কোথায়?'

'দ্যাখো, যা ভালো বোঝো।'

অরুণ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টেবিল থেকে পা নামিয়ে আনলে।—'পৌনে আটটা। এবার যেতে হয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে অরুণ আর-একবার হাই চাপলে। নিরঞ্জন হেসে বললে, 'ঘুম পাচ্ছে?'

'আর বোলো না ভাই, কাল রাত্রে একেবারে ঘুমোতে পারিনি—ছেলেটার অসুখ, সারা রাত ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রে জ্বালিয়েছে। এদিকে ভোর না-হ'তেই ছুটতে হচ্ছে কাজের তাড়ায়। বিয়ে ক'রে এই তো সুখ! বেশ আছো তুমি, নির্ঝঞ্ঝাট!'

অরুণের শেষের কথাটা নিরঞ্জন মনে-মনে মেনে নিতে পারলে না, বরং বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই তার এতখানি জ্ঞানোদয় একটু অদ্ভুতই লাগলো। কিন্তু মুখে সে কিছু বললে না।

'কী, কিছু বলছো না যে এ-বিষয়ে?' অরুণ আবার বললে।

'কী বলবো!'

'বনের পাখির বুঝি এবার খাঁচার পাখি হবার সাধ হচ্ছে?'

নিরঞ্জন মুখ টিপে হেসে বললে, 'তা মন্দ কী!'

'সে তো ঠিকই', ব'লে অরুণ অস্কার ওআইল্ড থেকে একটু বুকনি ঝাড়লে: "Men marry when they are tired, women marry because they are curious."—তারপর, লাহোরে কেমন ছিলে, বলো।'

'কেমন আর! কেটে যেতো।'

'আমরা তো শুনি তুমি খুব ভালোই ছিলে,' ব'লে অরুণ চোখ টিপলো।

'তার মানে ?'

'একটু বলো না তিনি কেমন ?'

'তুমি বলছো কী ?'

'আমরা শুনলুম তাঁর গোলাপের মতো রং, আর টকটকে লাল ঠোঁটে সিগারেট চেপে যখন মুচকি হাসেন—ওঃ, একেবারে আগুন !'

'কী বকছো মাথামুণ্ডু ! কার কাছে শুনেছো এ-সব ?'

'গোবিন্দ একবার গিয়েছিলো না ?'

'গোবিন্দ ?...ও, ঐ যে একবার এরিয়ান্সে রাইট-আউট খেলেছিলো ? হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো।'

'সে-ই বলেছে।'

নিরঞ্জন হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, 'ও, বুঝেছি। এক ভদ্রলোক ডিনারে ডেকেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ঐ সময়েই ও সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে পড়ে। আচ্ছা বোকা তো গোবিন্দটা।'

'তা ওর আর দোষ কী ! চোখ ধাঁধিয়ে গেছ্‌ল।'

'পঞ্জাবে এখনো ইংরেজি লেখা-পড়া শিখলেই একদম সায়েব ব'নে যায়। পুরুষদের কথা আর কী বলবো—মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে ঘাঘরা পর্যন্ত ধরে। ককটেল দিব্যি চলে—আর সিগারেট যা খায়।'

'খাশা জায়গা তো লাহোর ! যেতে হচ্ছে একবার।'

'অত বেশি সায়েবি আমার ভালো লাগে না।'

'তুমি একটা ক্যাবলা ! যা-ই বলো, মেয়েদের স্বাধীনতা আমরা এখনো ঠিক বরদাস্ত করতে পারিনে। মিনিকে যখন কথাটা বললুম ওর মুখ কী-রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো তা যদি দেখতে !'

নিরঞ্জন হঠাৎ সচকিত হ'য়ে বললে, 'কোন্‌ কথা ?'

'এই লাহোরের রেস্তোরাঁয় তোমার খানাপিনার কাহিনী।'

'এ এমন একটা বলবার মতো কথা কী !'

'আহা—ঠাট্টা ক'রে বলেছি তা আর কী হয়েছে !'

কিন্তু ঠাট্টাটা নিরঞ্জন ঠিক উপভোগ করতে পারলে না। কিছু না-ব'লে সেদিনের কাগজের হেড্-লাইনগুলো দেখতে লাগলো। অরুণও দু'একমিনিট চুপ ক'রে রইলো, তারপর হঠাৎ ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলো, 'ওঃহো, তোমার সেই টাকাটা !'

'আহা—এত ব্যস্ত কেন ?'

'আর বোলো না—টাকাটা আমি বালিশের নিচে রেখে ঘুমোলাম, যাতে না ভুলি, সঙ্গে আরো একশো টাকা ছিলো, আমাদের আপিশের জন্যে যে-ঘর নেয়া হচ্ছে তার আগাম ভাড়া—দেখলে তাও, সব রেখে এসেছি ! ট্র্যামের টিকিট ছাড়া কিচ্ছু আনিনি ! এখন টমসনের কাছে গিয়ে কী বলি ? চমৎকার একটা রোখের ঘর ঠিক করেছি ড্যালহুসি স্কোয়ারে, আজ ঠিক আটটায় বায়না দিয়ে আসবার কথা, পাঁচ মিনিট দেরি হ'লেই হয়তো দালাল ব্যাটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। চারদিক থেকে যা ঝুলোঝুলি ঘরটার জন্যে !'

অরুণ হতাশ ভঙ্গিতে ফের ব'সে পড়লো।

নিরঞ্জন বললে, 'তাই তো। বড়ো মুশকিল হ'লো।'

'গ্যাখো তো, আছে নাকি তোমার কাছে শো খানেক টাকা, তাহ'লে এখনকার মতো কাজ চ'লে যায়।'

নিরঞ্জন একটু ভেবে বললে, 'তা আছে।'

'তাহ'লে দাও ভাই, ঘরটা ঠিক ক'রে আসি। আমি বাড়ি গিয়েই ফের আসবো তোমার কাছে টাকা নিয়ে।'

'আমাকে যে একটু পরেই একবার বেরুতে হচ্ছে।'

'তাহ'লে কী হবে ?' রীতিমতো ব্যাকুল শোনালো অরুণের এই জিজ্ঞাসা।

'বিকেলের দিকে আমিই যেতে পারি তোমাদের বাড়ি।'

অরুণ যেন অকূলে কূল পেয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো, এ খুব ভালো হ'লো। তখন তোমার সব টাকাই একসঙ্গে দেবো। এখন দাও তাড়াতাড়ি। আটটা যে বাজে!'

অস্থিরভাবে অরুণ উঠে দাঁড়ালো।

টাকাটা দেবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের মোটেও ছিলো না, তার নিজের একশো টাকা এখন হাতেও নেই, তবে আপিশের শো চারেক আছে, এখন সে তা থেকে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে, পরে হিসেবনিকেশ হবে। সেই টাকা থেকে একখানা একশো টাকার নোট তুলে সে অরুণের হাতে দিলে, দিলে শুদ্ধ এইটে প্রমাণ করবার জন্যে যে এখন পর্যন্ত তার আর্থিক অবস্থা অরুণের চেয়ে বিশেষ খারাপ নয়। নোটটা পকেটে ফেলে অরুণ আর-একবার বললে, 'যেয়ো কিন্তু আজ বিকেলে, ভুলো না যেন,' ব'লেই উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলো।

নিরঞ্জন যে কাল না এসে আজই এলো তার এ-ও একটা কারণ; অরুণের কাছ থেকে টাকাটা ফেরৎ পাওয়া, যদিও বুলিকে কথাটা জানানো সে দরকার মনে করলো না।

দাদার প্রসঙ্গ বুলি চাপা দিতে চাইলেও চাপা পড়লো না। নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, 'অরুণ কোথায়?'

'দাদা? কী যেন, আছে বোধ হয় ভিতরে।'

মিথ্যে বলবার চেষ্টায় বুলির মুখ লাল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু অসন্দিগ্ধ নিরঞ্জন কিছু লক্ষ্য করলে না। ছায়া আরো লম্বা হ'য়ে এলো, কিন্তু আকাশে সূর্যাস্তের আভা লাল একটি নদীর মতো ব'য়ে চলেছে।

অনভ্যস্তের মনে খুব ছোটো মিথ্যে বললেও যে-অস্বস্তি জাগে তা

থেকে রেহাই পাবার জন্যেই বুলি বললে, 'কী লম্বা দিন আজকাল। ফুরোতেই চায় না।'

'তোমার মাষ্টার মশাইর আসবার সময় হ'লো না যে আবার?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নেড়ে বুলি ব'লে উঠলো, 'ন্‌না।' চাপা-হাসির আভা তার মুখে, বুকের উপর লুটিয়ে পড়া বেণী দুটি মাথা নাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে দুলে উঠলো। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো নিরঞ্জন। একটু পরেই আত্মস্থ হ'য়ে বললে, 'কেন?'

'বাবা তাঁকে জবাব দিয়েছেন।'

'চাঁদের কলঙ্কের গল্পটা বলেছিলে বুঝি তাঁকে?'

'বলেছিলাম। দুপুরবেলা একবার এসেছিলেন মা-র সঙ্গে দেখা করতে—মা-কে আবার উনি ভীষণ ভক্তি করেন কিনা—মা বাড়ি ছিলেন না, এক্কেবারে বাবার মুখোমুখি প'ড়ে গেলেন। তক্ষুনি জবাব।'

'তক্ষুনি?'

'বাবা এসেই সব ওলোটপালোট শুরু ক'রেছেন। মা এক চাকর রেখেছিলেন নিবারণ ব'লে—এক্কেবারে হাবা, দরজাটাও খুলতে জানে না—বাবা তাকেও তাড়িয়েছেন। বেশ করেছেন—মা তো আজকাল সংসারের কিচ্ছু দ্যাখেন না, আর হাজার হোক্‌, পুরুষের বুদ্ধির কাছে কি মেয়েমানুষের বুদ্ধি!'

'এটা কী বললে! তুমিও তো মেয়ে।'

'হ'লামই বা। পুরুষের বুদ্ধি তো বেশিই—অন্তত হওয়া উচিত। আমি যাকে বিয়ে করবো সে যদি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান না হয় তাহ'লে আমি তাকে বিয়েই করবো না।'

সাম্প্রতিক সাধু সংকল্প ভুলে গিয়ে, বরাবরকার অভ্যেসমতো ঝোঁকের মাথায় যা মুখে এলো তা-ই ব'লে ফেললো বুলি। ব'লেই

রীতিমতো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো তার মুখ, অল্প আলোতেও তা ধরা পড়লো নিরঞ্জনের চোখে।

বুলির অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য নিরঞ্জন হালকা সুরে বললে, 'বিয়ে তোমার যার সঙ্গেই হোক্, তাকেই তোমার মনে হবে জগতের সব.চেয়ে বুদ্ধিমান লোক—সুতরাং ভেবো না।'

এমন একটা সাংঘাতিক অপবাদে বুলির আত্ম-শ্লাঘায় এমন ঘা লাগলো যে এইমাত্র একটা অনুচিত কথা ব'লে ফেলে যে-লজ্জা সে পেয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'ককৃখনো না! বোকা মানুষ আমি এক্কেবারে সইতে পারিনে—সে স্বামীই হোক্ আর যা-ই হোক্।'

নিরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, 'আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কি ?'

'কী কথা ?'

'তোমার বাবা তো মাষ্টার মশাইকে জবাব দিলেন। কিন্তু তোমার পড়াশুনো চলবে কেমন ক'রে ?'

'চলবে না। পড়াশুনো বন্ধ। বাবা বলেছেন ইস্কুল থেকেও আমাকে ছাড়িয়ে আনবেন। জ্যামিতি নেই, ভূগোল নেই, ব্যাকরণ-কৌমুদী নেই—ডু ফুর্তি!' হেসে হাত-তালি দিয়ে উঠলো বুলি।

'বাঃ, মুখ্যু হ'য়ে থাকবে ?'

'হ'লামই বা। মুখ্যু হ'লেই কি বোকা হয় ? একজন বুদ্ধিমান মূর্খ, আর একজন বোকা পণ্ডিত—এর মধ্যে কে ভালো আপনার মতে ?'

এই কূট তর্কের সামনে প'ড়ে গিয়ে নিরঞ্জন হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজে পেলে না। একটু পরে বুলিই আবার বললে, 'তাছাড়া এবার আমি বাবার সঙ্গে নাগপুর চ'লে যাচ্ছি। সেখানে গাছে চড়া, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, দৌড় প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম চর্চা করবো।'

বুলির মুখের ভাষা শুনে নিরঞ্জনের হেসে ওঠা উচিত ছিলো, কিন্তু তার হাসি পেলো না। বরং গলার স্বর একটু যেন নিচুই শোনালো, যখন জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার বাবা কবে ফিরছেন?'

'মাসখানেক পরে।'

'ও, মাসখানেক,' নিরঞ্জনের স্বর স্বাভাবিক পরদায় ফিরে এলো। 'আমিও মাসখানেক আছি। এ ক'দিন আমি তোমাকে পড়িয়ে দিই— কী বলো? একেবারে ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য তৈরি।'

'আমি আপনার কাছে পড়বোই না।'

'কেন বলো তো?'

'আপনাকে দেখলেই গল্প করতে ইচ্ছে করবে। পড়া হবে না।'

'ভেবে ছাখো—খুব ভালো একজন মাষ্টার হাত-ছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে।'

ঘাসের একটা ফলা ছিঁড়ে দাঁতে কাটতে-কাটতে বুলি বললে, 'চলুন এবার ঘরে গিয়ে বসি।'

'চলো।' নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। 'অরুণের খোঁজটা করা যাক্।'

'আজ কিন্তু চট ক'রে পালাতে পারবেন না। চা খেতে হবে, আরো অনেকক্ষণ গল্প করতে হবে, তারপর—

'তারপর?'

'আহা—এক সময় তো যাবেনই।'

দু'জনে যখন বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, সিঁড়ির মাথায় আবছা দেখা গেলো মিনিকে। তারা একটু দূরে থাকতেই সে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'বুলি! কী করছিলি এতক্ষণ?'

'এই তো নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

মিনি যেন নিরঞ্জনকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললে, 'এ কী! আপনি! আজ আবার আপনার দেখা পাবো আশা করিনি। কী সৌভাগ্য আমাদের!'

'সৌভাগ্য আপনাদের হ'তে পারে, কিন্তু আমার কত বড়ো দুর্ভাগ্য যে আপনার দেখা আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না।'

তিনজনে এগুলো বসবার ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসে বুলি হঠাৎ থেমে বললে—'একটু বসুন, আমি এক দৌড়ে চায়ের কথা বলে আসি।'

সত্যি-সত্যি দৌড় দিলে সে।

নিরঞ্জন বললে, 'দয়া করে অরুণকে একটু ডেকে দেবেন?'

দরজার বাইরে আলো কম, মিনির মুখ ভালো ক'রে দেখা গেলো না; দেখা গেলে নিরঞ্জনের মনে তক্ষুনি কোনো সন্দেহ জাগতো।

'দাদা বাড়ি নেই।'

'বাড়ি নেই!'

'কেন, এতে এত অবাক হবার কী আছে? বাড়ি থেকে কি কেউ বেরোয় না?'

অন্যায় তিরস্কার হজম ক'রে নিরঞ্জন বললে, 'না, আমাকে বলেছিলো কিনা এ-সময়ে থাকবে।'

'আপনার সঙ্গে দাদার দেখা হয়েছিলো?'

মিনির কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো যা খট্‌ ক'রে নিরঞ্জনের কানে বিঁধলো। বুলিও ঠিক এই স্বরেই বলেছিলো —যেন দাদার সঙ্গে দেখা হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। মনের ভাব চেপে গিয়ে শুধু বললে, 'হয়েছিলো।'

যে-কারণে বুলি দাদার প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেয়েছিলো, ঠিক সেই

কারণেই মিনিও আর-কিছু বললে না। নিরঞ্জনই আবার বললে, 'আমার একটু দরকার ছিলো ওর সঙ্গে। কখন বেরিয়েছে?'

মিনি ক্ষীণ গলায় বললে, 'দুপুরবেলাই বেরিয়েছে।'

'তাহ'লে এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে। একটু অপেক্ষা করি।'

এ-কথার উপর মিনি কী বলবে ভেবে পেলো না। এ-কথা তো বলা যায় না যে সারা রাত অপেক্ষা করলেও দাদার দেখা পাওয়া যাবে না—কাল আসবেন, তাও বলতে মিনির অনিচ্ছা। এমনি মনের অবস্থায় হঠাৎ অন্য একটা কথা মিনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'আচ্ছা, একটা কথা জিগেস করি আপনাকে। বুলি নেহাৎ ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে আপনার এত কী কথা?'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'আমিও যে ছেলেমানুষ আছি এখনো।'

এর উত্তরে মিনি হয়তো কিছু বলতো, কিন্তু তক্ষুনি বুলি ফিরে এলো।—'এ কী! আপনারা যে এখনো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন! চলুন, চলুন, ঘরে গিয়ে বসি। বেশ লোক তুই মিনি, কেউ এলে বসতেও বলিস না। একটু পরে হীরাবাই বরোদকারের গান আছে, দিল্লিতে—শুনবেন?'

চা খাওয়া হ'লো, শোনা হ'লো রেডিওতে গান, তারপর নিরঞ্জন যখন ভাবছে মিনিকে কি বুলিকে এখন গাইতে অনুরোধ করা উচিত কিনা (পুরাকালে এ-বাড়িতে সংগীতের চর্চা ছিলো), এমন সময় একটি চোখ-ঝলসানো পাড়ের ধুতি আর ইঁটের রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি পরে অরিন্দম এসে সে-ঘরে ঢুকলেন।

নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।

—'বাঃ, তোমরা বেশ জমিয়েছো তো। একটু আগে ভারি সুন্দর গান হচ্ছিলো। তুই গাইছিলি, বুলি ?

বুলি হা-হা ক'রে হেসে বললে, 'ও-গান যদি তোমার আমার গান ব'লে ভুল হয়, বাবা, তাহ'লে জীবনে তোমার কোনোদিন আর গান না শোনাই উচিত।'

'ও, বুঝেছি। রেডিওর গান। তা যা-ই বলিস, তোর গান কি খারাপ ? আমার কানে তো ও-রকম মিষ্টি আর কারো গানই লাগে না।'

এবার বুলি একা নয়, মিনিও হেসে ফেললো, নিরঞ্জনের ঠোঁটেও ফুটলো হাসির রেখা। অরিন্দম আবার বললেন, 'এমন যে অতুলনীয় গান তা শোনবার সৌভাগ্য খুব বেশি হয় না, এই যা দুঃখ।...এই যে, নিরঞ্জন, কেমন আছো ?'

নিরঞ্জন বিনীতভাবে বললে, 'আপনি কেমন আছেন ?'

'করাচি না কোয়েটা না কয়ম্বাটোর কোথায় না ছিলে তুমি ?'

'লাহোরে ছিলুম। যাচ্ছি বর্মা।'

অরিন্দম হেসে উঠলেন, 'এক্কেবারে লাহোর থেকে বর্মা—বেশ, বেশ! বর্মাতে কোথায় ?'

'ভামোর দু'শো মাইল উত্তরে চীনসীমান্তের কাছাকাছি নতুন একটা তেলের খনি বেরিয়েছে—সেখানে পাঠাচ্ছে।'

'খুব ভালো। খুব খুশি হলাম শুনে। বাঙালির এই যে কুনো স্বভাব—এতেই আমাদের সর্বনাশ হ'লো। সুখে শান্তিতে থাকবার মতো জায়গা নয় ওটা, কিন্তু শিকারীর স্বর্গ। ভামো পর্যন্ত গিয়েছি, তার উত্তরে আর যাওয়া হয়নি। একদিন গিয়ে হাজির হবো, দেখবে।'

'বেশ তো। আপনার খুব ভালো লাগবে ওখানে। পাহাড়, জঙ্গল, সাপ, হাতি এ-সব ছাড়া ওখানে কিছু নেই, শুনেছি।'

সাপ যদি কামড়ায়!'

অরিন্দম বললেন, 'তা কলকাতায়ও তো যে-কোনোদিন গাড়ি-চাপা পড়ার ভয়।...আচ্ছা, বোসো তোমরা। বুলি, আমি একটু নিউ মার্কেটে যাচ্ছি। তুই যাবি?'

'হ্যাঁ, বাবা, যাবো।' বুলি উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। বাবার সঙ্গে বেরুনো এখনো তার জীবনের স্বর্গসুখ। মার্কেটে গেলে বহু উপ-ঢৌকন তো মিলবেই, তাছাড়া সল্টেড অ্যালমণ্ডস্, ক্রীমরোল, আইসক্রীম—যা চাই। 'একটু বোসো, বাবা, আমি এক দৌড়ে কাপড়টা বদলে আসি।' অন্য কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুলি দুমদাম শব্দে উঠে গেলো দোতলায়।

'নিরঞ্জন, বোসো,' ব'লে অরিন্দম নিজেও বসলেন। একটু দ্বিধা ক'রে বললেন, 'তুইও যাবি, মিনি?'

মিনি বললে, 'বাবা, আমার তো অনেক কাজ।'

'জানি সে-কথা। তা তুই মাঝে-মাঝে তোর বৌদিকে নিয়ে এখানে-ওখানে একটু বেড়িয়ে আসতে তো পারিস। ঐ ঘরটুকু ছেড়ে ও তো নড়েই না। টাটুর জন্যে নর্স ঠিক করলাম তো এইজন্যেই, অথচ—'

অরিন্দম কথাটা শেষ করলেন না। নিচে নামবার আগে। উজ্জ্বলাকে তিনি বলেছিলেন, 'চলো আমার সঙ্গে বেড়াবে—যাবে? উজ্জ্বলা হাঁ বলেনি, না বলেনি, চুপ ক'রে ছিলো, কিন্তু মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলো তার। অরিন্দম বুঝলেন, নর্সই আসুক আর যে-ই আসুক, ছেলেকে ফেলে নড়তে সে নারাজ, অথচ শ্বশুরের কথাও ফেলা যায় না, অরিন্দম আর-একবার বললেই জমকালো শাড়ির প্রহসনে নিজেকে মুড়তে শুরু করবে। কাজেই তিনি পরমুহূর্তেই বললেন, 'থাক্, তুমি না:

গেলে।' উজ্জ্বলার মুখের বিবর্ণভাব তবু কাটলো না—শ্বশুর কি রাগ করলেন ?

— মূঢ় ! মূঢ় !

বৌদিকে নিয়ে বাবা সত্যি একটু বাড়াবাড়ি করছেন, মিনি ভাবলে নিজের মনে। সারাদিন বাড়ির মধ্যে আর যেন কোনো মেয়ের কাটে না ! আর ঐ নর্স রেখেই মনে করছেন সব সমস্যা চুকলো ! মনে করেন টাকা দিয়ে সব জিনিসই কেনা যায়—সেবা, স্নেহ, সব। রুগ্ন শিশুর পরিচর্যা করবে ভাড়া করা নর্স, আর মা কিনা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে ! এ-সব হচ্ছে বিলেতি বিকার—তা ছাড়া আর কী ! ছেলের অসুখ, স্বামী অমানুষ, মনে বৌদির কত কষ্ট, এই তো তাঁর হাওয়া-খাওয়ার সময় ! বাবার এমন ছেলেমানুষি বুদ্ধি ! কিচ্ছু বোঝেন না !

মুখে বললে, 'বৌদি মোটে বেরোতে চান না।'

'সেইজন্যেই তো জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে মাঝে-মাঝে।'

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'লো। হৈমন্তী দুপুরে একবার ফিরেছিলেন ; খেয়ে-দেয়ে, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম ক'রে আবার গেছেন, তবে গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তক্ষুনি।

অরিন্দম নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও-পাড়ায় তোমার কোনো দরকার থাকলে আসতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

নিরঞ্জন কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'অরুণের সঙ্গে একটু দরকার ছিলো—'

'অরুণের সঙ্গে !'

'ভাবছিলুম আরো একটু অপেক্ষা করবো কিনা—যদি এসে পড়ে।'

'অরুণের সঙ্গে তোমার দরকার ?'

অরিন্দমের প্রশ্নের সুরে নিরঞ্জন একটু ঘাবড়ে গেলো। অরুণের কথা উঠলেই এ-বাড়ির সবাই এমন অদ্ভুতভাবে কথা বলে কেন ?

'বিশেষ-কিছু না, তবে—ও বলেছিলো কিনা আমাকে আসতে।'

'ও।'

আরো অনেক প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হ'লো অরিন্দমের, চেপে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'তোমার যা দরকার তা যদি আমাকে দিয়ে চলে, তাহ'লে আমাকেও বলতে পারো।'

নিরঞ্জন ভয়ানকরকম কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, 'না—না—দরকার তেমন-কিছু না—আর অরুণ যখন দুপুরবেলা বেরিয়েছে এক্ষুনি হয়তো ফিরবে।'

মিনির সঙ্গে অরিন্দমের একবার চোখোচোখি হ'লো। মিনি বললে, 'বলা যায় না—ফিরতে অনেক রাতও হ'তে পারে।'

'হ্যাঁ, ওকে তো দেখলুম ওর ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমাকে নিজেই বলেছিলো বিকেলের দিকে থাকবে। হয়তো কাজের তাড়ায় দেরি হচ্ছে।'

নিরঞ্জনের এ-কথার উপরে কেউ কিছু বললে না দেখে তার অস্বস্তির ভাবটা আরো বেড়ে গেলো। তিনজনেই চুপচাপ, এমন সময় মিশকালো জমির উপর রুপোলি বুটি তোলা একখানা ঢাকাই জামদানি প'রে, আড়াই ইঞ্চি হীলের খটখট শব্দে মেঝেতে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে বুলি ঘরে ঢুকে বললে, 'চলো।'

অরিন্দম হেসে বললেন, 'দারুণ সেজেছিস তো!'

'ওঃ, একখানা শাড়ি পরলেই বুঝি সাজা হ'লো! আমি ও তো ভুরুতে পেনসিল, গালে রুজ, নখে রং এ-সব কিছুই লাগাইনি।'

'ও-সব লাগাস নাকি তুই?'

'সব মেয়েই লাগায় আজকাল—আমিও শুরু করবো। মার্কেট থেকে আজই আমাকে কিনে দেবে সব।'

নিরঞ্জন বুলির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এমনিতে বুলি বড্ড এলোমেলোভাবে থাকে, হয়তো চুলও আঁচড়ায় না,

শাড়ির আঁচলটা হয় কোমরে জড়ানো, নয় মেঝেয় লোটানো, হাতে কয়েকটি কাচের চুড়ি ছাড়া কিছু গয়না পরে না, কানে দুল পর্যন্ত না, গরমের দিনে পা খালিই থাকে, আর তাতে ধুলোমাটিও কম থাকে না —মোটের উপর বালিকার সহজ ভঙ্গিরই সে প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে চলতে কি বলতে ভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টায় নিরন্তর ঘামতে হয় না, আটপৌরে স্বচ্ছন্দতায় মন আরাম পায় তার কাছে। সে যে দেখতে ভালো, সে-বিষয়ে সচেতন হবার অশান্তি ভুগতে হয় না কখনো।

কিন্তু এখন নিরঞ্জনের চোখে বুলি সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগলো, যেন ঐ কালো শাড়িটি প'রে সে আলাদা মানুষ হ'য়ে গেছে। উঁচু হীলে তাকে অনেকটা বেশি লম্বা দেখাচ্ছিলো, আঁটো জামা-কাপড়ে শরীরও দেখাচ্ছিলো ভরা-ভরা—সে যে যুবতী, এমনকি সে যে সুন্দরী এ-কথাটা বড়োই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। প্রথমে এসেই তার এই চেহারা দেখলে নিরঞ্জন এমন অবাধে তার সঙ্গে মিশতে পারতো না, এমনকি আগেকার মতোই তাকে 'তুমি' বলতেও তার দ্বিধা হ'তো।

অরিন্দম উঠে দাঁড়ালেন।—'তুমি তাহ'লে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো না, নিরঞ্জন?'

বুলি বললে, 'চলুন না আপনিও। বেশ হবে, খুব মজা হবে। তুইও চল্ না মিনি।'

মিনি বললে, 'আপনি ইচ্ছে করলেই কিন্তু এদের সঙ্গে যেতে পারেন। দাদাকে আমি না-হয় ব'লে রাখবো—আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে। কিন্তু অরুণের সঙ্গে তার আজই দেখা হ'লে ভালো হয়—ও যখন বলেছে, তখন টাকাটা নিয়েই যাওয়া যাক্। একটা দুর্বল মুহূর্তে কোম্পানির একশো টাকা দিয়ে ফেলে'

হয়তো অল্পের জন্যই অরুণের সঙ্গে দেখা হবে না।

তাই সে বললে, 'আমি বরং একটু বসি।'

অরিন্দম বেরিয়ে গেলেন বুলিকে নিয়ে, মিনিও বারান্দা পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে গেলো। একা ঘরে ব'সে নিরঞ্জন গাড়ির স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনলে।

একটু পরেই মিনি ফিরে এলো। নিরঞ্জন বললে, 'আপনার কাজের ব্যাঘাত করতে চাইনে, দয়া ক'রে আমাকে এ— মাসিকপত্রটত্র কিছু দেবেন?'

'আপনার ডান দিকের টেবিলে আছে কয়েকটা।'

নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে নিলে একটা মাসিকপত্র। তারপর বললে, 'আপনার কাজের খুব বেশি ব্যাঘাত যদি না হয় তাহ'লে একটু বসতেও পারেন।'

নিরঞ্জন চোখ তুলে তাকালো, কিন্তু মিনির সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো না। এই সুযোগে সে তার চোখকে একটু বিশ্রাম করতে দিলে সুন্দর একটি মুখের উপর। একটু আগে বুলির যে-উজ্জ্বল মূর্তি দেখেছিলো তার ছাপ স্পষ্ট ছিলো তার মনে। এ-বাড়িতে চিরকাল মিনির সৌন্দর্যেরই খ্যাতি, কিন্তু বুলি হঠাৎ বেড়ে উঠেছে যেন কোনো লম্বা তরুণ গাছ—গাছ জ্যামিতি মানে না, কিন্তু ছন্দ মানে; তেমনি বুলির চেহারাতেও খুঁত অনেক, রূপের চেয়ে ভঙ্গিটাই তার বড়ো। মিনির মসৃণ, ফর্সা, গোল ছাঁদের মুখ, ঈষৎ নীলাভ চোখ, প্রকাণ্ড লম্বা ঘন কালো চুল, যা এখন সে বিরাট খোঁপায় বাঁধেনি, পিঠের উপর দিয়ে নিতান্ত বেপরোয়াভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে—সবই তার সুন্দর। যেন ছবি। মিনির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিরঞ্জনের মনে হ'লো, একটু বিশেষ অর্থেই সে ছবির মতো, ছবির যেমন ভাবান্তর নেই, মিনিও

তেমনি বিশেষ একটিমাত্র ভঙ্গিতেই নিজেকে সংকীর্ণ ক'রে এনেছে যেন। একটি শান্ত, আত্ম-নিবিষ্ট প্রতিমার মতো ক'রে নিজেকে গড়ছে সে। গড়ছে কঠোর চেষ্টায়, আর সেই চেষ্টা ছায়ার মতো তার সমস্ত সৌন্দর্যের উপর অলক্ষিতে ছড়াচ্ছে।

মিনি বসলো না; 'আসছি', ব'লে চ'লে গেলো। কোনো দরকার নেই, জোয়াত আলির চেয়ে রান্না সে ভালো জানে না, তবু গেলো রান্নাঘরে মটন্-চপের তদারক করতে। আইস-ক্রীম তৈরি হ'লো কিনা সেটাও দেখে আসবে একেবারে।

নিরঞ্জন অগত্যা মাসিকপত্রেরই পাতা ওল্টাতে লাগলো। এতক্ষণে একটু দেখা হ'লো—তবু হ'লো না। অরুণ যে টাকা ধার নিয়ে আজই আবার আসবার সুযোগ তাকে দিয়েছিলো, এতে তখনকার মতো মনে-মনে একটু খুশিই হয়েছিলো সে। বুলি অনধিগম্য নয়, তাই তার জন্য চকোলেট কিনলো; সারা রাস্তা এই ভাবতে-ভাবতেই এসেছিলো যে মিনি হয়তো আজ একটু সহজ ব্যবহার করবে। মনে পড়লো মিনির চিঠিগুলো—যা সে স্যুটকেসের লাইনিং-এর ফাঁকে দেশদেশান্তর ব'য়ে বেড়াচ্ছে। তার চাকরিতে বড্ড খাটুনি, লেখাও তার সহজে আসে না, পত্রবিনিময় তাই খুব বেশিদিন চালাতে পারেনি। উপস্থিতের প্রভাব অনুপস্থিতের চাইতে সর্বদাই বেশি প্রবল; পেট্রোল কোম্পানির কাজে—যাতে কায়িক শ্রমের অংশই বেশি—আর সাধারণ আমোদে হু-হু ক'রে দিনগুলো কেমন ক'রে কেটে গেছে ভালো ক'রে টেরও পায়নি। তবু তার মনের পটভূমিতে মিনির মুখই আঁকা ছিলো সব চেয়ে উজ্জ্বল রঙে, ও-রূপের তুলনা ছিলো না তার চোখে; পঞ্জাবি মেয়েদের উদ্ধত, মাংসল রূপ—এমনকি কাশ্মিরি তরুণীর অপরূপ দেহশ্রী যখন সে দেখেছে, তখন—চোখে নেশা লাগেনি এ-কথা বলা নেহাৎ মিথ্যে, কিন্তু সে বিদ্যুৎ-আভা বিদ্যুতের মতোই চকিতে মিলিয়েছে, রেখে গেছে একটি পূর্ণিমার অখণ্ড

আত্মা। এ তার নিজের সঙ্গে ছলনা নয়; চব্বিশ বছরের যুবক প্রথম যখন প্রেমে পড়ে, তখন তার প্রেয়সীর তুলনায় অন্ত-কোনো মেয়েই যে গ্রাহ্য নয়, এ-বিশ্বাসই হয় তার আত্ম-সম্মানের নির্ভর। তারুণ্যের এ-একনিষ্ঠতায় কিছু যে বোকামি আছে তা অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধরা পড়ে; কিন্তু এও সত্য যে লাহোরের মতো প্রলোভনের জায়গায় থেকেও এই নিঃসঙ্গ প্রবাসী যুবক যে কোনো ভ্রান্তিতে ডোবেনি তার কারণ মিনিরই মুখ। সুযোগের অভাব কোনো দিকেই ছিলো না। ইঙ্গভাবাপন্ন মহলে বন্ধু-বন্ধুনি জুটেছিলো, ভালো টেনিসখেলোয়াড় ব'লে লোকে কিছু খাতিরও করেছিলো তাকে, লাঞ্চ কি ডিনারের নিমন্ত্রণ আসতো মাঝে-মাঝে। এমনি এক ভোজের সভায় ভ্রাম্যমাণ গোবিন্দ তাকে আবিষ্কার করে, এবং কলকাতায় ফিরে যথোচিত উৎসাহের সহিত অরুণকে সেটা বলে, এবং অরুণ বলে মিনিকে। কথাটা শুনে মিনি কী ভেবেছে কে জানে! তুচ্ছ কথা—এতদিনে হয়তো ভুলে'ও গেছে; তবু—যে-রঙে খবরটা তার কানে পৌঁচেছে তা যে নিতান্ত অলীক, এ-কথাটা কোনো সুযোগে মিনিকে জানিয়ে দেবে এমন একটা দুরাশাও বাসা বেঁধেছিলো তার মনে। এ-বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকেই চোখে পড়লো লনের এক কোণে বুলি আছে শুয়ে লম্বা হ'য়ে, আর কুকুরটা তার চারদিকে ঘুরে-ঘুরে কুঁই-কুঁই করছে। দৃশ্যটা দেখেই কৌতূহল জাগলো নিরঞ্জনের, বাড়ির ভিতরে না গিয়ে ওখানেই গেলো—ভাবলে, চকোলেটের বাক্সটা বুলির হাতে একেবারে দিয়েই যাই। কথায় কথা বাড়লো—নেহাৎ মন্দ লাগে না বুলির সঙ্গে গল্প করতে। হ্যাঁ—ড্রয়িংরুমের মূল্যবান আসবাবে শক্ত হ'য়ে ব'সে আত্ম-সচেতন কথোপকথনের চাইতে সন্ধ্যার মিলিয়ে-আসা আলোয় ভিজে সবুজ ঘাসে পা ছড়িয়ে ব'সে বুলির সঙ্গে হালকা আলাপ বরং ভালোই লাগছিলো। থেকে-থেকে মনে হচ্ছিলো মিনি হয়তো এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে,

মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিলো বাড়িটার দিকে—'তোমার দিদি কোথায় ?' বুলিকে এ-কথা দু' তিনবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেছে। কেমন একটা চাপা অভিমান জ'মে উঠছিলো তার বুকের মধ্যে, বেশ একটা আক্রোশ, তার ভাষা নেই ব'লেই তার জ্বালা বেশি—এক-একবার এ-ও মনে হচ্ছিলো যে মিনির সঙ্গে আজ যদি একেবারে দেখা না হয়, তাহ'লেই হয় ভালো।

আর সত্যি, এর চেয়ে ঢের ভালো ছিলো একেবারে দেখা না-হওয়া !

এদিকে মিনি রান্নাঘরে অকারণে দেরি করলো অনেকক্ষণ। ড্রয়িংরুমে নিরঞ্জন ব'সে আছে, এ-কথা কেন ভুলতে পারছে না সে ? দাদার খোঁজে এসেছে—ব'সে থাক যতক্ষণ ইচ্ছে—এক সময় বিরক্ত হ'য়ে উঠবেই। আবার এসেছেই বা কেন ?—অরুণের সঙ্গে দরকার, ও তো একটা অছিলা মাত্র, এ-সময়ে দাদা আবার বাড়ি থাকে কবে ! দাদার স্বভাব ও কি জানে না—ও-ও তো সেই দলেরই ! সমস্ত পুরুষ জাতটার উপরে একটা অশ্রদ্ধায় মিনির শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। পশু—সকলেই ওরা পশু, উপরের পালিশটা কারো একটু বেশি চকচকে, কারো বা একটু কম, এই যা তফাৎ। মিনি ওকে কালই দিতে পারতো বিদেয় ক'রে—ঐ বুলিটাই বাধালো গোলমাল। যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, এখন আর এ-সব ছেলেমানুষি ওর সাজে না। ওর উৎসাহেই তো আবার এসেছে নিরঞ্জন—আর এমন বেহায়া, বাড়ির ভিতরে না এসে লন্-এ ব'সে বুলির সঙ্গে গল্প ! যেন বুলি ওর কত বড়ো গল্প করবার পাত্র ! ঐটুকু মেয়ে. দু' বছর আগে ওকে তো মানুষের মধ্যেই গণ্য করতে দেখিনি, আজ দেখছি বুলির সঙ্গেই বেশ আড্ডা জমে !

নিরঞ্জন যাতে এ-বাড়িতে আর না আসে সে-ব্যবস্থা করতে হবে। করতে হবে মিনিকেই। বাড়িও এমন—কোথাও কোনো শাসন নেই, বাধা নেই, যে-কোনো লোক যাচ্ছে আসছে, যার যা খুশি করছে। বাবা

যখন কলকাতায় ছিলেন এ-বাড়িতে ছিলো জমজমাট আড্ডা, মা-বাবার বন্ধু, ছেলের বন্ধু, মেয়েদের বন্ধু—সব মিলে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ের যাওয়া-আসা ছিল। সন্ধে বেলায় চা হ'তো কম ক'রেও পঁচিশ পেয়ালা। ও-সব হৈ-চৈ তখন যে ভালো লাগতো কেমন ক'রে তা ভেবে মিনির বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে এখন। বাবা বদলি হ'য়ে চ'লে গেলেন, আড্ডা গেলো ভেঙে, এক নিরঞ্জনই পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি, তারপর একদিন সে-ও গেলো চ'লে। আর তারপরেই মা-মহামায়ার শান্তির স্পর্শ লাগলো বাড়িতে—দাদা তো বাড়িতে থেকেও নেই—একটি মধুর শান্তির পরিমণ্ডল আস্তে-আস্তে গ'ড়ে উঠলো। সে-নির্মল আবহাওয়া বাবা ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবিল হ'য়ে উঠেছে—মিনি সেটা বেশ টের পাচ্ছে। কাল রাত্রে মা-র সঙ্গে বাবার কী হয়েছে কে জানে—বাবার উদ্দাম ফুর্তিটা আজ যেন আর নেই—সে-রকম আসুরিক আহারও করেননি দুপুরবেলা; তাছাড়া এক কথায় বুলির মাষ্টার আর নিবারণকে জবাব দেয়া—সেটাও ভালো করেননি। মা তো সারাদিন বাড়িই নেই—একবার যা এসেছিলেন, কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলেননি—মিনির সঙ্গেও না। ভিতরে-ভিতরে কী একটা অশান্তি যেন ঘনিয়ে উঠছে—মিনির ভালো লাগে না। বাবারই দোষ—মা যা বোঝেন সেটাই যে সব চেয়ে ভালো এই সহজ কথাটা বাবা বোঝেন না কেন?

তার উপর নিরঞ্জন।

আজ সকালে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মিনির দু' একবার মনে পড়েছে নিরঞ্জনকে, মনে পড়েছে দু'বছর আগেকার দু'একটি দিন। অত্যন্ত রাগ হয়েছে নিজের উপরেই। দু'বছর আগেকার মিনি যে আর নেই, মা-র করুণায় তার যে নতুন জন্ম হয়েছে, এ-কথা কতবার যে বললে নিজের

মনে! গুনগুন ক'রে গাইলো দু'এক লাইন কীর্তন—মায়া-মন্দিরে শোনা—তার ভাবটা খুব সোজা ভাষায় এই, প্রভু, তুমিই আমার সব। তারপর স্নানের পরে বসলো মা-মহামায়ার ছবির সামনে ধ্যানে; অনেকক্ষণ আসনপিঁড়ি হ'য়ে চোখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে থেকে-থেকে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধ'রে গেলো, কিন্তু মনে তার ভারি একটি শান্ত পবিত্র ভাব এলো। অনেক উর্ধ্বে—সংসার-নরকের অনেক উর্ধ্বে সে। বোজা চোখে সে যেন দেখতে পেলো মা-মহামায়া তার দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। কী অপরূপ হাসি। মা, আমাকে পূর্ণ করো তুমি, তোমার লাবণ্যে আমাকে ভ'রে তোলো, সেই জীবন আমাকে দাও যা জন্মমৃত্যুর আবর্তনে বাঁধা নয়। (কী সুন্দর কথা!—মা-মহামায়া যখন বুঝিয়ে বলেন কানে যেন মধু ঝরে।) তুচ্ছ সুখদুঃখ থেকে মুক্ত করো আমাকে, মগ্ন করো সেই আনন্দে যার নির্ভর বাইরের ঘটনা নয়, মনের অবস্থাও নয়, যা স্বতঃই উৎসারিত, যা চির অচঞ্চল। মা, মা।

শেষের কথা দুটো মিনি শব্দ ক'রেই উচ্চারণ করলে। তারপর সেই ছবির ঠাণ্ডা কাচে মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরার জন্য খানিকক্ষণ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটলো বটে, কিন্তু তার প্রার্থনা মা বোধ হয় শুনেছিলেন, সারা দিন তার মনের মধ্যে কোন এক রাগিণী যেন বেজেছে যা কানে শোনা যায় না অথচ জীবন ভ'রে রাখে। সে-সুর একবার যে শুনেছে তার কাছে অন্য সব মিথে।

কিন্তু সন্ধেবেলা যেই সে দেখলো বুলির সঙ্গে নিরঞ্জন লন্ পার হ'য়ে বাড়ির দিকে আসছে, তক্ষুনি সুর গেলো কেটে। নিরঞ্জন কখন এসেছে সে জানতে পায়নি। নিরঞ্জন এ-বাড়িতে এসেছে, অথচ তার খোঁজ করেনি, এই সামান্য ঘটনায় সেই কানে-না-শোনা গভীর বীণার একটা তার যেন ছিঁড়ে গেলো। বাস্তবিক, বুলিকে নিয়ে আর পারা যায় না! সভ্যতা নেই, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নেই। নিরঞ্জন লোক

ভালো নয় এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কী, লাহোরে নানা ীতি ক'রে এবার এসেছেন এই কচি মেয়েটার মাথা খেতে! ওর খপ্পর থেকে বাঁচাতেই হবে বুলিকে—কাজটা অপ্রিয় ব'লেই মিনি যদি পেছোয় তাহ'লে ধিক্ তার এতদিনের শিক্ষাকে! প্রথম সুযোগেই সে তাই নিরঞ্জনকে কথাটা বলতে ছাড়েনি, কিন্তু নিরঞ্জন তার যে-রকম নির্লজ্জ উত্তর দিয়েছিলো তা শুনে রীতিমতো স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো মিনি। তা হোক্, মিনি হার মানবে না; যে ক'রেই হোক এ-কথা ঐ লোকটার মাথায় ঢোকাতেই হবে যে এ-বাড়িতে তার আর আসবার কোনো দরকার নেই।

মিনি আবার যখন বসবার ঘরে ঢুকলো, রান্নাঘরের তাপে মুখ তার লাল, কপালে কয়েকটি ঘামের ফোঁটা চিকচিক করছে।

—'আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম।'

'আমাকে!' ব্যাপারটা যেন একেবারেই অসম্ভব, এই রকম একটা ভাব নিরঞ্জনের মুখে ফুটলো।

হঠাৎ মিনির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। কী বলবে সে? কী ব'লে আরম্ভ করবে? কোনো মানুষের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার সে কখনো করেনি, কাউকে মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলেনি, স্বভাবত সে নম্র, খুশি করবার ইচ্ছা তার মজ্জায় গাঁথা। তাকে চুপ দেখে নিরঞ্জন আবার বললে, 'কী বলবেন?'

না, এ-দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না; সাধারণ ভদ্রতার চাইতে বুলির ভবিষ্যতের দাম অনেক বেশি। তবু সে আরো একটু দ্বিধা করলে, এবং এই সুযোগে প্রথম কথা নিরঞ্জনই হঠাৎ ব'লে ফেললো: 'আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছেন?'

এ-কথা শুনে মিনির মনে যা হ'লো মুখেও তা-ই বললে, 'আপনার তো খুব সাহস দেখছি।'

'আমাকে অনেকে অনেক কারণে পছন্দ করে, কিন্তু আমি একজন খুব সাহসী পুরুষ এ-কথা এই প্রথম শুনলুম।'

নিরঞ্জন প্রথম কথা ব'লে মিনির সুবিধেই ক'রে দিলে; এর পর সে অনায়াসেই বললে, 'আরো হয়তো কোনো-কোনো কথা প্রথমবার শুনবেন।'

'আমার সন্দেহটা যে সত্যি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কারণটা কী জানতে পারি?'

একটু চুপ ক'রে থেকে মিনি বললে, 'আমিও একটা প্রশ্ন করি। আপনি এ-বাড়িতে আসেন কেন?'

মিনি খুব চেষ্টা ক'রেই বলেছিলো কথাটা, ভেবেছিলো শোনামাত্র নিরঞ্জনের মুখ ম্লান হ'য়ে যাবে, গলা দিয়ে খানিকক্ষণ আওয়াজ বেরুবে না, কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'লো না। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে নিরঞ্জন জবাব দিলে, 'আসি কেন, তা আপনার তো জানা উচিত।'

মানুষ এত নির্লজ্জও হ'তে পারে!

নিরঞ্জন দেখলে মিনি মাথা নিচু ক'রে আঁচলের একটা কোণ আঙুলে জড়াচ্ছে আর খুলছে। একটু পরে সে আবার বললে, 'তবে আপনি যদি বারণ করেন আর না-হয় আসবো না।'

অরুণের কথা, তার প্রাপ্য টাকার কথা ভুলে গিয়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। একটু পরে দেখলে সে বালিগঞ্জের রাস্তায়। ট্র্যামে যখন উঠলো, মনে হ'লো তার বুকের ভিতরটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা।

এদিকে মিনি অনেকক্ষণ ব'সে রইলো ঠিক সেইভাবে, আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছে আর খুলছে। কী গরম, কান দিয়ে যেন আগুনের শিষ বেরুচ্ছে। বাইরে কিসের একটা শব্দে চমকে উঠলো, তারপর সোজা বাথরুমে ঢুকে দাঁড়ালো ঝরনার নিচে—এই ঠাণ্ডা জল যেমন আমার

সমস্ত শরীরে ঝরছে, তেমনি তোমার শান্তি ঝরুক আমার জীবনে। দেখো!

* * *

হৈমন্তী বাড়ি ফিরলেন অনেক রাত্রে।

উজ্জ্বলার ঘরের ফিকে নীল আলো ছাড়া সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দেখলেন বারান্দায় তাঁর স্বামীর খাটে বিছানা পাতা, মশারিও খাটানো, ভিতরে অরিন্দম শুয়েও আছেন। চাঁদ আজ আরো একটু উজ্জ্বল; বারান্দা থেকে জ্যোছনা স'রে যেতে-যেতে রেলিঙের তলায় মোটা একটি নীল লাইন টেনে দিয়েছে, তারই আভায় সমস্তই চোখে পড়ে।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন, 'ঘুমিয়েছো ?'

কোনো সাড়া এলো না।

হৈমন্তী একটু জোরে ডাকলেন, 'শুনছো ? ঘুমিয়েছো নাকি ?'

অরিন্দমের ভারি ও নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো। অঘোরে ঘুমুচ্ছেন তিনি। এখন বাড়িতে ডাকাত পড়লেও বোধ হয় ঘুম ভাঙবে না।

হৈমন্তী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বকাবকি, কথা-কাটাকাটি আজ আর নয়। মশারির বাইরে একটু দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষটাকে তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন। সেই পিঙ্ক রঙের ডোরা-কাটা রেশমি পা-জামা পরনে, একটা পা হাঁটু অবধি উঠে এসেছে, কী লোমশ পা, বোতাম-খোলা কোর্তায় কাঁচা-পাকা লোমগুলি অশোভন রকম প্রকট, উঁচু কণ্ঠা নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে নড়ছে, পুরু ঠোঁট দুটো ঈষৎ খোলা, নাকটা থ্যাবড়া, মাথায় ছোটো টাক, এদিকে গা থেকে ক্ষীণ সুগন্ধ বেরুচ্ছে। দেখে কেমন একটা ন্যক্কার জন্মালো হৈমন্তীর মনে, আসন্ন বার্ধক্যে এই শৌখিনতার প্রহসন—ঐ রেশমি পা-জামায় আর মনোরম গন্ধে

অরিন্দমের সমস্ত মূর্তিটা কেমন কুৎসিত ঠেকলো হৈমন্তীর চোখে। একটু পরেই নিজের ঘরের অনুকূল হাওয়ায় তিনি সহজে নিঃশ্বাস নিলেন, মাত্র একটা খাটে ঘরটাকে অনেক বড়ো ও পরিচ্ছন্ন লাগলো। চোখে পড়লো খাটের পাশে একটা নিচু, গোল টেবিলে অরিন্দমের কিছু জিনিসপত্র র'য়ে গেছে—কয়েকখানা ইংরেজি গোয়েন্দা-নভেল, একটা ফাউন্টেন পেন, পিস্তল, মিনিএচার ক্যামেরা, এই সব টুকিটাকি। ওঁকে আলাদা একটা ঘর দিতে পারলে ভালো হ'তো, ওঁর সব জিনিস-টিনিস নিয়ে আলাদা থাকতেন, বৃষ্টি হ'লে বারান্দায় ছাঁটও আসবে। কিন্তু ঘর আর কোথায়?

যাক্, বাঁচা গেলো, স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এত শিগগির ঘুমিয়ে পড়বারই বা তাঁর কী হয়েছে আজ—এই তো এগারোটা বাজলো। বারোটার আগে তিনি কবে ঘুমোন—ওঠেন তো সেই বেলা আটটায়, এত শিগগির ঘুম আসেই বা কেমন ক'রে। আর কী গভীর ঘুম! ছেলেমানুষের মতো। সারা দিন একটা মানুষ যে বাড়ি নেই সে-ভাবনাও তো একবার হ'তে পারে! আমি না-হয় বচসার ভয়ে ভোর না-হ'তেই বেরিয়ে গেছি, তা উনি তো বচসাই ভালোবাসেন, মন খুলে আমার উপর চোট-পাট করবার জন্যেও তো জেগে থাকতে পারতেন! পেট পুরে খেয়েই টুপ ক'রে ঘুম! আশ্চর্য লোক!

মোতির মা এসে সমস্ত দিনের একটা বিস্তৃত রিপোর্ট দিলে। ডাক্তার ডাকা, নিবারণ ও গোঁসাই ঠাকুরের চাকরি খতম, সন্ধেবেলা একজন সুবেশ যুবকের আবির্ভাব ('ও-বাবুকে আগে কখনো দেখিনিকো'), বুলিকে নিয়ে অরিন্দমের মোটারে বেরুনো—কিছুই বাদ গেলো না। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে আজ মোতির মা-র অতি কুৎসিত মুখ উদ্ঘাটিত, কথার সঙ্গে-সঙ্গে উপযোগী ভাবভঙ্গিতে

সে-মুখ আরো যেন ভয়াবহ হ'য়ে উঠছে। হৈমন্তী এত যে অভ্যস্ত তবু মাঝে-মাঝে তাঁকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। দেখতে যা-ই হোক্, সে হৈমন্তীর এত রকম কাজে লাগে যে তাকে ছাড়া একদিনও চলে না; তাছাড়া হৈমন্তীর মতে গৃহস্থঘরের পরিচারিকা দেখতে ভালো না-হওয়াই ভালো।

সব শুনে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদাবাবু ফিরেছেন?'

মোতির মা অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বললে, 'না মা।' তারপর, কাছাকাছি শোনবার মতো কেউ না-থাকলেও ফিসফিস ক'রে বললে, 'বাবু কি তেনাকে সত্যি-সত্যি তাড়িয়ে দিয়েছেন? কী হবে তবে?'

হৈমন্তী কিছু বললেন না।

'আহা—আপন ছেলে, আপন রক্ত-মাংস, তাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারে কেউ! উঃ, পুরুষ কী পাষাণ গো, মা।'

মোতির মা-র বুক যেন ফেটে যায়।

হৈমন্তী তবু কিছু বললেন না।

সতর্কভাবে ঠাকরুনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মোতির মা আবার বললে, 'তা যাই বলো, মা, বাপ যদি ছেলেকে শাসন না করে, করবে কে! আর বাপেরই কি এতে কম কষ্ট! বুক ফেটে যায় না—হোঃ! বাবুর মুখখানা আজ সারাদিন থমথমে। মন মেজাজ ভালোই নেই, নিবারণকে হুট ক'রে দিলেন জবাব।' একটু থেমে, আবার গলা নিচু ক'রে মোতির মা বললে, 'মা, নিবারণ আবার এসেছিলো।'

'কখন?'

'এই তো সন্ধেবেলা—বাবু যখন বেরিয়েছেন। কত কান্নাকাটি করলে, আমাতে আর ভুবনে তখন তোমার লুচি গড়ছিনু। তোমাকে বড্ড ছেরেদ্দা করে, মা। একটু বোকা হ'তে পারে, মা, তবে মানুষ খাঁটি।'

হৈমন্তী বললেন, 'আমার শাড়িটা তুলে রাখ।'

ভূলুণ্ঠিত শুভ্র গরদের শাড়ি তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে-করতে মোতির মা বললে, 'হোঃ, ওর কান্না দেখে আমারই চোখে জল আসছিলো, মা। তা ভুবন বললে, "অত কাঁদিস কেন, বোকা, মা আমাদের দয়ার পিরতিমে, তাঁর পায়ে গিয়ে ধ'রে পড়।" ও তখন বললে, ভুবন গো! ঐ ছিচরণে পেন্নাম না ক'রে এ-বাড়ি থেকে আমি যেতে পারবো না। একবার ও তোমার দর্শন চায়, মা। ' নিয়ে আসবো ওকে এখানে?' শেষের কথাটা যেন আবেগে একেবারে গ'লে গেলো।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পাবি ওকে?'

মোতির মা উৎসাহিত স্বরে চুপি-চুপি বললে, 'আছে মা, ও রান্নাঘরেই ব'সে আছে।'

হৈমন্তী আকস্মিকভাবে ব'লে উঠলেন 'কেন? রান্নাঘরে কেন? বাবু ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তবু ও এ-বাড়িতে কেন? চ'লে যেতে বল্ ওকে এক্ষুনি।'

কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মোতির মা আর-কিছু বললে না। কথা হয়েছিলো মা-র কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে আবার বহাল করিয়ে দিতে পারলে ও সামনের মাসের মাইনে থেকে দু' টাকা দেবে ভুবনকে আর এক টাকা মোতির মাকে। ঐ এক টাকারও আদ্ধেক আবার ভুবনই অবশ্য লুটে নিতো, কিন্তু এ-হিড়িকে মিন্সের কাছ থেকে দু' গাছা গিল্টি চুড়ি আদায় না ক'রে ও ছাড়তোই না। এমন একটা দাঁও ফসকে যাওয়ায় মোতির মা-র সমস্তটা রাগ গিয়ে পড়লো ভুবনের উপর। পেটুক কিপটে বিটকেল বামুন—এ-পর্যন্ত একখানা গয়না ছোঁয়ালো না, এদিকে পেট-পোরা পিরীত। আসুক্ আজ একবার—দেবো থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে।

* * *

অরিন্দমের এ-বাড়িতে ঘরের সংখ্যা কম, কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরই খুব বড়ো, তাতে আলো-হাওয়াও প্রচুর। মিনি আর বুলি যে-ঘরে শোয় সেটা লম্বা, ছাঁদের, পুব আর পশ্চিমে বরাবর খোলা, কোনাকুনি দক্ষিণ পেয়েছে, আর সেই কোণে সরু লম্বা একটা জানলা আকাশকে যেন ঘরের মধ্যে এনে দিয়েছে। দু' পাশে দুটি খাট দেয়াল ঘেঁষে, দু'কোণে দুটি ড্রেসিং টেবিল, দুটো কাপড় রাখবার দেরাজ, ছোটো একটি ক'রে টেবিল আর চেয়ার প্রত্যেকের জন্যে। স্নানের ঘরের সঙ্গে আছে কাপড় ছাড়বার ঘর, সেখানে আলনায় দু' বোনের প্রতিদিনের ব্যবহারের কাপড়চোপড়। মোটের উপর বলা চলে অরিন্দমবাবুর দুই কন্যা খুবই সুখে প্রতিপালিত।

এত জিনিস রেখেও ঘরটিতে ঢের ফাঁকা জায়গা ছিলো, ঘরের মাঝখানে তাই এক টুকরো কার্পেটের উপর ছিলো একটি নিচু মিনে-করা পেতলের টেবিল, আর টেবিল ঘিরে ছোটো একটি সোফা ও দুটি চেয়ার। এ-আসবাবগুলো নেহাৎ অলঙ্করণ হিসেবেই ছিলো, কেউ সেখানে বসতো না, যদিও কোনো রবিবারে টেবিলের থালাটি পালিশ করতে ভুলে' গেলে ভৃত্যকে তিরস্কার করতে ভুলতো না মিনি। আজ কিন্তু ওগুলো সরানো হয়েছে, আর সে-জায়গায় পাতা হয়েছে আর একটি খাট, উজ্জ্বলার জন্য। ধবধবে বিছানা অপেক্ষা করছে, উজ্জ্বলা আসেনি, মিনি জানে আসবেও না। রাত্তির যখন সাড়ে-দশটা, বুলি বিছানায় শুয়ে 'কমলার জন্য মালা' এই অদ্ভুত নামের একটি উপন্যাস পড়ছে, মিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

'বন্ধ করলে যে? বৌদি আসবেন না?'

'এখনো তো এলেন না—পরে যদি আসেন খুলে দেবো।'

'ঘুমিয়ে পড়বে তো।'

'আমার ঘুম তোর মতো চাষাড়ে নয়। তুই ভাবিসনে, ঘুমো।'

বুলি বইয়ের পাতা ওল্টালো।

'বই রাখ এখন। আলো নেবা। শোবো।'

'আর একটু!' বুলি কাতরস্বরে বললে।

মিনি নিজের বিছানায় গিয়ে বসলো; ঘর অন্ধকার না-হ'লে সে শুতে পারে না।

একটু পরে বললে, 'তুই বড্ড বেশি নভেল পড়িস, বুলি।'

কোনো জবাব এলো না।

'আলোটা নেবা না—চোখে লাগছে।'

'এই এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।'

'রাত জেগে-জেগে ঐ ছাইভস্মগুলো পড়িসই বা কেন?'

'ছাইভস্ম! কী চমৎকার লিখেছে প'ড়ে দেখো।'

'খুব ভালো, কী সুন্দর, চমৎকার, এ-সব ছাড়া তোর মুখে আর বিশেষণ নেই দেখছি।'

বুলি চুপ। মিনি অগত্যা শুয়ে পড়লো; আলোর দিক থেকে পাশ ফিরে চোখ বুজলো।

একটু পরেই কিন্তু বুলির চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। রাত জেগে নভেল পড়বার অপবাদ তার সম্বন্ধে নেহাৎই মিথ্যে। সত্যি হ'লে খুশিই হ'তো সে। রোজই ভাবে, আজ হাতের বইখানা শেষ না ক'রে ছাড়বে না, রাত যতই হোক্। যখন শোয়, ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই চোখে, কিন্তু কয়েক পাতা পড়বার পরেই মার-মার ক'রে এমন ঘুম আসে যে ছাপার অক্ষর তো দূরের কথা, ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত নাচতে আরম্ভ ক'রে। কতদিন বই বুকে ক'রেই ঘুমিয়ে পড়ে—মিনি এসে তুলে রাখে বই—তবু রোজ রাত্তিরে একখানা বই নিয়ে তার শোয়াই চাই।

আজ নিজেই বইখানা রেখে দিলে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর। মিনিকে ডেকে বললে, 'আমি ঘুমুচ্ছি, আলো নেবা।'

মিনি উঠে এসে আলো নিবিয়ে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে বুলির বিছানায় এক রাশ জ্যোছনা।—'বেশ মজা তো!' বুলি ব'লে উঠলো, 'চাঁদটা ঠিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নাঃ, এত জ্যোছনায় ঘুমোনো যায় না। আমার শিয়রের জানলাটা ভেজিয়ে দে না, বুলি।'

মিনি বললে, 'তোর সব অদ্ভুত কথা! জ্যোছনা আবার ভালো লাগে না কার!'

'আমার লাগে না। এমনিতে ভালো—বিছানায় এসে পড়লে বিশ্রী লাগে। কেমন একা-একা লাগে, মনে হয় আমার সঙ্গে আর-কেউ শুলে ভালো হ'তো।'

'বুলি!' তীব্র চাপা স্বরে ব'লে উঠলো মিনি।

'দয়া ক'রে এখন হিতোপদেশ খুলে বসিসনে।'

মিনি নিজের বিছানায় ফিরে গেলো না, বুলির খাটের ধারে চেয়ারে বসলো। একখানা মেঘ এসে চাঁদের মুখ দিলে ঢেকে। 'যাক্, বাঁচা গেলো,' ব'লে বুলি পাশ ফিরে চোখ বুজলো।

মিনি আস্তে ডাকলে, 'বুলি, শোন।'

'কাল শুনবো। এখন ঘুম পাচ্ছে।'

মিনি তবু বিরত না-হ'য়ে বললে, 'ভালো করছিস না বুলি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বুলি ঘুমের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছিলো, মিনির আস্তে-বলা ছোট্ট কথা অনেকগুণ বর্ধিত হ'য়ে তার অসতর্ক মস্তিষ্কে এমন ধাক্কা দিলে যে চোখের ঘুম গেলো ছুটে। বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'কী বকরবকর করছিস! ঘুমোতে দিবিনে!'

কিন্তু তার যা বলবার, তা বলতেই হবে মিনিকে। কার ঘুমের ব্যাঘাত হ'লো, কে মনে কষ্ট পেলো অত ভাবতে গেলে চলে না।

'শোন্—তুই এখন রীতিমতো বড়ো হয়েছিস, সে-কথা তোর বোঝা উচিত।'

'এই কথা। তা এ তো রোজই আট-দশবার ক'রে বলিস।'

'তবু তো তোর চৈতন্য হয় না।'

'লেগে থাক্, একদিন হয়তো হবে।...হ'লো তো? এখন ভাগ। ঘুমুই।'

'যার-তার সঙ্গে মেলামেশা এখন কি আর তোকে মানায়!'

বুলি অবাক হয়ে বললে, 'যার-তার সঙ্গে! মানে?'

'এই ধর্ না—ঐ নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে তোর অত মেশবার দরকার কী!'

'কিসেই বা আমাদের দরকার!'

'না—না—তুই জানিসনে, ও লোক মোটেই ভালো নয়।'

'কী ক'রে জানলি?'

'জানি আমি।'

'আগে তো তোকেই দেখতুম—'

মিনি বাধা দিয়ে বললে, 'আমার মনে হয় ও যে আমাদের বাড়িতে আসে, ওর উদ্দেশ্যটা ভালো নয়।'

বুলি একটু ভেবে বললে, 'যা-তা বক্‌ছিস তুই। নিরঞ্জনবাবু চমৎকার লোক—দেখেই বোঝা যায়। কী সুন্দর কথা বলেন। কুকুরও ভালোবাসেন খুব।...উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য আবার কী। উদ্দেশ্য না ব্যাং। তুই মনে-মনে ভাবছিস কী বল্ তো?'

'আজ এসে তোর সঙ্গে অনেক আজে-বাজে বকলো তো? তোর মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে ওর এত কথাই বা কী।'

'একবার বলছিস রীতিমতো বড়ো হয়েছি, একবার বলছিস ছেলেমানুষ। তোর মাথা-খারাপ হয়েছে, মিনি', বুলি হেসে উঠলো।

হঠাৎ লজিকের সামনে প'ড়ে গিয়ে মিনি একটু থতমত খেলো।

বুলি আবার বললে, 'তোরই বা হঠাৎ এত রাগ হ'লো কেন ভদ্রলোকের উপর?'

মিনি অনেকগুলো কথা পর-পর সাজিয়ে রেখেছিলো, কী-রকম গুলিয়ে গেলো। একবারেই শেষ কথা ব'লে ফেললো, 'তোর সঙ্গে তর্ক করতে পারবো না। কথাটা এই, ওর সঙ্গে তোর মেলামেশা আর চলবে না।'

'কী বললি?'

'ওর সঙ্গে আর মেলামেশা করতে পারবিনে তুই।'

বুলি তড়াক ক'রে বিছানার উপর উঠে বসলো।—'কেন পারবো না?'

'আমি বলছি।'

'বেশ, আমিও বলছি তবে। আমার যা খুশি তা-ই করবো, তুমি আমাকে বাধা দেবার কে?'

'এ-ব্যাপারে বাধা আমি দেবোই।'

'আমার ইচ্ছে হ'লে একশোবার মিশবো নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে, হাজার-বার মিশবো, কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না।' বুলির ঘুম-ভাঙা গলা ভাঙা-ভাঙা শোনালো।

'তোর ভালোর জন্যেই বলছি।'

'আমার ভালোর জন্যে তোমাকে ভেবে মরতে হবে না। তোমরা তো ঐ মহামায়াকে নিয়েই মেতে আছো—পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসো কেন?'

'তুই আমার পর?'

'আলাদা মানুষ তো। তুমি যখন চোখ বুজে পুজো করো আমি বাধ দিই?'

'বাধা দিবি? সাহস কত তোর!'

তোমারও তো সাহস কিছু কম না—আমি কার সঙ্গে মিশবো না মিশবো ব'লে দিতে আসো!'

'আমি তোর চেয়ে বেশি বুঝি, তাই এই সাহস।'

'ছাই-বোঝো!'

'আচ্ছা, তোকে আমি ভালোবাসি তো?'

'তা না-হয় বাসলি। আমি কি তোকে ভালোবাসি না?'

'ভালোবাসি ব'লেই তোর কিসে ভালো হবে, কিসে তুই সুখী হবি, সব সময় আমার তা-ই চিন্তা। সত্যি ক'রে বল্, আমার জন্যে কি তুই ঠিক এইরকম ভাবিস?'

একটু চিন্তা ক'রে বুলি স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো 'না, তা ভাবিনে।'

'তবেই ত্যাখ্, বড়ো আর ছোটোর এখানেই তফাৎ। আমার উপর তুই রাগ করিসনে—পরে বুঝবি এতে তোর ভালোই হলো।'

'তুই বলছিস কী? নিরঞ্জনবাবু এর পরে এলে আমি কি পালিয়ে থাকবো?'

'তা-ই না-হয় থাকলি। ও এমন একটা মানুষই বা কী! দাদার একজন বন্ধু বই তো নয়। দাদাই বাড়ি ছাড়লেন তো তাঁর আবার বন্ধু!'

'ত তিনি আমাদেরও তো বন্ধু হ'তে পারেন।'

'সেটাই তো ভয়। সেইজন্যে—'

'কী? থামলি যে?'

মিনি চুপ ক'রেই রইলো।

'মিনি! তুই তাঁকে কিছু বলেছিস?'

'আমার মনে হয় নিরঞ্জনবাবু নিজেই আর আসবেন না আমাদের বাড়ি।' কেমন অদ্ভুত শোনালো মিনির কণ্ঠস্বর।

'তুই তাঁকে বারণ করেছিস ?'

'আমি কেন বারণ করতে যাবো। ওর নিজেরই কি কাণ্ডজ্ঞান নেই ?'

'কেন, উনি আমাদের বাড়িতে আসাতে কী এমন অন্যায়টা হচ্ছিলো ? তোর ধম্মোকম্মো সব ভেসে যাচ্ছিলো নাকি ? বুঝেছি আমি—ঐ এক মহামায়াকে পেয়ে বসেছিস তোরা, তাই তোর এত চালিয়াতি। মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করিস না।'

'ঐ নামটা বার-বার মুখে আনিসনে, বুলি। পাপ হয়।'

'পাপ আবার কী ? তোমার যা পছন্দ হয় না সেটাই তো পাপ ! কী বলেছো তুমি নিরঞ্জনবাবুকে ? বলো ! বলতেই হবে !'

মিনি কিছু বললে না।

'আমি বেরিয়ে গেছি বাবার সঙ্গে, আর সেই সুযোগে তুমি এই কাণ্ড করেছো ! দাঁড়াও না—কালই আমি বাবাকে সব বলবো, বাবা নিজে গিয়ে ওকে ডেকে আনবেন, তখন দেখবো তোমার মুখ থাকে কোথায় !'

'বাবা অত্যন্ত বেশি আদর দিয়ে তোকে একেবারে নষ্ট করেছেন। কিন্তু আমার এই কথা মনে ক'রে তোকে একদিন কাঁদতে হবে ! কাঁদতে হবে ! এই আমি ব'লে দিলাম।'

বুলি হঠাৎ ভাঙা-ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো, 'তুই আমাকে শাপ দিলি, মিনি ! এই তোর ভালোবাসা !

সঙ্গে-সঙ্গে মিনির বুকটা ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো। ইচ্ছে হ'লো বুলির শিয়রে গিয়ে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, হালকা কোনো কথা তুলে ওকে হাসায়, ঘুম পাড়ায়। কিন্তু ঐ চেয়ারটাতে ও যেন শক্ত হ'য়ে জ'মে গেছে, কেবলই ভাবলো, ওঠা হ'লো না। শেষটায় উঠলো যখন, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

খানিক পরেই বুলি ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু মিনির অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। নিরঞ্জনের সঙ্গে তখন যে-ক'টা কথা হয়েছিলো, অক্ষরে-অক্ষরে মনে করবার চেষ্টা করলে। সে কী বলেছিলো? ও কী বলেছিলো? বার-বার সেই ক্ষুদ্র দৃশ্যের অভিনয় চললো অন্ধকারে, মিনির খোলা চোখের সামনে।...এ কী অশান্তি! ও কেন এলো, কেনই বা ফিরে এলো?...ঈশ্বর ছাড়া শান্তি নেই, ঈশ্বরে ছাড়া শান্তি নেই। শান্তি, শান্তি।

ঐ একটি কথা মন্ত্রের মতো জপ করতে-করতে মিনির চৈতন্য আবিষ্ট হ'য়ে গেলো। ঠিক ঘুম নয়—কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। প্রাণপণ শক্তিতে বাইরের সমস্ত জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে ঐ একটি কথার মধ্যে সংহত করা তার চেষ্টা। ইতিমধ্যে শ্রাবণের আকাশ মেঘে ঢেকেছে, চাঁদ লুকিয়েছে, অনেক রাত্রে বৃষ্টি এলো। মিনি তখনো জেগে। বৃষ্টি বলছে: শান্তি, শান্তি। বৃষ্টি ঝরছে তাঁর করুণারই মতো। বৃষ্টির শব্দ শুনতে-শুনতে এতক্ষণে মিনির ঘুম এলো।

ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে অনেক অর্থহীন চলচ্চিত্র বোজা চোখের অন্ধকারে দেখা যায়। মিনি দেখলে, লাল লম্বা একটি রাস্তার উপর সে দাঁড়িয়ে আছে, আর সাইকেলে চেপে তার দিকে যে ছুটে আসছে সে আর-কেউ নয়, নিরঞ্জন। জোরে ছুটেছে সাইকেল, কিন্তু মাঝখানকার দূরত্ব সমানই রয়েছে, একটুও কমছে না, বরং লাল রাস্তাটি যেন ফিতের মতো খুলে-খুলে আরো লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে, দূরে স'রে যাচ্ছে সাইকেল, তারপর যেন প্রায় মিলিয়েই গেলো। গেলো, গেলো, চ'লে গেলো, সত্যি কি আর আসবে না? দিগন্তে ঠেকলো রাস্তা, মিলিয়ে গেলো সাইকেল, আর আসবে না, আসবে না? হঠাৎ সমস্ত ছবিটি মুছে কালো হ'য়ে গেলো, মিনি ঘুমিয়ে পড়লো।

৭

মা-মহামায়ার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে উজ্জ্বলা বললে, 'মা, ওকে তুমি বাঁচাও।' ঝরঝর ক'রে ঝরলো তার কান্না, মা-র আলতা-পরা সুন্দর পা দু'খানা ভিজে গেলো।

এই প্রথম দুঃখের উচ্ছ্বাস উজ্জ্বলার। এতদিন চেপে ছিলো, আর পারে না। মনে আশা ছিলো, চিকিৎসায় সারবে। কিন্তু ডাক্তার আসবার পর পুরো এক সপ্তাহ কেটে গেছে। শক্ত ব্যামো হ'য়ে থাকলে এক সপ্তাহ অবশ্য কিছুই নয়, কিন্তু চিকিৎসার ঘটা দেখেই উজ্জ্বলা ঘাবড়ে গেছে। নীরদ ডাক্তার তো রোজই আসছেন—কোনো-কোনোদিন দু'বেলা, আরো সব বড়ো-বড়ো স্পেশলিস্ট এসে দেখে গেছেন, ওষুধ ইঞ্জেকশনের তো ছড়াছড়ি, প্রথমে শুধু রাত্তিরে নর্স ছিলো, এখন দিনে রাত্রে দু'জন পালা ক'রে থাকে, তাকে কিছু করতেই দেয়া হয় না, কত ব'লে-ক'য়ে একটু ছোঁয় একটু কোলে নেয়, তাও আদর করতে পারে না, চুমু খাওয়া বারণ, কোলে একটু বেশিক্ষণ রাখলেও নর্স কেড়ে নেয়। তবু ঐ ঘরেরই এক কোণে সে প'ড়ে থাকে যতক্ষণ পারে, চেয়ে থাকে অসহায় চোখে—আর কী করবে? সব সময় থাকতেও দেয়া হয় না তাকে, ডাক্তার এলেই দরজা বন্ধ, উজ্জ্বলার মনে হয় তারই ভাগ্যের বিরুদ্ধে কী যেন একটা কুটিল চক্রান্ত চলছে। শ্বশুর তাকে বাধ্য করেছেন মিনিদের ঘরে শুতে, সারা রাত অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে গুমরোয়, কেবলি মনে হয় কী যেন ওর কষ্ট হচ্ছে, বুঝি মা-কেই খুঁজছে। ঐটুকু শিশু, মা-কে ছেড়ে এক মুহূর্ত চলে

কেমন ক'রে! কিন্তু চলছে তো। উজ্জ্বলা কাছে যখন যায় হাসে না, লাফিয়ে কোলে আসতে চায় না, মা ব'লে চিনতেই পারে না যেন। ওর অসুখটা কী, তাও উজ্জ্বলা জানতে পারলো না এখনো, এতই অযোগ্য সে, এতই তুচ্ছ। শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করলে শুধু বলেন, 'কী অসুখ তা ডাক্তার বুঝলেই চলে।' ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে এমন কী রোগে ধরতে পারে যা বলা যায় না, যার নাম মুখে আনা যায় না। শ্বশুর তো জানেন কী হয়েছে, জেনেও বলেন না কেন? উজ্জ্বলার বুক কাঁপে। জ্বর নয়, হাম নয়, নিউমোনিয়া নয়, পেট খারাপ নয়, লিভারের দোষ নয়—তবে কী?

হয়তো লিভারেরই দোষ; উজ্জ্বলা শুনেছে ওতে শিশুরা ও-রকম শুকিয়ে যায়। কিন্তু এ-অসুখ তো ঘরে-ঘরে কত শিশুরই হচ্ছে, তার জন্যে এত সব বড়ো-বড়ো ডাক্তার কে ডাকে, নর্স ই বা কে রাখে! একদিকে জলের মতো অর্থব্যয়, অন্যদিকে চিকিৎসার কী সমারোহ! কিন্তু ফল কী হচ্ছে? কিছু না, কিছু না, উজ্জ্বলার বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার ক'রে ওঠে। এক্ষুনি ভালো না হোক্, যাতে আরো খারাপ না হয়, সে-ব্যবস্থা তো ডাক্তাররা করতে পারেন কিন্তু দিন-দিন খারাপই তো হচ্ছে—খোকাকে খোকা ব'লে আর চেনাই যায় না! মাথার অর্ধেক চুল গেছে উঠে, শরীরটা কুঁকড়োনো ছোট্ট, হাতের আঙুলগুলো বেঁকিয়েই রাখে সব সময়, আর মুখে গায়ে কী স ফুসকুড়ি মতো উঠেছে। গায়ের চামড়াটা ফেটে-ফেটে যাচ্ছে, আর কানে কী দুর্গন্ধ! এই রাজকীয় চিকিৎসার ফল নাকি এই!

ভুল, ভুল। ডাক্তার, ওষুধ, চিকিৎসা—এ-সব আমাদের মনের বিকার। তার শাশুড়ির কথাই ঠিক, মা-মহামায়ার কথাই সত্য। ডাক্তার কি মানুষ বাঁচাতে পারে? জন্ম আর মৃত্যু তাঁরই হাতে। মা-মহামায়া ছাড়া কেউ পারবে না ওকে বাঁচাতে, কেউ না।

মা-মহামায়ার পায়ের উপর মাথা ঠুকতে-ঠুকতে উজ্জ্বলা বললে, 'ওকে বাঁচাও।' মা পা সরিয়ে নিলেন, ইটালির মার্বেলের শক্ত, ঠাণ্ডা মেঝেতে উজ্জ্বলার কপালটা ঠুকে গেলো।

মা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ছি, উজ্জ্বলা, অমন করতে নেই।'

হৈমন্তী বললেন, 'উঠে বোসো, উজ্জ্বলা, অত ব্যাকুল হোয়ো না।'

উজ্জ্বলা উঠে বসলো। চোখের জলে কালো হ'য়ে গেছে মুখ, মাঝে-মাঝে ফোঁস-ফোঁস ক'রে কান্না ঠেলে উঠছে বুকের ভিতর থেকে। মা-র মুখের এই একটা কথা শুনেই তার মন যেন একটু হালকা হয়েছে। কী অমৃত তাঁর কণ্ঠস্বরে। আগে আসেনি কেন? মূঢ় সে, ডাক্তার ভরসা ক'রে ছিলো। শাশুড়িকে আজ বলতেই তিনি নিয়ে এসেছেন, মিনিও এসেছে—মিনি তো ক'দিন ধ'রে রোজ আসছে। আর সে কিনা এমন পাপিনী যে মা-র পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দেবার কথা একবারও মনে হয়নি। তার গোপন মনে এই যে একটা ডাক্তারে বিশ্বাস ছিলো মা কি সে জন্য রাগ করেছেন? মা কি বিরূপ হবেন তার উপর? কিন্তু তাঁর আনন্দময়ী মূর্তি সে তো সব সময়েই মনে-মনে ধারণ করেছে; কাছে যে আসতে পারেনি তার কারণ এ ছাড়া আর-কিছুই নয় যে রুগ্ন ছেলেকে ফেলে এক মুহূর্ত নড়তে চায় না তার মন। কিছুই সে করতে পারে না, কোনো কাজেই সে লাগে না, তবু মনে হয় তাকে না হ'লে চলবে না। এই তো মায়া। এই মায়া থেকেই দুঃখের জন্ম। খেলেনা নিয়ে জীবন কাটাই, বন্ধনে জড়াই, আসক্তিতে ডুবি—এদিকে মুক্তির মণি সব সময় হাতের কাছেই রয়েছে, তুলে নিলেই হয়। 'যেমন', মা মহামায়া একদিন বলেছিলেন, 'সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি চারদিকেই ছড়ানো ছিলো, হাজার-

হাজার বছর ধ'রে কেউ তার খোঁজ পায়নি, যেদিন পেলো সমস্ত পৃথিবীর চেহারা গেলো বদ্‌লে।'

তুমি অন্তর্যামী; তুমি সবই জানো, উজ্জ্বলা মনে-মনে বললে। মুক্তি কাকে বলে জানিনে, খোকার প্রতি এই যে আমার আসক্তি, এ কি খারাপ? যদি খারাপ হয়, আমাকে সে-জন্যে শাস্তি দাও, ওকে বাঁচাও। অপরাধ করেছি, মায়ায় জড়িয়ে তোমার চরণে শরণ নিতে ভুলেছি, যে-কোনো শাস্তি আমাকে দাও, ওকে বাঁচাও। ওকে বাঁচাও, আর-কিছু আমি চাই না।

তারা এমন একটা সময়ে এসেছে যখন ভক্তের ভিড় থাকে না। ছ' বিঘে জমির উপর মায়া-মন্দির, চারটি আলাদা বাড়ি নিয়ে। প্রথম বাড়িটি লীলামঞ্চ, সেটি একতলা, মন্দিরের ধরণে গড়া, তিনদিকে বারান্দা আর মস্ত উঁচু, মস্ত বড়ো একটি হল্। সেখানে শ্বেতপাথরের বেদীতে রাধাকৃষ্ণ হরপার্বতীর মূর্তি; বেদীটি বেশ চওড়া, প্রায় থিয়েটরের রঙ্গমঞ্চের মতো, রোজ সন্ধেবেলা মা সেখানে দেখা দেন, ভক্তেরা ঘর ছাপিয়ে তিনদিকের বারান্দা উছলে কম্পাউণ্ড পর্যন্ত ঠেকে, পালা-কেত্তন হয়, বিশেষ-বিশেষ রাত্রে মা নিজেও রাধা সেজে নাচেন, নেপথ্যে কৃষ্ণের বাঁশি বাজে, কি পার্বতী সেজে মহাদেবকে গান শোনান, তিনটি কি চারটি সুকণ্ঠী গায়িকা অবশ্য পেছন থেকে তাঁকে সাহায্য করে। লীলামঞ্চের পরে অপর্ণা—অর্থাৎ, যিনি দীর্ঘ তপস্যাকাল শুধু সেই পাতা খেয়ে জীবনধারণ করেছেন যে-পাতা আপনা থেকেই ঝ'রে তাঁর ঠোঁটে পড়েছে, তাঁর স্মরণে একটি বৃহৎ ভোজনালয় ও রন্ধনশালা; উৎসবের দিনে একসঙ্গে দুশো লোকের পাতা পড়ে সেখানে, চারটে গ্যাসের উনুনে (কারণ মা-মহামায়ার ফুসফুসে একটুও ধোঁয়া সয় না, অনেকদিন আগে একবার নাকি তাঁর টি. বি. সন্দেহ করা হয়েছিলো) প্রসাদ বানানো হয়। অপর্ণার পরে কৈলাস, ছোটো একটি একতলা

বাড়ি, মা-মহামায়া তাঁর মানুষী জীবনে যে-ব্যক্তিকে বিবাহ করেছিলেন তিনি থাকেন সেখানে। মানুষটি বেঁটেখাটো মোটাসোটা, ষণ্ডামার্ক ধরনের চেহারা, মুখভরা কাঁচাপাকা দাড়ি, টকটকে লাল কাপড় পরেন, চোখের রংও প্রায় সেই রকম। ভক্তের মধ্যে একদল আছে যারা তাঁকে মহাদেব ব'লে মানে, আর-একদল তাঁকে ভাবে সাধারণ পুজুরি বামুনমাত্র, এই দুই দলে একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধের ভাব প্রকাশ্য রেষারেষিতে পরিণত হ'তে বেশি আর দেরি নেই। বাবা-মহাদেবের অবস্থাটা তাই একটু অস্পষ্ট, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব না সাধারণ মানুষ নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। মোটের উপর, সাধারণ মানুষের মতোই তিনি মায়া-মন্দিরের সমস্ত কাজকর্ম বিষয়-ব্যাপারের বেশ নিপুণভাবে দেখাশোনা করেন, আবার দাড়ি রেখে, গেরুয়া প'রে, অত্যন্ত কম কথা ব'লে, মহাদেবে আরোপিত দু'একটা নেশা অভ্যেস ক'রে কিঞ্চিৎ দেবত্বও বজায় রাখেন। কৈলাসের পর, কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে, স্বয়ং মা-মহামায়ার বাসা। স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে সেতু রচনা করেন তিনি, বাড়িটির নাম তাই 'সেতুবন্ধ'। সামনে কয়েকটি নারকেল গাছ বাড়িটিকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে, চট ক'রে চোখে পড়ে না। মায়া-মন্দিরে এই একটি বাড়িই দোতলা। নিচের তলাটায় কেউ থাকে না, কিন্তু খালিও প'ড়ে নেই, ভক্তদের কাছ থেকে মা যত উপহার পান সেগুলো মজুত হয় ওখানে। একেবারে বাইরে থেকেই সোজা উপরে ওঠবার সিঁড়ি, উঠেই তিন দিক খোলা মস্ত মনোরম একটি মার্বেল-মেঝের বারান্দা। ভক্তরা সাধারণত মা-র দেখা পায় লীলামঞ্চেই, বিশেষ কেউ-কেউ নির্দিষ্ট সময়ে সেতুবন্ধের বারান্দায় আসতেও অধিকারী, কিন্তু বারান্দার পরে যে ঘর দুটি আছে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। ব্যতিক্রম শুধু হৈমন্তী। মা তাঁকে এতই ভালোবাসেন যে মায়া-মন্দিরে

তাঁর গতিবিধি অবাধ বললেই চলে, মা-র শোবার ঘরে পর্যন্ত তিনি গিয়েছেন।

সেই বারান্দায় ব'সে চারজন। মা-মহামায়ার এমনই মহিমা যে সকলের সঙ্গে সমান হ'য়েই তিনি বসেছেন, ভক্তদের মতোই মেঝের উপর, তাঁর জন্য আলাদা কোনো আসন নেই, বেদী নেই, বারান্দাটিতে কোনো মূর্তি কি ছবি নেই, এ যেমন নিরাভরণ, মা-র মাধুর্যে তেমনি ভরপুর। এখানে এসে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেও সুখ। শহরের বাইরে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে, গাছপালায় ঘেরা এমন একটি জায়গা কার না ভালো লাগে! এমন চুপচাপ যে ক্ষীণ একটি পোকার ডাকও শোনা যায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে—তাছাড়া অনেকদিনের চাপা কান্না একটু বের ক'রে দিতে পেরে—অনেকদিন পরে উজ্জ্বলার মনটা একটু যেন ভালো লাগলো।

'ডাক্তার কী বলে?' মা-মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন।

ডাক্তার কী বলে, লীলাকমলের অসুখটা আসলে কী, হৈমন্তী তা শুনেছিলেন স্বামীর মুখে, কিন্তু কান দেননি কথাটায়। ও-সব ছাইভস্ম কথা ডাক্তার তো বলবেই, নয়তো বত্রিশ টাকা ভিজিট বাগানোর সুবিধে হবে কেন? অমন একটা তাজা জোয়ান ছেলে অরুণ, ওর যত-দোষই থাক্, ও দেখতে যে ভালো তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ওর কিনা ঐ পচা রোগ! যত পাগলামি! যদি অসুখই হবে তাহ'লে অরুণ দিন-দিন মোটা হচ্ছে কেমন ক'রে? বাপের অসুখে ছেলের অঙ্গ পচতে লাগলো এদিকে বাপটি নিজে দিব্যি চমৎকার আছেন, এ-ও কি কখনো হয়! হৈমন্তী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন মনে-মনে।

'ডাক্তার তো কতই বলে!' হৈমন্তী জবাব দিলেন।

'না রে, ওদের সব কথাই যে বাজে তা কিন্তু ভাবিসনে,' মৃদু হেসে

বললেন মা-মহামায়া। 'কিছু আছে ওদের, কিছু ওষুধপত্রও আছে। যেমন ধর, তোর যদি কালাজ্বর হয় আমি তোকে ওদের ঐ ছুঁচগুলোই ফোটাতে বলবো।'

মা-র এই উদারতায় হৈমন্তী মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। এদিকে কোনো ডাক্তারের সামনে দৈব ওষুধের নাম মুখে আনতে পারবে! এখানেই তফাৎ বোঝা যায়।

'তবে কী জানিস—অনেক বাজে কথা ওদের বাধ্য হ'য়ে বলতে হয়। নয়তো ব্যবসা চলে না। ছ'বছর আগে এক ডাক্তার বলেছিলো যে আমার যক্ষ্মা হয়েছে কি হবে কি হ'তে পারে। একজন মানুষ তো ভেবে অস্থির—বুঝি মরতেই বসেছি। মরলুম না তো। যক্ষ্মারও দেখা নেই। এইরকম আর কী।'

মা-র নিটোল, উজ্জ্বল কান্তির দিকে উজ্জ্বলা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো। সাধনার বলে যক্ষ্মাকেও ইনি জয় করেছেন! কী না পারেন আমাদের মা!

হৈমন্তী বললেন, 'কী যে বলো, মা, তোমার আবার মৃত্যু!'

'মরতে হবে বইকি, সকলকেই মরতে হবে। তুই কী বলিস, মিনি?'

হঠাৎ এই সম্মানলাভে মিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো। অথচ কথাটা এতই সত্য যে এক কথাই শেষ কথা। কিছু বলবার নেই। মিনি চুপ ক'রে রইলো।

মা মিনির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন।—'ভারি ভালো মেয়ে তুই, মিনি, তোকে দেখেই আমি বুঝেছি তোর মধ্যে দেবতার অংশই বেশি। সার্থক হবে তোর জীবন।'

মিনি লাল হ'য়ে উঠলো। বুকের মধ্যে এমন একটা সুখের অনুভূতি হ'লো তার যেন নিমেষে ধন্য হ'য়ে গেলো সমস্ত জীবন।

মৃত্যু সম্বন্ধে মা-র প্রগাঢ় মন্তব্য শুনে উজ্জ্বলার বুক কেমন কেঁপে

উঠলো। ক্ষীণস্বরে বললে, 'মা, আমার খোকাকে তুমি বাঁচাবে তোমার মুখের এ-কথা না নিয়ে আমি আজ যাবো না।'

'তোরা ভুল করিসনে—আমি ঈশ্বর নই।'

'তুমি সব পারো, মা, তুমি সব পারো। কতদিন ধ'রে ভুগছে—আর চোখে দেখা যায় না। কী কষ্ট যে পাচ্ছে!'

'কষ্ট কখনো পায়নি এমন জীব কোথায়?'

'ও নিষ্পাপ শিশু, ও তো কারো কাছে কোনো অপরাধ করেনি—ওর এই কষ্ট কেন?' বলতে-বলতে উজ্জ্বলার চোখ আবার ছল্‌ছল্ ক'রে উঠলো।

'আমরা কতটুকু জানি! কতটুকু বুঝি! যে বানর ছিলো সে হয়েছে মানুষ, এখন তার বানর-জন্মের কথা তার কি মনে পড়ে! কোন জন্মের পাপে আজকের এই দুঃখ, কে তা বলবে! জন্ম-জন্মান্তর নিয়েই তো জীবের জীবন।'

এমন দুর্ভাগা উজ্জ্বলার যে এত কষ্টে এতদিন ধ'রে গর্ভে যাকে ধারণ করেছে সে-ও পূর্বজন্মের পাপী। অথচ ও-ই যখন জন্মালো—ছোট্ট, একমুঠো মাংসপিণ্ড, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের ব্যর্থতা যেন ভুলেছিলো উজ্জ্বলা। শুকনো মালঞ্চে আবার যেন কুঁড়ি ধরে-ধরে। কিন্তু সইলো না, ফুল ফুটলো না; এক অজানা অনামি পাপের হাওয়ায় সবছারখার হ'য়ে গেলো।

'কষ্ট ও যা পাবার তা তো পাচ্ছেই, ওকে তুমি বাঁচাও, মা, ওকে তুমি বাঁচাও। এ আমি নিজের জন্য বলছি না, ও বাঁচলে আমার সুখ হবে ব'লে বলছি না, ওর জন্যই বলছি। আমার জীবনে সুখ নেই তা আমি জানি। এই তুমি করো, মা, ও যেন বেঁচে ওঠে, আর আমি যেন মরি। আমি যেন মরি', বলতে-বলতে উজ্জ্বলা বিকৃতস্বরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বারান্দার পরেই যে ছোটো ঘরটি সেখানে একটি চিকণ পাটিতে ঢাকা নিচু তক্তাপোষে শুয়ে-শুয়ে অরুণ সব কথা শুনলো। চেষ্টা ক'রে যে শুনলো তা নয়, কানে এলো। মাঝখানের দরজাটা ভারি পরদায় ঢাকা, তার মা-র ছাড়া এমন ক্ষমতা কারো নেই সেতুবন্ধের দোতলার ঘরে ঢোকে, মা-ও অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারেন না, সুতরাং অরুণ ভারি নিশ্চিন্ত। কথাগুলো শুনতে-শুনতে ভারি মজা লাগলো তার। উজ্জ্বলা যদি জানে তার ছেলের বাপ এখানেই, পাশের ঘরেই রয়েছে, তাহ'লে কী করে সে? অরুণ নিজের মনে নিঃশব্দে হাসলো, কোনোরকম শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। খুব সাবধানে কথা বলতে হয়, চলাফেরা করতে হয়, নয়তো এখানে আছে ভারি আরামে। আর-একটু অসুবিধে, নিরিমিষ খেতে হয়, তা দিনকয়েক একটানা এত মাংস ও মদ তার পেটে গেছে যে মুখ-বদল হিসেবে নিরামিষ আহার তার বরং ভালোই লাগছে। মায়া-মন্দিরেই তৈরি সন্দেশ, রাবড়ি, সরভাজা এ সব খেয়ে সে তো অবাক—মিষ্টি জিনিস খেতে এত চমৎকার হ'তে পারে তার ধারণাই ছিলো না। তাছাড়া খাওয়ার সামান্য অসুবিধে যদি বা হয় অন্যান্য সুবিধের তুলনায় তা কিছুই না! কোনো ঝকমারি নেই, কোনো দুর্ভাবনা নেই—একেবারে হাত-পা-ছড়ানো নিশ্চিন্ত আরাম। কেউ তার কাছে কিছু আশা করবে না, কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। আর সব চেয়ে ধূর্ত যে-পাওনাদার সে-ও এখন আর নাগাল পাবে না তার। গত দু' বছরে সে নানাভাবে প্রায় হাজার তিনেক টাকা দেনা করেছে—এই একটা বিষয়ে তাকে প্রায় প্রতিভাবান বলা চলে। চৌরঙ্গি অঞ্চলের ছোটো-ছোটো এক-একটা পানের দোকানেই তার সিগারেটের দেনা ষাট-সত্তর টাকা। ঠিক সময়টি বুঝে উধাও হয়েছে, ধরেছে অন্য-কোনো রাস্তায় অন্য-কোনো দোকান। দোকানিদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার প্যাঁচটা তার খুব ভালোই জানা; সুন্দর চেহারা,

ফিটফাট জামা-কাপড়, চলা ও বলার একটা নবাবি ভঙ্গি, কয়েকদিন নগদ দাম দিয়ে অজস্র কেনা, তারপর ধারে দিতে পেরে দোকানিই যেন কৃতার্থ। চারটে দরজির, গোটা তিনেক কাপড়ের, আর সাত-সাতটা মনোহারি দোকানে তার যা দেনা তা যোগ করলে হাজারখানেক টাকা হবে বইকি। একটা ছোটো মনোহারি দোকান তো তাকে খদ্দের পাবার ছ' মাসের মধ্যে ফেলই পড়লো। দরজি, কাপড়ওয়ালা আর মনোহারি দোকানদারগুলো ভারি অসভ্য—মাঝে-মাঝে বাড়িতে এসে উৎপাত করে, পানের দোকানে ভারি সুবিধে, একদম বেনামি থাকা যায়। অগত্যা বাড়ির চাকরদের সে ব'লে দিয়েছিলো, 'আমার খোঁজে কেউ এলে তক্ষুনি ব'লে দিবি, বাবু বাড়ি নেই'; আর চাকরদের প্রায়ই অবশ্য মিথ্যে বলতে হ'তো না, কারণ সকালে ঘণ্টা দুই ছাড়া সে বাড়ি আবার থাকে কখন! তবু কোনো-কোনোদিন দু' একটা হুতোমমুখোর সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে যেতো—সকালে উঠেই মেজাজ খারাপ! বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, নামে শোনা, চোখে চেনা এমন-কোনো লোক নেই টাকা ধার করতে হ'লে যাকে সে ভুলেছে, তারপর একজন লোকের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব আদায় হ'য়ে যাওয়া মাত্রই চুপসে ডুব মেরেছে। কলকাতা এত বড়ো জায়গা যে নতুন-নতুন শিকার খুঁজে বের করা তার পক্ষে শক্ত হয়নি, তবু এতদিনে তারও সঙ্গতি প্রায় ফুরিয়ে আসছিলো, বাধ্য হচ্ছিলো বন্ধুদের বইয়ের আলমারি ফাঁক করতে—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে ক'টা টাকা জোটে, তারই জোরে হয়তো দুপুরবেলার বিয়রটা চললো, রাত্তিরের হুইস্কিও বাদ গেলো না। বাড়ি থেকে যটুকু নেবার তাও সে অবহেলা করেনি কোনোদিন—বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই উজ্জ্বলার একটি হার ও চারগাছা চুড়ি বেচে কয়েকদিন বেশ সচ্ছলভাবেই কাটিয়েছিলো—বলেছিলো, কী বিচ্ছিরি সেকেলে জিনিস সব! শিগগির দাও আমাকে, আমি চমৎকার নতুন

ধরনের করিয়ে আনছি। নতুন ধরনের হার-চুড়ি আসেনি, উজ্জ্বলাও ভয়ে-ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি, চুকে গেছে। তাছাড়া উজ্জ্বলার হাতখরচের টাকা তো তারই, আর কোনোদিন মা-র কোনোদিন বা মিনি কি বুলির কাছে চেয়ে দশ টাকা থেকে চার আনা পর্যন্ত যা জুটে গেছে কিছুই ফেলা যায়নি। বাড়ি থেকে চ'লে আসবার দিনও যা পেরেছে হাতিয়ে এনেছে। মোহরের ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে কিনা কে জানে। যাকগে, এখন আর এ-সব কোনো ভাবনাই তার নেই। পাওনাদাররা বাড়িতে এলে পূজনীয় পিতৃদেবের সঙ্গেই যদি দেখা হয়, তিনি হয়তো রাগ ক'রে টাকাটা দিয়েই দেবেন। বেশ আছে সে এখানে, ভারি আরামে আছে।

ভাগ্যিস এ-বুদ্ধিটা তার মাথায় এসেছিলো। নিরঞ্জনের হোটেল থেকে মহা ফুর্তিতে শিষ দিতে-দিতে সে বেরিয়েছিলো, ঐ একশো টাকা উড়েছিলো সেদিন রাত্রেই, তারপর চারটি মোহরের দুটি ভাঙিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দিন তিনেক আরো কাটালো। ঐ কেমিকেল্‌স্‌-এর ব্যবসাটা ফাঁদতে উৎপলেন্দু শেষ পর্যন্ত রাজি হ'লো না—লোকটা একটা scum! রাত্তিরে আড্ডায় ব'সে কী উৎসাহ, সব প্রায় ঠিকঠাক, দিনের বেলায় গায়েই মাখে না কথা। পেট-মোটা হাঁদারাম জমিদার—ব্যবসার ও কী বোঝে! কুচপরোয়া নেই, একজন মাড়োয়ারি ক্যাপিটেলিস্ট সে পাকড়ে ফেলবে শিগগিরই, গণেশরাম বিঠ্‌ঠলভাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ আছে, তিসির ব্যবসায় লাখপতি হয়েছে, এ-স্কীমটা পেলে লুফে নেবে। আর নিরঞ্জনের ঐ টাকাটা—ওঃ, তা যে-কোনো একদিন দিয়ে এলেই হবে, আছেই তো মাসখানেক।

কিন্তু আত্মসম্মান বুঝি আর টেঁকে না, বাড়ি বুঝি ফিরতে হয়। হোটেলে খেয়ে, বন্ধুর বাড়িতে চায়ের সময় হাজির হ'য়ে, অন্য-কোনো বন্ধুর বাড়িতে স্নান ক'রে তিন-চারদিন কাটে, তার বেশি কাটে না।

ছাত্রজীবনে যে-ক'জনের সঙ্গে তার সত্যি বন্ধুতা হয়েছিলো তাদের সে ত্যাগ করেছে অনেকদিন, পৃথিবীর ভালো-ভালো লোকগুলোরও একদিন এমন অধঃপতন হয় যে টাকা ধার চাইলে স্রেফ ব'লে বসে, না। তার এখনকার শুঁড়িখানার বড়োলোক বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে তার মেলে খুব, কিন্তু দেখা গেলো যে বাড়িতে তাকে অভ্যর্থনা করতে তারা কেউই খুব বশি ব্যস্ত নয়। এমনিতে সে অবশ্যি সারা দিন রাত প্রায়ই বাইরে কাটায়, বেলা দশটায় ভাত খেয়ে বেরোয়, বিকেলে একবার ফেরে-চা খেতে স্নান করতে, তারপর সন্ধের পর বেরিয়ে রাত দুটো-তিনটেয় ফেরে—এ তো বলতে গেলে তার দৈনন্দিন পদ্ধতি। কোনোদিন হয়তো বিকেলেও ফেরে না, কত শনিবারের রাত এমনি জ'মে ওঠে যে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে একেবারে রবিবারের ভোর। তবু—একেবারে কখনোই বাড়ি ফিরতে না-পারলে যে ঠিক আরাম হয় না, এ-চারদিনেই অরুণ তা টের পেলো। হাজার হোক্, শরীরের কতগুলো প্রয়োজন আছে, দু'বেলা স্নান আছে, বিশ্রাম আছে। অথচ পিতৃদেব যতদিন আছেন, বাড়ি ফেরা তার একান্ত অনিচ্ছা। যেমন বলেছে, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে, তেমনি সে-ও আর ফিরবে না। আচ্ছা জব্দ হবে পপ্!

ফিরবে তো না—কিন্তু যাবেই বা কোথায়?

একটা অত্যন্ত হাস্যকর কথা তার মনে এলো—মহামায়ার আস্তানায় গিয়ে উঠলে কেমন হয়? মায়া-মন্দির সে দূর থেকে একবার দেখেছিলো, সুন্দর জায়গা। নেবে নাকি গিয়ে মা-র চরণে আশ্রয়? মা যদি দয়া করেন এ-ক'টা দিন সে নিরুপদ্রবে কাটাতে পারবে—অবশ্যি ভক্তের ভিড় কেত্তন-টেত্তন ও-সব গোলমাল আছে—তা বাড়ি ফেরার লজ্জার চেয়ে তাও বরং ভালো। বাবা জানতে না-পেলে জব্দ, জানতে পেলে তো আরো জব্দ। সত্যি, বাবার উপর প্রতিশোধ

নেবার এ কিন্তু একটা চমৎকার উপায়। কথাটা এতই মজার লাগলো যে অরুণ একা-একাই হো-হা ক'রে হেসে নিলে খানিকক্ষণ।

প্রথমে যেটা বৃহৎ একটা ঠাট্টা হিসেবে ভেবেছিলো, ক্রমে সেটাই অরুণের মনে হ'তে লাগলো বেশ ভালো ব্যবস্থা। ভালো না হোক, চলনসই। এ-রকম অসম্ভব কিছু না-করলে বাড়ি না-ফিরে সে আর পারবে না। সে বিলাসিতায় প্রতিপালিত, তারপর এতদিনের উচ্ছৃঙ্খলতায় তার মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙেছে, শরীরের একটু কষ্ট সইতে পারে না, পরিশ্রমে তার প্রগাঢ় বিমুখতা। ট্র্যামের টিকিট আছে, ছু' মিনিটের রাস্তাও কখনো হাঁটে না, যেখানে ট্র্যাম নেই রিক্‌শা নেয়। তারপর পর-পর ক' রাত্রির উন্মত্ততায় শরীরে ক্লান্তিও এসেছে, খোঁয়ারির বেলায় শরীর এখন চায় বিশ্রাম, চায় ঘুম। মায়া-মন্দিরে মন্দ কী! সে-ও না-হয় ভক্ত সেজে যাবে। মনে রাখবার মতো একটা ঠাট্টা হবে তো! সে, অরুণ, অরুণ সরকার, কোনো-কানো অঞ্চলে এক নামে যাকে সকলে চিনবে, সে যাচ্ছে মায়া-মন্দিরে!...অরুণ আর-একবার হেসে উঠলো, সারাদিনই থেকে-থেকে তার হাসি পেতে লাগলো।

সেই রাত্রিও গণিকাগৃহে কাটিয়ে বাড়ি ছাড়বার পর পঞ্চম দিন ভোরবেলা সে সত্যি-সত্যি মায়া-মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

মা-র দেখা পাওয়া তার পক্ষে শক্ত হ'লো না। তার মাতৃপরিচয় পেয়েই বাবা-মহাদেব তাকে লীলামঞ্চের বারান্দায় একটি পাথরে গড়া বেঞ্চি দেখিয়ে বললেন, 'বোসো। খবর দিচ্ছি।'

অরুণকে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'লো, কারণ মা তখন পুজোয় বসেছিলেন। বিরক্ত হ'য়ে ভাবছে চ'লে যাবে কিনা এমন সময় মা দেখা দিলেন।

অরুণ উঠে দাঁড়ালো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করলে।

'অরুণ না?'

অরুণের সুরা-ক্লান্ত চোখে অপরূপ লাগলো মহামায়াকে। এমন দিব্য মূর্তি সে যেন কখনো দ্যাখেনি।

'আমি আপনার কাছে এলাম।'

মহামায়া স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'সকলেই আমাকে তুমি বলে, তুইও তা-ই বলিস। রাগ ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়েছিস তো?'

অরুণ চুপ ক'রে রইলো।

'শুনেছি সব তোর মা-র কাছে। ভালো করছিস না, ফিরে যা।'

'বাড়ি আমি ফিরবো না। তুমি যদি জায়গা না দাও—যা হবার হবে।' 'তুমি' বলতে রীতিমতো চেষ্টা করতে হ'লো অরুণের, তবু বললে। রোমে গেলে রোমান হ'তে হয়।

'আমার এখানে সকলেরই জায়গা।'

অরুণ বললে, 'তা নয়। আমি তোমার এখানে থাকতে চাই—অন্তত'—বলতে যাচ্ছিলো, 'বাবা যতদিন নাগপুর না ফেরেন,' থেমে গিয়ে বললে, 'অন্তত কয়েকদিন।'

'এ-দুর্মতি তোর কেন হ'লো বল্ তো?'

অরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তোমার দিকে মন টানলো, তাই চ'লে এলুম।'

'কী পাগলের মতো চেহারা করেছিস! কোথায় ছিলি এ-ক'দিন?'

অরুণ তার উসকোখুসকো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে বললে, 'আজ থেকে তোমার এখানেই থাকবো ভাবছি,—তুমি যদি ফেলে না দাও।'

মা-মহামায়া বললেন, 'আমি কাউকে ফেলি না, যে আমাকে চায় আমি তারই।'

অরুণ নু'য়ে গেলো।

সেতুবন্ধের দোতলায় মা-র শোবার ঘরের পাশেই ছোটো একটি

ঘর, অরুণের জায়গা হ'লো একেবারে সেখানেই। হয়তো মা অরুণের চোখে-মুখে এমন কোনো দৈব লক্ষণ দেখলেন যার জন্য তাকে অন্য কোথাও রাখার কথা ভাবতেই পারলেন না। তাছাড়া মায়া-মন্দিরে যারা আসে তাদের সকলেরই অরুণকে দেখবার দরকারও নেই। ভক্তদের মনে ঈর্ষার কালিমা লাগতে পারে। মানুষের মন তো!

অরুণ দেখলো, সেতুবন্ধে ইহকালের ব্যবস্থাও বেশ ভালো। সুন্দর ঘর, চমৎকার বাথরুম, কয়েক মিনিটের মধ্যে তার জন্যে নতুন জামাকাপড় এসে হাজির হ'লো তার সঙ্গে সদ্যক্রীত সেফটিরেজার, আয়না চিরুনি পর্যন্ত। দাড়ি কামিয়ে, মনের মতো স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন কাপড় যখন পরলো মনে হ'লো নতুন জীবন এলো শরীরে। মা-মহামায়া আর যা-ই হোক্, ভদ্রতাজ্ঞান তার অসাধারণ। আতিথেয়তা জানে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে, মা-মহামায়া নিজেই এলেন সেখানে। জোচ্চোরি হোক্ যাই হোক্, এতগুলো লোক মানে তো, কলকাতা ছাড়িয়ে সমস্ত বাংলাদেশেই নাকি এঁর নাম, অথচ একটু দম্ভ নেই, ভড়ং নেই। অরুণ একটু অবাকই হ'লো। যাকে ভেবেছিলো পুজোর পুতুল, সে দেখছি আস্ত একটা মানুষ। এমনভাবে কথা বলে যেন কত আপন, যেন কতদিনের চেনা।

'কী খাবি?'

অরুণ বললে, 'ভাত।'

'আয়।'

পিছনের দিকের সরু বারান্দায় কার্পেটের আসনের সামনে শাদা পাথরের থালায় একগুচ্ছ বেল ফুলের মতো সরু আতপচালের ভাত, বাটিতে ডাল, তরকারি, ছোটো একটি বাটি ভরা সোনালি রঙের ঘি। অরুণ ব'সে গেলো। কতকাল পরে সে যেন ভাত খাবে।

'ঘি খাস তো?'

'ঘিয়ের গন্ধে বমি আসে,' অরুণ মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলো কার সঙ্গে কথা বলছে।

'খেয়ে দ্যাখ একদিন। মাছ-মাংস নেই, কষ্ট হবে।'

অরুণ ঘি ঢেলে নিলো, ঘিয়ের যে এমন গন্ধ এমন স্বাদ হয় তা সে কোনোদিন জানেনি। জানবে কোত্থেকে! মায়া-মন্দিরের নিজস্ব গোরু যে দুধ দেয়, এ সেই দুধের সর-বাঁটা ঘি। শহরে যারা থাকে, তারা ক'জন এর স্বাদ জানে!

'কেমন?'

'খুব ভালো,' অরুণ গোগ্রাসে খেতে লাগলো।

'তুই এখন এখানেই থাকবি নাকি?'

'ভাবছি তো তা-ই।'

'বাড়িতে খবর দিবি না?'

'কী দরকার?'

'তারা তো ভাবছে।'

'আমার জন্যে আবার ভাবনা!'

'তোর মা?'

'কী?'

'তাকেও বলবি না?'

'মা এখানে এসে তো আমাকে দেখবেনই।'

'তোর বাবা খবর পেলেই ছুটে আসবেন।'

অরুণ গোঁয়ারতুমির স্বরে বললে, 'আমি যাবো না।'

'পরের ছেলে নিয়ে শেষটায় ফ্যাশাদে পড়ি আরকি।'

'তোমার আবার পর কে?'

মা-মহামায়া ঈষৎ হেসে বললেন, 'বেশ, তোকে রাখতে পারি, কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে।'

'যেমন ?'

'ঐ ঘর থেকে বেরুতে পারবি না কক্ষনো।'

'কক্ষনো না ?'

'—আমার অনুমতি ছাড়া। দিন-রাত আটক থাকাই তোর ভালো। হ্যাঁরে, তোর কথা কী সব শুনি ? তুই নাকি একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস ?'

অরুণ ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'এখানে থাকিস যদি তোকে আমি শুধরে ছাড়বো।'

অরুণ মনে-মনে হেসে বললে, 'বেশ তো।'

'তা-ই কথা রইলো তবে। মায়া-মন্দিরের অন্য কোথাও তুই যেতে পারবি না, সেতুবন্ধে বন্ধ থাকবি, তাও বারান্দায় কি অন্য কোনো ঘরে যাওয়া বারণ। খাওয়ার সময় ডেকে আনবো—বিকেলে এ-বাড়ির ছাতে একটু পায়চারি করতে পারিস।'

'একেবারে জেলখানা।'

'ভালোই তো। জেলখানা চমৎকার বিদ্যালয়, তা জানিস তো। অনেক মহৎ মানুষ তৈরি হয়েছে সেখানে।'

'তোমার দয়ায় আমিও হয়তো মহৎ হ'য়ে যাবো—কী বলো ?'

'দেখা যাক। আজ থেকে তুই আমার বন্দী।'

চারদিন ধ'রে যখন-তখন যা-তা খাওয়ার পর এই পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ভোজ হাতের কাছে পেয়ে অরুণ এত খেলো যে খাওয়ার পর একটা কথা বলার ক্ষমতাও তার রইলো না। তক্ষুনি শুয়ে পড়লো বিছানায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম।

উঠলো বিকেলবেলায়। মা-মহামায়া এসে বললেন, 'খুব ঘুমুলি তো।'

'হ্যাঁ, খুব ঘুমিয়েছি।'

'এখন কী ইচ্ছে?'

'চা।'

'জুটবে।'

সুদৃশ্য বাসনে এলো সুগন্ধি চা, সঙ্গে নানারকম ফল মিষ্টি। অরুণ মনে-মনে বললে, 'ব্যাপারটা তো মন্দ না।'

সেদিন হৈমন্তী সারাদিন আসেননি। সন্ধের একটু আগে যখন এলেন লীলা-মঞ্চে তখনো ভিড় জমতে শুরু হয়নি। দর্শনের দেরি আছে। চ'লে গেলেন সেতুবন্ধের দোতলায়; মা তাকে দেখেই বললেন, 'আজ তোকে একেবারে অবাক ক'রে দেবো।'

'রোজই তো করছো, মা। তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।'

'আয় এ-ঘরে।'

পরদা সরিয়ে নিয়ে গেলেন যেখানে অরুণ কপালে মাথা রেখে তক্তা-পোষে শুয়ে। হৈমন্তী চমকে উঠলেন।

মা-কে দেখে অরুণ উঠেও বসলো না, একটু নড়লোও না, তেমনি শুয়ে রইলো।

'দেখলি তোর ছেলের কাণ্ড! আজ সকালে পাগলের মতো এসে উপস্থিত—বলে কিনা, এখানেই থাকবো। এখন তোরা ওর যা-হয় ব্যবস্থা কর।'

হৈমন্তী বললেন, 'কী ব্যবস্থা করবো ব'লে দাও।'

'ছেলে তোর, আর ব্যবস্থা করবো আমি! পায়ে ধ'রে সেধে বাড়ি নিয়ে যা—কী আর করবি।'

অরুণ হেঁড়ে গলায় বললে, 'বাড়ি আমি ফিরবো না।'

'একেবারে পাগলা ছেলে তোর।' মা-মহামায়া মুখ টিপে হাসলেন।

মা-মহামায়াকে হৈমন্তী যখন আবার একটু নিভৃতে পেলেন রাত এগারোটা বেজে গেছে। শ্রীরাধিকা সেজেছিলেন, সেই বেশই আছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে হৈমন্তীর চোখে আর পলক পড়ে না। আজ মান-ভঞ্জনের পালা গাইলো কানাই ভট্‌চায—একেবারে ছেলেমানুষ, গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে, কী মিষ্টি গলা আর সুন্দর কাঁচা মুখে ভাবের কী অপূর্ব খেলা! হৈমন্তীর মগজের মধ্যে গানের সুর আর কথাগুলো রিমঝিম ক'রে ফিরছিলো, শরীর যেন অবশ। এমন আনন্দ আর কোথায়! আর কিসে! মনে হয় তিনি যেন আকাশে ভাসছেন, মেঘে শুয়ে আছেন, তারা নিয়ে খেলা করছেন।

তবু নামতে হলো পৃথিবীর ধুলোকাদায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো, মা, ছেলেটাকে নিয়ে কী করি।'

মহামায়া হৈমন্তীর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'আমার কাছে রাখবি?'

'তোমার কাছে! ওর কি এত পুণ্য—'

'পুণ্য কি কারো একচেটে সম্পত্তি? ওর মধ্যে ভক্তির বীজ নেই জানিস কী ক'রে? শুনেছিলুম ও খুব উচ্ছৃঙ্খল। তা হ'তে পারে। কিন্তু একবার ফিরলে—' একটু থেমে মহামায়া কথাটা শেষ করলেন, 'একবার ফিরলে ও যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কে জানে! বাল্মীকি ছিলেন দস্যু। আর জগাই-মাধাই—'

হৈমন্তী রোমাঞ্চিত হ'লেন।

'এ-সব মানুষের জীবন মুহূর্তে বদলে যায়।'

'তোমার কি মনে হয়, মা, ও বদলাবে?'

'বদলাতেই হবে। আসল মানুষ আর কতদিন চাপা থাকবে ওর! এখানে কয়েকদিন থাকতে দে—আমার তো মনে হয় পরে ওকে তোরা চিনতে পারবিনে।'

হৈমন্তী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'তা-ই করে', মা, তা-ই করো। তোমার স্পর্শে ওর মতিগতি যদি ফেরে। এ ছাড়া আর উপায় নেই—এই ওর বাঁচবার একমাত্র উপায়। আমি তো এটাই বুঝতে পারছিনে, মা, ও আজ তোমার কাছে এলো কেন? ওর বাপের মতোই নাস্তিক যে ও। কী আশ্চর্য!'

'অঘটনও ঘটে মাঝে-মাঝে।'

না, হৈমন্তী মনে-মনে বললেন, এর মধ্যে আরো কিছু আছে। মা-মহামায়ার কথা উঠলে যে ছেলে ঠোঁট বেঁকিয়ে এমন কথাও বলেছে যা শুনলে কালে আঙুল দিতে হয় সে আজ নিজেই এখানে এসে উপস্থিত। ওর জীবন যে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে এ তারই ইঙ্গিত, তা ছাড়া আর কী? অথচ এই ছেলেকে নিয়ে স্বামীর কত দুর্ভাবনা কত রাগারাগি চটাচটি। দিলে তাড়িয়ে ছেলেটাকে বাড়ি থেকে। আবার দুশ্চিন্তায় নিজেরই চোখ তো কপালে উঠেছে। এদিকে যিনি সব পারেন তিনি অলক্ষ্যে ব'সে মৃদু হেসেছেন; সময় যখন এসেছে, তখন হতভাগা আপনিই ধরা দিয়েছে তাঁর হাতে। রাগ ক'রে হয় না, জোর করে হয় না, যখন হবার আপনিই হয়। চাই ধৈর্য, চাই বিশ্বাস, চাই ভক্তি। মা-র কাছে ছেলের কথা যখনই হৈমন্তী পেড়েছেন তখনই তিনি শুধু বলেছেন, 'অত ভাবিসনে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' এ যে ছেলে-ভুলোনো স্তোক নয় তাঁর কথা যে মিথ্যে হবার নয়, তা তো প্রমাণ হ'লো শেষ পর্যন্ত।

'সত্যি বলো, মা, তুমিই অলক্ষ্যে ওকে টেনে এনেছো।'

'আমার কি এতই শক্তি! তবে এসে পড়লো যখন, ফেলতে পারলুম না। আলুথালু চেহারা, উদ্ধত ভাব, তবু ওরই মধ্যে কোথায় যেন আমি দিব্য আভা দেখলুম। হয়তো ভুল হ'তে পারে।'

হৈমন্তী মুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন।

'আমি ওকে বলেছি এখানে থাকলে কড়া শাসনে থাকতে হবে। ঐ ঘরটি ছেড়ে বেরুতে পারবে না।'

'ও কী বলে?'

'রাজি হ'লো তো।'

'হ'লো? কী করে ঐ দস্যুকে তুমি বশ করলে, মা? সাক্ষাৎ ভগবতী তুমি।'

মহামায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু ওর বাবা ব্যাপারটা শুনে রাগ করবেন না তো?'

রাগ! হুলুস্থুল বাধাবেন। পুলিশ ডাকবেন। ওঁকে বলামাত্র সর্বনাশ হবে, নষ্ট হবে ছেলেটার ভবিষ্যৎ। পরশমণির সন্ধান ও নিজেই যখন পেয়েছে, তখন এখান থেকে ওকে আর ফেরানো নয়; যেমন ক'রে হোক্, এখানেই ওকে রাখতে হবে।

'ওঁকে জানাবার দরকার কী?'

'দরকার নেই বলছিস?'

'না-জানানোই তো ভালো। উনি যে কেমন মানুষ তা আর তোমাকে বলবো কী, না পারেন এমন কাজ নেই। হয়তো একটা হাঙ্গামাই বাধিয়ে তুলবেন।'

'সংসারের ব্যাপার তুই-ই ভালো বুঝিস' বললেন মহামায়া। 'আমার মাথায় ও-সব ঢোকে না।'

খানিক পরে হৈমন্তী বিদায় নিলেন। অরুণের ঘর অন্ধকার। মহামায়া পরদা সরিয়ে ঢুকে আলো জাললেন।

'ঘুমিয়েছিস?'

অরুণ ঘুমোয়নি, চোখ বুজে প'ড়ে ছিলো। চোখ মেলেই শ্রীরাধার জীবন্ত মূর্তি দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো, মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

'এখনো ঘুমোসনি ?'

'কার সাধ্য ঘুমোয় তোমার এ-বাড়িতে। যা হৈ-চৈ !'

'হৈ-চৈ কী রে ? কেত্তন। শুনলে মন পবিত্র হয়।'

'কই, সে-রকম তো কিছু বুঝিনি। তবে তোমাকে এখন দেখে মনটা পবিত্র হ'লো বটে।'

মহামায়া একটু লজ্জিতভাবে বললেন, 'এ-সব করতে হয়, ওরা ছাড়ে না। ভালো লাগে না এ-সব ভড়ং।'

'ভড়ং কেন ? বেশ তো সুন্দর। সত্যি বোধ হয় তুমি রাধা।'

মনে-মনে অরুণের কী যে হাসি পাচ্ছিলো। আহা—বন্ধুদের এনে একবার যদি দেখাতে পারতো ! খাশা !

'তোর যদি তা-ই মনে হয়, তবে তা-ই।...তোর খাবার দিয়ে গিয়েছিলো ?'

'কাঁটায়-কাঁটায় ন'টার সময়।'

'আর-কিছু চাই ?'

'না, ঠিক আছে।'

'মশারিটা ফেলে নিস—মশা আছে।'

'আচ্ছা।'

'আমি যাই। ঘুমো।'

দরজার কাছে গিয়ে মহামায়া হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।—'শোন, আমি কিন্তু বরাবরই জানতুম যে তুই এখানে আসবি।'

'কেন বলো তো ?'

'বাঃ, মানুষের মনের কথা আমি সব জানি যে', ব'লে মহামায়া ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন।

পরের দিন সকালে মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে এখানে ?'

'ভালো, খুব ভালো।' অরুণ আন্তরিকভাবেই বললে কথাটা তার ধোঁয়ারির ঘোর তখনো কাটেনি, প্রশান্ত বিশ্রামই মনে হচ্ছে স চেয়ে কাম্য।

'বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে না তো?'

'মোটেও না।'

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?'

'সত্যি বলবো?'

'সত্যিই তো বলবি।'

'তোমাদের এখানে কি ধূমপান বারণ?'

অরুণ ব'লেই ফেললো কথাটা। কাল সারাদিন সিগারেট খায়নি, আজ সকালে উঠেই ধোঁয়ার জন্য প্রাণ যাচ্ছে।

'ও, সিগারেট না হ'লে বুঝি আর চলছে না বাবুর?'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে মহামায়া বললেন, 'তোরা কি আমাকে পিউরিটান ভাবিস নাকি?'

অরুণ চমৎকৃত হ'লো। মা-মহামায়া যে সত্যি এত উদার, আর তাঁর মুখে যে ইংরিজি বুলিও ফোটে তা সে ধারণাও করতে পারেনি। মা-র ভক্তদের মধ্যে আছেন বড়ো-বড়ো উকিল, ব্যারিস্টর, ডাক্তার, আছেন ডি-লিট-ডিগ্রিওলা অধ্যাপক; তাঁদের সঙ্গে এতদিন মেলামেশার ফলে কিছু-কিছু ইংরিজি বুলি তাঁর রপ্ত তো হয়েইছে, এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানের দু'একটা কথাও তিনি জেনে নিয়েছেন, ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর উপমাগুলো প্রায়ই হয় বিজ্ঞান-ঘেঁষা, আর তা শুনে সেই সব ডাক্তার ব্যারিস্টার অধ্যাপকরাই আত্মহারা হন, এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার তুলনায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে ছেলেখেলামাত্র এই গরিমায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে বাড়ি ফেরেন। মা-মহামায়ার সহজবুদ্ধি অত্যন্ত

তীক্ষ্ণ ব'লেই তাঁর প্রভাব বিধবাদলে আবদ্ধ রইলো না ; আজ তাঁর বহু ভক্তই যাকে বলে উচ্চশিক্ষিত, যাকে বলে আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন।

'তবে সাহস ক'রে আরো একটা প্রার্থনা জানাই। হয় শুয়ে থাকা, নয় দাঁড়িয়ে থাকা, এটা কেমন বেখাপ্পা লাগে।'

"কেন, তক্তাপোষে বসা যায় না ?'

'যায় বইকি, নিশ্চয়ই যায়, তবে কিনা একখানা চেয়ার হ'লেই ভালো হয়। আর—'

মহামায়া কপাল কুঁচকে বললেন, 'আর কী ?'

'আপাতত এখানেই যখন থাকা স্থির, সময় তো কাটাতে হবে। কিছু বই-টই—'

'তা দিতে পারি। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়েছিস ?'

অরুণ সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'খুব ভালো বই শুনেছি। আছে নাকি তোমার কাছে ?'

'আচ্ছা, আগে বৈষ্ণব-পদাবলী পড়্।'

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তো ? নিশ্চয়ই পড়বো। চৈতন্যচরিতামৃতও পড়বো। তবে তারি সঙ্গে দু'একটা নভেল-টভেল কি মাসিকপত্র—'

মা-মহামায়া হাসলেন।—'ভারি দুষ্টু তুই।'

পকেট থেকে দুটো চকচকে জিনিস বার ক'রে অরুণ বললে, 'এ দুটো রাখবে তোমার কাছে ?'

'কী ওঁ ?'

'দ্যাখো না হাতে নিয়ে।'

'মোহর। কোথায় পেলি ?'

অরুণ চুপ।

'খুব বড়োলোক হয়েছিস তো, মোহর পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াস !'

'ছিলো আমার কাছে।'

'বৌয়ের বাক্স ভাঙিসনি তো ?'

'বোধ হয়। নয়তো কোথায় পাবো এ-সব।'

'আমি কী করবো এ দিয়ে। তোর কাছেই থাক।'

'আমার কোনো দরকার নেই। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলাম নিলে ধন্য হই।'

'সর্বস্ব দিলি! কথাটা মনে থাকে যেন।' মা-মহামায়া এক হাসলেন। একটু পরে বললেন, 'তোকে দেখে আমার মনে হয় কী জানিস ?'

'কী মনে হয় ?'

'তুই যেন পূর্বজন্মে আমার সখা ছিলি।'

অরুণের ঠোঁটে ক্ষণিক একটু হাসি খেলে গেলো।

'হাসছিস ? তোরা তো এ-সব মানিসনে। কিন্তু দ্যাখ্ না, তুই আমার সঙ্গে যে রকম সহজভাবে কথা বলিস আর-কেউ কি পারে সে-রকম! ওরা যে আমাকে কী ভাবে—হাসি পায়। আসলে আমি যে অতি সাধারণ মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নই তা আমি তো জানি। তোর সঙ্গে কথা বলতে আমারও তাই ভারি ভালো লাগে। এত লোক আসে যায়, আমাকে এমন আপন ক'রে নিতে আর তো কেউ পারলে না। এইজন্যে মনে হয় তুই আমার পূর্বজন্মের বন্ধু—সখা।'

কথাগুলো শুনতে-শুনতে অরুণ হঠাৎ নিজের উপর অত্যন্ত খুশি হ'য়ে উঠলো। সে-ও যে এমন-কিছু পারে যা আর কেউ পারে না, এ-রকম কথা এর আগে কারো মুখে সে শোনেনি। তাহ'লে তার মধ্যেও হয়তো অসাধারণ কিছু আছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার ঘরে টেবিল চেয়ার এলো, এলো সিগারেটের টিন আর দেশলাই। এক ঝুড়ি মাসিকপত্রও পৌঁছলো এসে। মায়া-মন্দিরের সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা দেখে অরুণ একটু অবাকই

হ'লো। যখন যা চাই, তক্ষুনি তৈরি। কাজ যারা করে তারা নীরব, জিজ্ঞেস না করলে কথা বলে না, জিজ্ঞেস করলেও ঠিক জবাবটি দিয়েই চুপ করে। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলে না, আপনি কে, কবে এসেছেন, ক'দিন থাকবেন। এমন কি তাদের মুখে-চোখেও কোনো কৌতূহল ফুটলো না। এ ভারি চমৎকার।

চেয়ারে ব'সে অরুণ পা তুলে দিলে টেবিলে। একটা মাসিকপত্র হাতে নিয়ে ধরালে সিগারেট। এমন সময় হঠাৎ মা-মহামায়া এলেন।

অরুণ ব্যস্ত হ'য়ে পা নামিয়ে সিগারেট ফেলে দিতে যাচ্ছিলো, মহামায়া বললেন, 'থাক, থাক। ওগুলো না-খেলে তোর যখন চলেই না—খাবি। ওতে আর লজ্জা কী?'

তবু অরুণ সিগারেটটায় ঠিক টান দিতে পারলে না, দু' আঙুলে ধ'রে রইলো।

'এ বইটা আনলুম তোর জন্যে।' মোটা একটা বই মহামায়া টেবিলের উপর রাখলেন।

'ও, মহাজনপদাবলী।'

'হ্যাঁ, ও থেকে আমাকে প'ড়ে শোনাবি মাঝে-মাঝে?'

'তোমাকে প'ড়ে শোনাবো! তোমার তো সব মুখস্থ।'

'তাও শুনে-শুনেই। তুই বোধ হয় জানিসনে যে আমি লিখতে-পড়তে জানিনে।'

'একেবারেই না?'

'একেবারেই না। কেত্তন কথকতা তাই এত ভালোবাসি।'

'বই প'ড়ে শোনায় না কেউ?'

'তাও শোনায়। এবার তোর মুখে পদাবলী শুনবো। তোরও পড়া হবে।'

নিঝুম দুপুরবেলায় অরুণ ভাবছিলো তোফা একটি ঘুম দেবে, সত্যি-সত্যি মহামায়া এসে বললেন, 'পড়্।'

অরুণ চোখ রগড়ে উঠে বসলো।

'পড়তেই হবে ?'

'পড়্ না। খুব ভালো লাগবে।'

অরুণ অনিচ্ছায় চেয়ারে গিয়ে ব'সে মোটা বইখানা খুললো।

'চণ্ডীদাস পড়্।' মহামায়া মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে পড়লেন।

'ও কী। তুমি ওখানে বসলে কেন ?'

'আমি ও-রকমই বসি।'

'তাই ব'লে মেঝেতে—'

'মেঝেতেই আমার ভালো লাগে। আরম্ভ কর্।'

অরুণ চণ্ডীদাস খুললো। জীবনে সে বৈষ্ণব কবিতা পড়েনি, বাংলা কবিতাও পড়েনি পাঠ্যকেতাবের বাইরে। চণ্ডীদাস পড়া তার পক্ষে, তাই, কঠোর শ্রম। কিন্তু শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনা তার মনে একটা আবিল রস ঘনিয়ে তুললো। কোনো-কোনো কথার মানে জানে না, আঁচ ক'রে নিতে দেরি হ'লো না। যার মনের ভিতর যা আছে, কাব্য শিল্প সাহিত্য থেকে সে তা-ই পায়। শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি সরকারি পেয়াদারা মহোল্লাসে পোড়ায় অশ্লীল ব'লে, আবার ঐ অশ্লীল খ্যাতিটার জন্যই মাননীয় মহিলারা, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়েন (পাছে ছেলেমেয়েরা দেখে ফ্যালে), প'ড়ে হতাশ হন। মন যার নোংরা, তার কাছে সবই নোংরা, যে-কোনো বই, যে-কোনো ছবি থেকে একটা অশ্লীলতার শুড়শুড়ি আদায় ক'রে নিতে পারাতেই তার বাহাদুরি। চণ্ডীদাসের কাব্যে অরুণও পর্নোগ্রাফির রসই পেলো, আর-কিছু পেলো না। পড়তে-পড়তে লাল হ'য়ে উঠছিলো তার মুখ,

কোনো-কোনো কথা যাচ্ছিলো মুখে বেধে, আর ভিতরে-ভিতরে একটা মৃদুরকমের শুড়শুড়ি উপভোগ করছিলো। খাশা লিখেছে তো—আগে পড়েনি কেন?

মহামায়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তিনি চোখ বুজে তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ির আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে—খেয়াল নেই।

ঘণ্টাখানেক পর মহামায়া হঠাৎ উঠে বললেন, 'আজ এই থাক্, কাল আবার শুনবো।'

আজ দুপুরেও তিনি এসেছিলেন, খণ্ডিতা নায়িকার বিরহবর্ণনা পড়া হ'লো। অরুণ কখনো ভাবতে পারেনি ধর্মেও এত রস আছে।

এইভাবে মায়া-মন্দিরে তিনটে দিন তার কেটেছে—ভালোই কেটেছে। এখন তার মনে হচ্ছে বাবা চ'লে যাওয়া পর্যন্ত সত্যিই যদি তার এখানে কাটাতে হয়, হয়তো অসহ্য লাগবে না। আর-সবই ঠিক আছে—সন্ধেবেলা এক ফোঁটা হুইস্কি যদি পাওয়া যেতো! ঐ মহাদেব-বাবার সঙ্গে গোপনে ভাব ক'রে নিলে পারে। তাঁকে দেখেই বোঝা যায়, তুরীয়ভাবে অভ্যস্ত। হয়তো দিতে পারবেন ব্যবস্থা ক'রে। তাহ'লে আর-কোনো ভাবনা থাকে না। এমনিতে—জীবন একঘেয়ে নয় মায়া-মন্দিরে। এই তো উজ্জ্বলা এসে নেপথ্যবাসী তাকে বিচিত্র-রকমের একটা আমোদের জোগান দিলে। উজ্জ্বলার কথা শুনে, কান্না শুনে কত কষ্টে হাসি চেপে গেলো সে।

মা-মহামায়া বললেন, 'অমন কোরো না, উজ্জ্বলা।'

কান্নার ভিতর দিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় উজ্জ্বলা বললে, 'কী হবে আমার বেঁচে! কেন আমি জন্মেছিলাম—কেন আমি জন্মেই ম'রে যাইনি!' হঠাৎ মনে পড়লো তার স্বামীর কথা, তার কোন্ পাপে স্বামী

এমন হলেন! তাও আজ সাতদিন উধাও—কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করছে? আমি তো কিছু নই—কিন্তু খোকা, খোকার কথাও কি মনে পড়ে না? চোখে দেখতেও ইচ্ছে করে না একবার?

শোকের নতুন উচ্ছ্বাসে চূর্ণ হ'য়ে গেলো উজ্জ্বলা। মিনিট দু'তিন উজ্জ্বলার ফোঁপানি ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই সেই সুন্দর শান্ত বারান্দায়।

'তোমার স্বামীর জন্যে চিন্তা কোরো না। সে ভালোই আছে।'

মা-মহামায়ার এ-কথা শুনে চমকে চোখ তুলে তাকালো উজ্জ্বলা। কী ক'রে জানলেন তিনি তার মনের কথা?

'ভালোই আছে সে। তার জন্যে ভেবো না,' মা আবার বললেন।

কথাটার তাৎপর্য এক হৈমন্তীই বুঝলেন, কারণ অরুণের সাম্প্রতিক খবর কাউকেই তিনি বলেননি—মিনিকেও না।

লজ্জার মাথা খেয়ে উজ্জ্বলা জিজ্ঞেস করলে, 'তিনি কবে ফিরবেন?'

হঠাৎ মধুর হেসে মা-মহামায়া বললেন, 'ফিরবে রে, ফিরবে। অমন বাড়ি, এমন টুকটুকে বৌ—ক'দিন থাকবে আর এ-সব ফেলে!'

অরুণ রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি কথা শুনলে। হঠাৎ মনটা একটু বিরস হ'য়ে গেলো তার। সহ্য হয় না মেয়েলি নাকিকান্না—এর ভয়েই তো আজকাল পারতপক্ষে বাড়িই থাকে না সে। এখানে ছিলো ভালো, উজ্জ্বলার কথা মনেই পড়েনি, এর মধ্যে এ আবার কী! মা-রই বা বুদ্ধি কেমন, সব জেনে-শুনেও ওকে নিয়ে এসেছেন! ওর ফোঁসফোঁসানি যে থামেই না—কাঁদতেও পারে মেয়েটা!

আরো একটু কেঁদে উজ্জ্বলা চুপ করলো। পাপী মন তার—এরই মধ্যে বাড়ির জন্য, ছেলের জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছে। এখানে আছে গভীর শান্তি, কিন্তু শান্তি কি সে চায়? তার যে দুঃখের কপাল—দুঃখের জ্বলুনি-পুড়ুনিই তাকে টানে। অবাক হ'য়ে যায় শাশুড়িকে

দেখে। সংসারে আছেন, অথচ নেই, হাওয়ায় ভাসছেন যেন। তাঁর নির্লিপ্ততার শতাংশও যদি তার থাকতো।

হৈমন্তী বললেন, 'মা, এর মধ্যে তুমি কি একদিন আসবে আমাদের বাড়ি?'

'তোদের ইচ্ছাই তো আমার ইচ্ছা।'

'আমার মনে হয় তোমার একটু স্পর্শ পেলেই কমল সেরে যাবে।'

মা-মহামায়া বিস্মিতভাবে বললেন, 'আমাকে তোরা ভাবিস কী, বল্ তো? আমি কি ভগবান?'

হৈমন্তী বললেন, 'প্রতিমার পুজো করি—প্রতিমাই কি ভগবান?'

'ও, আমি বুঝি তোদের জ্যান্ত পুতুল?'

'ভগবানের ধারণা করতে পারি, আমাদের মন কি এতই বড়ো? তোমার মধ্যেই তাঁকে দেখি। বলো, মা, কবে যাবে।'

মা-মহামায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যেদিন বলবি সেদিনই যাবো।—এখন যা তোরা—লীলামঞ্চে বোস গিয়ে।'

মা ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। মেয়েকে পুত্রবধূকে নিয়ে হৈমন্তীও নেমে এলেন। বিকেলের আলো ঢ'লে পড়েছে, লীলামঞ্চে ভক্তরা জমছে এঁকে-একে। আজ শনিবার, মা একটু সকাল-সকালই নামেন। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মায়া-মন্দিরের প্রাঙ্গণ আর সামনের রাস্তা মোটরগাড়িতে কালো হ'য়ে যাবে।

উজ্জ্বলা চুপি-চুপি শাশুড়িকে বললে, 'আমি কি এখন চ'লে যাবো।'

'না, না, যাবে কী—কতদিন পর মন্দিরে এলে, থাকো, গান-টান শোনো, মন ভালো হবে।'

উজ্জ্বলা চুপ ক'রে রইলো। শাশুড়ি তো ফিরবেন সেই কত রাত্তিরে!

মিনি বললে, 'বৌদি, কমলের জন্যে ভাবছো? বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে?'

উজ্জ্বলা কিছুই বললে না, মাথা নিচু ক'রে রইলো।

'এখনো কি তোমার মনে হচ্ছে না যে আর ভয় নেই, ও সেরে যাবে?' মিনি উজ্জ্বলার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো।

'তোর তা-ই মনে হ'লো, মিনি?'

'নিশ্চয়। এখানে এলে কী যে মনে হয় তোমাকে তা বোঝাতে পারবো না, বৌদি। এত ভালো লাগে!'

উজ্জ্বলা কলের মতো বললে, 'আমারও খুব ভালো লাগে।'

'মনে হয়, কেউ আর আমাকে দুঃখ দিতে পারবে না। কেউ না।'

উজ্জ্বলা ভাবলে মিনি তো সুখী, কোনো দুঃখই ও জানে না, অথচ ওর মন স্বতঃই ঝুঁকেছে এদিকে, দিন-দিনই আরো নিবিষ্ট হচ্ছে। আর এত দুঃখেও আমার মনের কালিমা ঘোচে না, সমস্ত প্রাণমন এখনো সঁপে দিতে পারলুম না মা-কে। এমনি অভাগিনী আমি!

লীলামঞ্চে ঢুকলো তিনজনে।

চাওয়া ও পাওয়া

১

স্থান—পশ্চিম-বঙ্গের কোন একটি গণ্ডগ্রাম।

কাল—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ।

স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, গরম চাদরে পা হইতে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া, চিত হইয়া শুইয়া, একখানা বাংলা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। দিন কই হইল, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। স্কুলে ছাত্রগুলিকে নিজ নিজ ক্লাসে আটকাইয়া রাখা ছাড়া বিশেষ আর কোন কাজ নাই। কাজেই সপ্তাহ খানেক ধরিয়া একটানা ইতিহাস ভূগোল ও ব্যাকরণের অশুদ্ধি সংশোধন করিতে করিতে শুকাইয়া-উঠা মনটাকে একটুখানি সরস করিয়া লইবার জন্য নর-নারীর মিলন-বিরহ কাহিনীর গাঢ় ও মধুর রসের প্রলেপ লাগাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে, পত্নী সুখদাসুন্দরী আহার ও রান্নাঘরের কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া, শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিয়া দৈনন্দিন অভ্যাসমত দেওয়ালে টাঙানো আয়নাতে নিজের চেহারাটি একবার দেখিয়া লইয়া, পার্শ্বে বিস্তৃত খাটে নিদ্রিত ছেলে-মেয়েদের তদারক করিয়া, বিনয়ের খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কিছুক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "অদ্ভুত মানুষ!" পত্র-চিহ্ন হিসাবে তর্জ্জনীটি পঠ্যমান পত্রের উপর রাখিয়া, বইখানি বন্ধ করিয়া বিনয় পত্নীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি হ'ল?"

বিনয়ের পাশেই বিছানার উপর চাপিয়া বসিয়া সুখদা কহিল, "বিয়ের কথা কিছু ভাবছ? না, অমনই আলগা-আলগা দিন কাটা চলবে?" স্ত্রীর এই অতর্কিত আক্রমণে বিনয় কিঞ্চিৎ ঘাবড়াইয়া কিন্তু চট করিয়া সামলাইয়া লইয়া কহিল, "ও! এই কথা! ও তোমাকে ভাবতে হবে না।" বলিয়া আবার বইখানি খুলিয়া উপক্রম করিতেই সুখদা ছোঁ মারিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, ঠিক করেছ শুনি?" বিনয় অসহায় ও অনুপায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ প মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "ঠিক একটা কিছু করেছি, পরে ব 'খন।" সুখদা বইটা অদূরবর্ত্তী একটা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "পরে বলব মানে? আমি কি তোমার পর ভাগে-ভাগে বললে ভাঙচি দিয়ে দেব?" যুক্তিটা অকাট্য; কা উঠিয়া বসিয়া, বার দুই ঢোক গিলিয়া বিনয় কহিল, "মানে—এমন পাকাপাকি ঠিক করি নি, তবে মনে মনে একটু আঁচ ক'রে রেখেছি- মানে—ছেলেটি ভালই, আর অনুরোধ করলে ঠেলতে পারবে না।" ভুরুইটি কুঁচকাইয়া সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কে আবার তেমন ছে তোমাদের গাঁয়ে রয়েছে? সবগুলিই তো বাপের স্কন্ধে ভর ক'রে খেয়ে দেয়ে, ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—চাকরী-বাকরী ক'রে এ পয়সা ঘরে আনবার মুরোদ কারও নেই।" মাথা চুলকাইয়া বিনয় কহি "তুমি হয়তো খুব পছন্দ করবে না, কিন্তু—" সুখদা ধমকের সুরে কহি "বকিয়ে রাখ দেখি! কি নাম বল?" বিনয় কোন মতে বলিয়া ফেলি "আমাদের পরেশ।"—বলিয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল। সুখ চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ছিঃ। তোমার কি রুচি! কুলী বামুনের মেয়েকে মেয়ে-বেচা পুরুত বামুনের ঘরে দেবে? ওর পিসী বিয়েতেও যে ওর বাবা এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছিল, শুনি—" বিনয় হা

তাঁর অসুখের খবর যখন আসে, সে নিজে আবিষ্কার ক'রে নিজেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো—কিন্তু কোনো কারণেই এখন আর তার খুশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে না। বাবাকে দেখে তার নীল চোখ দুটি একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, গালে দেখা দিয়েছে লাল রং—কিন্তু এই পর্যন্তই। পাছে তিনি তারও কোমর জাপ্‌টে ধ'রে শূন্যে ঘুরপাক খাওয়ান, সেই ভয়ে সে দু'পা পিছনে স'রে গেলো। সে বড়ো হয়েছে, তাকে এখন আর এ-সব মানায় না। বুলির কথা আলাদা; ও এখনো ছেলেমানুষ। কিন্তু বাবার তো এ সব বিষয়ে মোটে কাণ্ডজ্ঞান নেই।

তারপর হঠাৎ মিনির মনে পড়লো যে বাবাকে তার প্রণাম করা উচিত। বাবাকে তারা কোনোদিনই গুরুজন ব'লে ভাবতে শেখেনি; তিনি তাদের সব চেয়ে আপন, সব চেয়ে দিলখোলা দরাজ বন্ধু—তাঁকে প্রণাম করার কথাই ওঠে না। এ থেকে তাদের অভ্যেসই খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো, অন্যান্য গুরুজনেদেরও প্রণাম করতে ভুলে যেতো, এমন কি প্রথম-প্রথম মা-মহামায়াকেও প্রণাম করবার কথা মনে থাকতো না। তারই ফলে মা তাদের শিক্ষার এই গুরুতর ত্রুটি শোধন করবার জন্যে যথেষ্ট যত্ন নিতে শুরু করেন;—বুলি এখনো ঠিক শায়েস্তা হয়নি, কিন্তু মিনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রণাম করাটা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছে। তবু, বাবার পায়ে হাত দিতে তার কী-রকম লজ্জা করছিলো। কিন্তু এই লজ্জা সম্বন্ধেই তার লজ্জিত হওয়া উচিত, এই মনে ক'রে সে আড়ষ্টভাবে এগিয়ে এসে হঠাৎ নিচু হ'য়ে বাবার বুটে হাত দিলো।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা অত্যন্ত অসঙ্গত উচ্চহাসি তার কানের পরদায় এসে লাগলো; আর পরের মুহূর্তেই সে দেখলো সে শূন্যে উঠে গেছে। 'আরে তুই আবার এ-সব শিখলি কবে! একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটি হ'য়ে গেছিস—আঁা? শ্বশুরবাড়ির রিহার্সেল দিচ্ছিস বুঝি?' হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অরিন্দম, বালিগঞ্জের শান্ত বিকেলবেলাটি যেন ঢিল-ছোঁড়া

নীল পুকুরের মতো কেঁপে উঠলো। মিনি এমন চমকে উঠে মৃদুস্বরে দু' একবার উঃ-আঃ ছাড়া কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে না। পাছে হাত-পা ছুঁড়লে কাপড়চোপড় আরো বিস্রস্ত হ'য়ে সেই ভয়ে শক্ত হ'য়ে প'ড়ে রইলো; আর অরিন্দম সিনেমার নায় মতোই অনায়াসে এই একুশ বছরের দেড় মনি মেয়েকে পাঁজা ক'রে তুলে বারবান্দা পার হ'য়ে বসার ঘরে নিয়ে একটি সোফার আস্তে বসিয়ে দিলেন: এতে তাঁর নিঃশ্বাস একটু ভারি হ'লো না যদিও বয়স তাঁর পঞ্চাশের উপর।

'কেমন জব্দ! আর প্রণাম করতে আসবি বাবাকে!' এ কথা বলতেই বুলি আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো; মিনির দুর্দশা তার চেয়ে বেশি কেউ উপভোগ করেনি। তার বয়স অল্প জিনিসটাকে শাসনে রাখতে হয় বাঙালি মেয়ের এই অতি জরুরি এখনো তার হাড়ে ঢোকেনি।

সোফায় ধ'সে ব'সে মিনি হাঁপাতে লাগলো। জলে ডুবতে- বেঁচে গেলেও বোধ হয় তার নিঃশ্বাস এর চেয়ে ঘন-ঘন পড়তো ট্যাক্সিটাও তখনো বিদেয় হয়নি, বাহাদুর মাল নামাচ্ছিলো··· বাবাকে নিয়ে আর পারা যায় না! সে ভাববার চেষ্টা করলো ওঠবার সময় পায়ের গোড়ালি থেকে তার কাপড় স'রে গিয়ে কিনা, গেলেই বা কতটুকু গিয়েছিলো কিন্তু একটু পরে এ- মীমাংসা করবার চেষ্টাই ছেড়ে দিলে। মা ঠিকই বলেন, বাবার বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি এখনো ছেলেমানুষের মতোই।

অরিন্দম মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন, '··, এই তো টুকটুকে রং হয়েছে মুখের। তোর ফ্যাকাশে মুখ দেখে ভ কী জানি তোকে বুঝি অ্যানেমিয়ায় ধরেছে, তাই একটা প করলুম।'

বুলি বললে, 'জানি, জানি, মিনি ফর্শা কিনা, তাই তুমি ওকেই বেশি ভালোবাসো।'

'নাঃ, মিনিকে আর ভালোবাসবো না। ও আমাকে প্রণাম করতে আসে। কয়েকদিন পরে একটা টেকো বুড়োকে বাবা ব'লে ডাকবে কিনা, তাই এখনই আমাকে দূর ক'রে দিচ্ছে।'

বুলি বললে, 'বাবা, তোমারও তো টাক!'

'আমার? কই, না।' অরিন্দম মাথায় একবার হাত বুলোলেন। 'তালুর কয়েকটা চুল উঠে গেছে—ওকে কি আর টাক বলে! যত বাজে কথা তোদের!' প্রায় ছ' আঙুল উপর থেকে তাঁর প্রশস্ত নিতম্ব ধুপ্ ক'রে একটা চেয়ারের উপর পড়লো, স্প্রিংগুলো একবার ক্যাঁ কোঁ ক'রে উঠলো। এ-রকম ক'রেই তিনি বসেন। কোনো কাজ তিনি আস্তে করতে পারেন না, সভ্য হাবভাব তাঁর ধাতেই নেই। চীৎকার ছাড়া তিনি কথা বলেন না, অট্টহাসি ছাড়া হাসেন না; তিনি যেখানে, সেখানে সব সময়ই একটা হৈ-চৈ লেগে আছে। মানুষটা ভয়ানক উচ্ছ্বাসী প্রগল্ভ, এমনকি উচ্ছৃঙ্খল—একটু স্থূল প্রকৃতির সন্দেহ নেই—মনের সমস্ত ভাব শস্তা নাটকে ধরনে চড়া রঙে প্রকাশ না-ক'রে তিনি পারেন না। ঠাট্টা-তামাশা গল্প-গুজবে বেপরোয়া ফুর্তিতে ভরপুর, রসিকতার সুযোগ পেলে সুরুচির সীমা পার হ'য়ে যেতে তাঁর আটকায় না, নিজের ছেলেমেয়ের সামনেও নয়; জীবনে কখনো তিনি শালীনতা কি সংযমের ধার ধারেন নি, ও-সব মহামূল্য গুণ তাঁর মতে রক্তহীন রুগ্নতারই নামান্তর। নিজের স্বাস্থ্যটা তাঁর জবরদস্ত্ বটে। মাঝারি লম্বা, ঠিক মানানসই রকম চওড়া, মোটা মজবুত হাড়ে পেশীবহুল শরীর, এক ফোঁটা অতিরিক্ত মেদ নেই। মাথার উপরের দিকে যদিও ছোট্ট টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, তবু সামনের দিকে যথেষ্ট চুল, এবং সে-চুল ঘন আর বেশির ভাগই কালো।

পুরু ভুরুর নিচে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সরল, যদিও চোখের তলায় ও নাকের দু'পাশে বয়সের স্পষ্ট রেখা পড়েছে। তাঁর এই অটুট নিটোল স্বাস্থ্য বিস্ময়কর শুধু এই কারণে নয় যে তাঁর বয়স বাহান্ন, জীবনে তিনি শরীরের উপর অত্যাচারও কম করেন নি, এবং প্রকৃতির প্রতিশোধের লক্ষণ এতদিনে দেখা দেয়া উচিত ছিলো। যে-নীল রঙের ডোরাকাটা শার্টটি তিনি পরেছেন তা তাঁর শরীরের আবরণের কাজ না ক'রে বিজ্ঞাপনের কাজ করছে, সুগঠিত উদর থেকে শুরু ক'রে সুগোল, ঢালু কাঁধ পর্যন্ত একেবারে নিখুঁত ছন্দে ঢালাই করা; বুকটা মস্ত, মণিবন্ধ দৃঢ়, হাত দুটো বড়ো-বড়ো, তার উপর আঙুলের গাঁটে-গাঁটে কালো লোমের ছড়াছড়ি, নখ অনেকদিন কাটা হয় না। কিন্তু বিলিতি পমেটম মাখা চুল বেশ যত্ন ক'রেই টেড়ি কাটা; বেশ বোঝা যায়, গাড়ি থেকে নামবার ঠিক আগে তিনি আয়না-চিরুনির ব্যবহার করেছেন, গাড়িতে দাড়ি কামাতেও ভোলেন নি। তাঁর গায়ের রং কালোর দিকেই, মিনির চাইতে বরং বুলির মতো, কিন্তু মুখের চামড়া ভারি মসৃণ ও চিক্কণ—সমস্ত মানুষটার মধ্যে মার্জিত বলতে শুধু ঐ চামড়াটাই। মুখটা তাঁর গোল ছাঁদের, থুতনিটি ছোটো, মোটা ঠোঁট দুটোয় যেন ভিতরকার স্থূলতারই ইঙ্গিত। মুখটা দেখতে বিশেষ ভালো নয়, বরং কুৎসিতই, আর সব জড়িয়ে চেহারাটা এমন যে রেলগাড়ির কামরায় ইনি আপনার একমাত্র সহযাত্রী হ'লেও আপনার আলাপ করবার একটুও ইচ্ছে হবে না। কিন্তু যদি তিনি আলাপ করেন (যেটা খুবই সম্ভব) আর আপনি তাঁকে আমল দেন, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত দেখবেন সময়টা ভালোই কেটেছে—হ'লোই না-হয় সাতশো মাইলের রাস্তা।

খাকি শর্টস্-এর পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস বার ক'রে অরিন্দম একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটটা ভর্জিনিয়া-টর্কিশের

একটা বিশেষ মিশেল, গত কুড়ি বছরে অন্য কোনো মার্কা তিনি খাননি। হাতের কাছে টেবিলের উপর যদিও অ্যাশট্রে সাজানো, দেশলাইয়ের কাঠিটা ভালো ক'রে না নিবিয়েই মেঝেতে ফেলে দিলেন।

'বাহাদুর!'

অরিন্দমের বহুকালের পুরোনো প্রিয় চাকর বা[illegible] নিঃশব্দে দরজার কাছে দাঁড়ালো। বেঁটে লোকটা, হঠাৎ [illegible]ক মনে হয়, কিন্তু বয়েস কোন্ না চল্লিশ হবে। নাক চোখ নেই, হলদে নেপালি রং রোদে পুড়ে-পুড়ে তামাটে হ'য়ে গেছে। মোজা, বুট আর কুরকি সে প্রায় কখনোই ছাড়ে না, কিন্তু ঐ নিয়ে যে কী ক'রে অত নিঃশব্দে চলাফেরা করে! লোকটার হাব-ভাব অনেকটা বেড়ালের মতো, নেহাৎ দরকার না হ'লে কথা বলে না, যদিও বেড়ালের মতো অলস অবশ্য নয়। সমস্ত কাজে এমন অস্বাভাবিক নিপুণ ও ক্লান্তিহীন যে মনে হয় ওর হাড়গুলো বুঝি রবারের তৈরি। ছ'শো মাইল দূরে একা-একা অরিন্দমের দিন কাটে; কি বাংলোয় কি ক্যাম্পে কি জঙ্গলে এই বাহাদুরের জন্য তাঁর শরীরের আরামে অন্তত কোথাও ফাঁক পড়ে না। অরিন্দম শারীরিক শ্রমকে গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু আরামের অভাব অপছন্দ করেন। জীবনে তিনি রোজগার করেছেন ঢের, খরচও করেছেন দু'হাতে। শরীরের সুখই যদি না হ'লো, তাহ'লে আর এত কষ্ট ক'রে টাকা রোজগার করা কেন? নিজেকে তিনি বেশ সুখেই রেখেছেন বরাবর, বাড়ির সকলকেই রেখেছেন।

'জিনিসগুলো তুলেছিস?'

'হুঁ।'

'এটা নে।'

কোমর থেকে চামড়ার বেল্টটা খুলে অরিন্দম বাহাদুরের হাতে

দিলেন। বেল্টটার সঙ্গে খাপে ঢাকা একটা রিভলভর। অভ্যে
বশেই ওটা সঙ্গে রাখেন, আর কোনো কারণ নেই। পাখি কি ছো
জানোয়ার শিকার করা আজকাল তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছে
তবে অবশ্য মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে এমন সব জায়গায় তাঁকে সফ
যেতে হয় যেখানে মানুষরূপ পশুর জন্যেও এক-আধটা অস্ত্র হা
থাকা ...

'... আমার শোবার ঘরে রাখিস। বাথরুমে কাপড় দে।'

'দিয়েছি।'

এতদিনেও অরিন্দম বাহাদুরের নৈপুণ্যের ঠিক আন্দাজ পে
উঠলেন না, এখনো মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে যান। এ ক'মিনিটে
মধ্যেই তাঁর শোবার ঘরে ও বাথরুমে সমস্ত দরকারি জিনিস ঠিক ঠি
জায়গায় সাজানো হ'য়ে গেছে, চোখ বুজে হাত বাড়ালেও পাবেন
সমস্ত শরীরে স্নানের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন—রেলগাড়ি
ফর্স্ট ক্লাস কামরাতেও স্নানের যা ব্যবস্থা! কিন্তু ওঠবার তাড়া নে
কিছু, আট মাস পরে এই তো বাড়ি এলেন। প্রশস্ত চেয়ারটা
শরীরের অর্ধেক এলায়িত ক'রে মেঝের মধ্যে অনেকদূর পা চালিয়ে
দিয়ে তিনি সিগারেটটি উপভোগ করতে লাগলেন।

বেল্ট হাতে ক'রে বাহাদুর বেরিয়ে গেলো, একটু পরেই ফিরে এলো
পাৎলা একজোড়া স্যাণ্ডেল হাতে ক'রে। অরিন্দমের সামনে দু'হাটু
পেতে ব'সে বুটের ফিতে খুলতে লাগলো।

হঠাৎ বুলি ব'লে উঠলো, 'বাবা, এই হাফ-প্যান্টগুলো পরো কেন?
কী বিশ্রী দেখায়!'

'আমরা জংলি মানুষ—আমাদের আবার বিশ্রী আর সুশ্রী!'

বুলি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মাগো, পুরুষমানুষের উরু
কী কুৎসিত!'

বুলির মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই এক কাণ্ড হ'লো। মিনি উঠে এসে হঠাৎ ছোট্ট একটা চড় বসিয়ে দিলো বুলির গালে। এতক্ষণে মিনি অনেকটা সামলে উঠেছিলো, কিন্তু বুলির এই শেষের কথাটা শুনে তার সমস্ত মুখ আর কান এমন ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো যে তার মনে হ'লো সে যেন চোখ মেলে তাকাতেও পারছে না। সত্যি, এ-সব[illegible] বাড়াবাড়ি অতি বিশ্রী। বুলিটার কি কোনোদিনই বুদ্ধি ব'লে কিছু[illegible]না! মিনি কল্পনাও করতে পারেনি যে সে হঠাৎ অনুচ্চারণীয় কিছু ব'লে ফেলবে—তাও বাহাদুরের সামনে! আর বাবাও এমন—এ-সব অসভ্যতার হাসিমুখে প্রশ্রয় দেন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা তাঁর কতকালের ইয়ার! [illegible]ন্তু বুলিকে এখন শিক্ষা না দিলে অসম্ভব হ'য়ে উঠবে, সুত[illegible] মিনি উঠে গিয়ে ছোটো একটু শিক্ষা দিলে।

অরিন্দম অবাক হ'য়ে দু'মে[illegible] দিকে তাকালেন, কিন্তু বাহাদুর টান দিয়ে একটা বুট খসিয়ে আর [illegible]কটাতে হাত দিলে; তার বাঁকানো পিঠ ঠিক একই রকম বাঁকা, তার দ্রুত আঙুলগুলি মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ হবার কোনো আভাস দিলে না।

অরিন্দম ব'লে উঠলেন, 'মিনি, তুই ওকে মারলি যে?'

মিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'বেশ করেছি।'

'কিন্তু কেন মারলি?'

বুলি ব'লে উঠলো, 'দেখলে তো, বাবা, তোমার আহ্লাদি মেয়ের কাণ্ড দেখলে! ও কিনা ফর্শা, আর আমি কিনা কালো, তাই ও সব সময় আমাকে মারে। আমি এখানে থা[illegible]কবো না, বাবা, ওরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না—এবার আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।'

বুলি প্রায় কেঁদে ফেলছিলো, কিন্তু কাঁদতে তার আত্ম-সম্মানে বাধলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ ক'রে রইলো। বুট আর মোজা নিয়ে

বাহাদুর অন্তর্হিত হ'লো। স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে অরিন্দম বললেন, 'বুলি, আমার কাছে আয়।'

বুলি যদ্দূর সম্ভব নিজের মর্যাদা বজায় রেখে উঠে গিয়ে বাবার পাশে বসলো। অরিন্দম তার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে? মিনি মেরেছে? তা সত্যি-সত্যি তো আর মারেনি, এই [illegible] খেলা। দু'বোন থাকলে মাঝে-মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হবেই, তা না হ'লে আমার তো বাপু ভালো লাগে না। লেগেছে? লাগেনি, না? ও, একটুখানি লেগেছে বুঝি? তা একটুও যদি না লাগবে তবে আর চড় মারা কেন, বল্?'

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুলি হেসে ফেললো। বললে, 'তাহ'লে আমি ওকে এখন একটা চড় মারি?'

'মারবি? আচ্ছা—না, থাক্, তার চেয়ে বরং এক কাজ কর্। এই চাবিটা নে। আমার সুটকেসে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আছে, সেটা নিয়ে আয় দেখি। ঠিক উপরেই আছে—বেশি ঘাঁটিসনে।'

এক্ষুনি যে-কাণ্ডটা হ'য়ে গেলো, তা সত্ত্বেও দু'বোনে মুহূর্তে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে গেলো। এই বাক্সে কী আছে, তা ওরা দু'জনেই জানে। চাবি নিয়ে বুলি দৌড়ে গেলো উপরে।

অরিন্দম বড়ো মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোঝা গেলো, মিনি, বিয়ে করা তোর এখন জরুরি দরকার।'

মিনি কিছু বললে না, মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। আড়চোখে একবার তাকালো বাবার দিকে; তাঁর মুখ গম্ভীর, তাতে হাসির রেখামাত্র নেই। বাড়িতে অরিন্দম কখনোই বড়ো একটা গম্ভীর হন না, কিন্তু যখন হন, সকলেই তাঁকে একটু ভয় পায়। মিনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো বাপের মুখে হাসির রেখা ফোটবার আশায়; সে জানে বেশিক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে থাকতে তিনি পারেন না।

অরিন্দম ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আমার তার তোরা পাসনি ?'

'পেয়েছিলাম।' একটু পরে বললে, 'মা মন্দিরে গেলেন, সেইজন্যে গাড়ি পাঠানো গেলো না। মা আমাকে ব'লে গেছেন সব দেখাশোনা করতে।'

'আজ না-হয় না-ই যেতো।'

'আজ একাদশী কিনা—'

'একাদশীতে সধবার কী ?' অরিন্দম কথাটা হঠাৎ এত জোরে ব'লে উঠলেন যে মিনি চমকে উঠলো। মৃদুস্বরে জবাব দিলে, 'একাদশীর দিনে ওখানে উৎসব হয় কিনা।'

'ও, উৎসব। বুঝেছি।' অরিন্দম আর-একটা সিগারেট ধরালেন। 'বেশ আছে এরা ধর্মের খেলা নিয়ে—সময় কাটে ভালো। কখন গেছে ?'

'তুমি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে। চারটেতে উৎসব আরম্ভ।' কথাটা বলতে মিনিকে একটু চেষ্টা করতে হ'লো, কারণ মিথ্যে কথা ব'লে তার অভ্যাস নেই, জিভে আটকে আসে। আসলে, বাবা এসে পৌঁছবার মাত্র মিনিট দশেক আগে মা বেরিয়ে গেছেন। উৎসব সন্ধের আগে আরম্ভ হবে না, কাজেই হৈমন্তী যতটা দেরি করা সম্ভব, করলেন ; আর দেরি করা গেলো না, কারণ স্বামী এসে পড়লে হয়তো যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। স্বামী এলে কী বলতে হবে তা মেয়েকে তিনিই শিখিয়ে দিয়ে গেলেন।

'কখন ফিরবে ?'

'সন্ধে হবে—আটটা সাড়ে-আটটাও হ'তে পারে।' ঐ সময়ের মধ্যে ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেও মিনি এ-কথা বললে।

'হুঁ।—তুই বোস্ না, মিনি, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

মিনি কিন্তু বসলো না।—'এখন তোমার চা এনে দেবো, বাবা?'

'না—স্নান ক'রে আসি। অরুণ কোথায়—বেরিয়েছে?'

মিনি একবার ঢোঁক গিলে বললে, 'হ্যাঁ।'

অরিন্দমের মুখে একটা ছায়া পড়লো। মিনির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে কী লুকোচ্ছিস্ বল্ তো?'

মিনি ক্ষীণস্বরে বললে, 'দাদা কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি। আজ দশটা নাগাদ বাড়ি এসে খেয়ে-দেয়েই আবার বেরিয়ে গেছে।'

'বুঝেছি। ওরও উৎসব—তবে ঠিক একাদশীর উৎসব নয়।' অরিন্দমের পুরু ঠোঁট থেকে শুরু ক'রে সমস্ত মুখে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো। মিনি স্তম্ভিত। নিজের ছেলের দুশ্চরিত্রতা নিয়ে যে-লোক এ রকম তামাশা করতে পারে, সে কি মানুষ? বাবাকে সে ভালোবাসে, খুবই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এক-একটা দিক হঠাৎ যখন প্রকাশ পায়, তখন তার সমস্ত শরীর কেমন যেন শিউরে ওঠে। মানুষ হিসেবে তার মা কত উঁচুদরের! শিক্ষায়, শালীনতায়, রুচিতে কত বেশি উন্নত তিনি! শরীর তার সুন্দর, কিন্তু আত্মাও তার কম সুন্দর নয়। তাঁর সঙ্গে কি কোনো তুলনা হয় এই খাকি শর্টস্-পরা (বুলি কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছিলো) স্থূল মানুষটার? কত বড়ো কৃতিত্ব তার মায়ের যে এমন স্বামীর সঙ্গেও তিনি স্বচ্ছন্দে ও নির্বিবাদে জীবন কাটিয়ে গেলেন। হাঁসের গায়ে জল লাগে না, তেমনি কোনো অপবিত্রতাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বতঃই বিশুদ্ধ তাঁর স্বভাব।

'তোর বৌদি কোথায়?'

'ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন বোধ হয়। আসবেন এক্ষুনি।'

'তোর দাদা রোজই এ রকম করে নাকি?'

'প্রায়ই।'

'আমার হন্টরটা এবার কাজে লেগে যাবে, দেখছি।'

মিনি পাংশুমুখে বললে, 'অত বড়ো ছেলেকে তুমি মারবে নাকি, বাবা?'

'একটা মেয়ে বিধবা হবে—না হ'লে ওকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতাম।'

বাবার রাগ মিনি ভালোরকমই জানে। তার চেহারাটা অতি ভয়ঙ্কর, দেখলে এক মাইলের মধ্যে এগোতে সাহস হয় না, কিন্তু ভিতরটা তার ফাঁপা, তাতে গর্জনের ঘনঘটা যত সত্যিকারের বিপদ ততটা নয়। হঠাৎ রাগটা অতি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যায় মিলিয়ে, বিশেষ-কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। চীৎকার ক'রে তিনি মুখে ফেনা তুলবেন, মনে হবে আজ আর রক্ষে নেই, কিন্তু কোনো রকমে একবার রাগ পড়লেই নিশ্চিন্ত। কাজেই এ-রকম একটা অস্তিক কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে মিনি নিশ্চিন্ত হলো; দাদার তাহ'লে কোনো ভয় নেই, যে-ক'দিন বাবা আছেন, সে যদি একটু ভালোমতো চলে তাহ'লে কোনো অশান্তিও হয়তো হবে না। আসলে বাবা বড্ড বেশি স্নেহশীল মানুষ, এত বেশি স্নেহশীল হওয়া বোধ হয় উচিত নয়। মা তো বলেন দাদার এই অধঃপাতের জন্য বাবাই দায়ী, এবং কথাটা বোধ হয় ঠিকই। একে প্রথম সন্তান, তায় একমাত্র ছেলে, কোনোদিন একটা কড়া কথাও শুনতে হয়নি, সব সময় পকেটভর্তি পয়সা, এ ছেলে যে বিগ্‌ড়োবে তা তো জানা কথাই। এখন কপাল চাপড়ালেই বা কী হবে, আর চাবুক মারলেই বা হবে কী—মা-মহামায়া যদি মতি ফেরাতে না পারেন, তাহ'লে কেউ পারবে না।

মিনির হঠাৎ মনে হ'লো যে বাবার হয়তো খিদে পেয়েছে ব'লেই মেজাজটা খারাপের দিকে ঝুঁকছে। ঠিক খেয়ে উঠেছেন, এমন

সময়ে বাবাকে নির্ভয়ে সমস্ত পারিবারিক দুঃসংবাদ জানানো যায়, তিনি একটুও বিচলিত না-হ'য়ে সব শুনে যাবেন। কিন্তু খাওয়ার সময় হয়েছে অথচ খাওয়া হয়নি-এ-রকম সময়ে বাবাকে যদি গিয়ে বলো যে ধোপা এবার একখানা কাপড় কম দিয়েছে কি ভাঁড়ার ঘরের বাল্ব্ গেছে নষ্ট হ'য়ে, তাহলে তিনি এমন হুলুস্থুল বাধাবেন যেন বাড়িটাই ছাদ সুদ্ধ ভেঙে পড়ছে। তাই মিনি আর-একবার বললে, 'চা-টা না-হয় খেয়েই নাও।'

'যাই, স্নান ক'রে আসি', ব'লে অরিন্দম উঠতে যাবেন, এমন সময় ভিতরের দিকের পরদা সরিয়ে একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। যেন আধো দ্বিধায় সে দরজার ধারে একটু দাঁড়ালো, মিনি তাকে ডাকলে, 'বৌদি এসো।'

আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে সে অরিন্দমকে প্রণাম করলে। মাথার আধখানা তার কাপড়ে ঢাকা, সামনের দিকের চুলগুলো উসকোখুসকো হয়ে চোখে-মুখে পড়েছে, সিন্দুর লেপটে গিয়ে কপালে একটা লাল তীর আঁকা হ'য়ে গেছে, চোখ বড়োই ক্লান্ত, চোখের কোলের কালিতে বিনিদ্র রাত্রির ইঙ্গিত। পরনে একটা কুৎসিত লতা-পাড় গোলাপি শাড়ি, বোধ হয় নেমে আসবার সময় তাড়াতাড়ি বদলে এসেছে, কিন্তু ব্লাউজ বদ্‌লানোর কথা ভাবেনি, যদিও সেটার বাঁদিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা বাদামি দাগ যে-কোনো লোকেরই চোখে পড়বে—ছেলেকে খাওয়াবার সময় কখন যে পৃ[illegible] উচ্ছলিত হ'য়ে পড়ছিলো তা খেয়ালই করেনি। পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের মুখে প্রায় কথা সরলো না; ফ্যাকাশে একটুখানি হাসির চেষ্টা ক'রে বললেন, 'কেমন আছো, উজ্জ্বলা?'

'ভালো আছি।'

'আর খোকা?'

'আছে একরকম।'

এর পরে অমিতভাষী অরিন্দমও যেন আর কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। উজ্জ্বলাকে দেখে দস্তুরমতো একটা ঘা লাগলো তাঁর মনে। মেয়েদের অপরিচ্ছন্ন কি যত্নহীন বেশভূষা কোনোকালেই তিনি সইতে পারেন না—নিজের স্ত্রীকে তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাড়িতে জামাতে আচ্ছন্ন করেছিলেন, এমনকি মেয়েদেরও বরং বিলাসিতার দিকেই ঝুঁকিয়েছেন, কিন্তু একখানা আধ-ময়লা কাপড় কখনো পরতে দেননি। আর উজ্জ্বলা [illegible] চেহারা করেছে, তার কাপড়চোপড়েরই বা কী হাল! অরিন্দমের মনের মধ্যে কেমন একটা ভোঁতা রাগ গুমরোতে লাগলো। তার স্বামী যে বদ, বিবাহে যে সে অসীম দুঃখী, এ-কথা এমন ক'রে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবার কী দরকার? এ-রকম চেহারা ক'রে থাকলে [illegible] কি সুবিধে হবে···এ-চেহারা দেখে কি স্বামীর মন ফিরবে, বরং আরো দূরেই কি স'রে যাবে না? আর তাছাড়া, এই দীনদুঃখিনী বেশে দয়াভিক্ষার ভাবটাই বিশ্রী, ওতে পুরুষের অবজ্ঞা ছাড়া আর-কিছু উদ্রেক করে না। আর দয়া যদি-বা হয়, দয়ার মূল্য কতটুকু, কতক্ষণ টেঁকে তা? উজ্জ্বলা পারে না ঐ মূঢ়কে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে দিতে, পাগল ক'রে দিতে পারে না হতভাগাকে? নিজের বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশের কথা মনে ক'রে ক্ষীণ একটি হাসি উঠে এলো অরিন্দমের ঠোঁটে। হৈমন্তী যেন রানি হয়েই জন্মেছিলেন। হ'তো সে-রকম মেয়ে, দু'দিনে টিট ক'রে দিতো অরুণবাবুকে। অরিন্দমের সন্দেহ হলো তাঁর পুত্রবধূর সে-রকম আকর্ষণীশক্তি নেই, কিংবা যেটুকু আছে তার ব্যবহারের কৌশল সে জানে না। অথচ মাপজোক হিসেবে সে নিখুঁত সুন্দরী। অরিন্দম দেখেছেন যে সুন্দরীরা প্রায়ই মনোহারিণী হয় না; বললে খারাপ শোনায়, কিন্তু সত্যি তারা একটু নীরস হয়। স্ত্রীলোক

হিসেবে বুলি যে মিনিকে অনেকদূর ছাড়িয়ে যাবে সে-বিষয়ে তাঁর নিজের মনে সন্দেহ নেই।

'আপনার অসুখ করেছিলো, এখন ভালো আছেন?' উজ্জ্বলার এই প্রশ্ন হয়তো নেহাৎই কর্তব্যসম্পাদন, কিন্তু উজ্জ্বলার কাছ থেকে এ ছাড়া আর কী আশা করা যায়? এখনো সে যে রূঢ় কি নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠেনি, এর জন্যই কি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়, জেনে-শুনে তাকে যারা বলি দিয়েছে? কত কথাই তো সে বলতে পারতো, যদি সে নেহাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের হিন্দু মেয়ে না হ'তো, যদি সে হাড়ে-হাড়ে না জানতো যে ধর্মই বলো, সমাজই বলো আর আইনই বলো সব তার বিরুদ্ধে, চারদিকে তার পাথরের দেয়াল তোলা, কোনোখানে একটু ফাঁক নেই। আধুনিক সমাজে তার জায়গা যথেষ্টরকম উঁচুতে নয় যাতে সে অনায়াসে স্বামীর মুখের উপর তুড়ি মেরে যাবে বেরিয়ে যেখানে এবং যার সঙ্গে খুশি, আবার এতটা নিচুতেও নয় যাতে গলার আর গায়ের জোরেই নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিতে পারবে। যে-শাঁখাজোড়া ভুলেও কখনো হাত থেকে খোলে না, তা সত্যই তার শৃঙ্খল; যে-সিঁদুরের ফোঁটাটি কপালে পরতে সে কখনো ভোলে না, তা তার ক্রীতদাসী-জীবনের চিহ্নমাত্র, তা ছাড়া কিছু না।

'আমি বেশ ভালোই আছি, কিন্তু তোমাকে তো বিশেষ ভালো দেখছিনে, উজ্জ্বলা। মিনি, তোদের বৌদিকে তোরা ভালো ক'রে খেতে-টেতে দিস্ তো?' শেষের কথাটা অরিন্দম বললেন নিজের মনেই ফূর্তি আনবার জন্যে, মন-খারাপের ভাবটা যদি বা মাঝে-মাঝে তাঁকে আক্রমণ করে, সেটাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেয়া তাঁর ধাতে নেই। কিন্তু কথাটা শুনে উজ্জ্বলা এমন ম্লানভাবে হাসলো যে অরিন্দম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার মনের মধ্যে যে কী অগাধ, অসহায় বিষাদ এই ক্ষীণ হাসিটুকুতে তা স্পষ্ট ফুটে উঠলো, সে-হাসি দেখে অরিন্দম যেন

তীক্ষ্ণ ও ক্ষণিক একটা শারীরিক কষ্ট পেলেন। সুন্দর ঠোঁট দুটি উজ্জ্বলার, প্রাচীন কবিদের সেই ধনুকের উপমা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আর তার দাঁত এত সুন্দর যে সে কখন হাসবে, কখন চকিতে দেখা যাবে তার দাঁতের আভা, সে-জন্যে কোনো যুবক যদি কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করে তাহ'লে তাকে তারিফই করতে হয়। কিন্তু, আপাতত যা দেখা যাচ্ছে, যুবকটির খুবই ধৈর্যশীল হওয়া দরকার, বড়োই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে তাকে। নিজের অমন সুন্দর নামটি ব্যর্থ ক'রে-যে-মেয়ে বিষাদপ্রতিমা সেজে ব'সে আছে, তার চোখের দিকে তাকাবার সাহস তখনকার মতো অরিন্দমও যেন নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। যে-অপরাধ সমস্ত সমাজের, তা যেন এ-মুহূর্তে তাঁর একার ঘাড়ে এসে পড়েছে, যদিও, আসলে, ছেলের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর নিজের বিশেষ-কোনো হাত ছিলো না। তিনি ছ'শো মাইল দূরে জঙ্গলে ব'সে যে-টাকা রোজগার করেন, সে-টাকা ছাড়া এ-সংসারের সঙ্গে ভেবে দেখতে গেলে গত চার-পাঁচ বছর ধ'রে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু তিনি তো সায় দিয়েছিলেন, তিনি বাধা তো দেননি। বনের জানোয়ারকে গুলি ক'রে মারতেও এক-এক সময় কেমন লাগে—আর এ তো মানুষ ; একজন মানুষের জীবন দিয়ে এমন নির্মম ছিনি-মিনি খেলবার অধিকার কোথায় পেয়েছিলেন তাঁরা? তাঁরা তো সবই জানতেন। বিয়ে দিলেই ছেলের মতিগতি ফিরবে, মা মহামায়া নিজে নাকি তাই বলেছিলেন, তাই হৈমন্তী খেপে গেলো ছেলের বিয়ে দিতে। খুঁজে-খুঁজে এমন একটি মেয়ে বা'র করা গেলো যাকে দেখে সবাই বলবে হ্যাঁ, সুন্দরী বটে। বাপের অবস্থাও ভালো, মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে উচ্চাশাই পোষণ করতেন মনে, কিন্তু অরুণকুমার যেন সেই উচ্চাশাও ছাড়িয়ে গেলো। আহা—রমাপতিবাবু অতি অমায়িক সৎব্যক্তি, কিন্তু নির্বোধ, নির্বোধ, নয়তো মেয়ের বিয়ে দিতে শুধু ছেলের বাপের দিকে

তাকাবেন কেন? বিয়ে তো আর শ্বশুরের সঙ্গে হচ্ছে না! অরিন্দম-বাবু মোটা মাইনের সরকারি চাকুরে, কলকাতায় নিজের বাড়ি, গাড়িও আছে...তাহ'লে আর ভাবনা কী, মেয়ে আমার সুখে থাকবে। বেশ হয়েছে, যে-সব মেয়ের বাপ শ্বশুরের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয়, তাদের এই রকমই শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু অরিন্দমের মনে এই আরামপ্রদ রাগের ভাবটা বেশি জোর করতে পারলো না। পুত্রটি তো তাঁরই, এবং সে যে এমন ঘোরতর শূকর তা বেচারা রমাপতিবাবু কেমন ক'রে জানবেন! দোষ তো তাঁদেরই, তাঁরাই ঐ ভালোমানুষ ভদ্রলোকটিকে ঠকিয়েছেন, তার উপর একটি সুন্দর তরুণ জীবনে আগুন লাগিয়েছেন। নিঃশব্দে পুড়ছে উজ্জ্বলা। অরিন্দম ভাবতে পারেন না এর শেষ কোথায়। তিনি যদ্দিন বেঁচে আছেন মেয়েটা খাওয়া-পরার কষ্ট অন্তত পাবে না, কিন্তু তারপর ওর শূকরতুল্য স্বামী সম্ভবত বেশ নিপুণভাবেই ওর জীবন হ্রস্ব ক'রে আনবে, একদিন বালাই যাবে। হিন্দু মেয়ের আবার জীবন, আর সে-জীবনের আবার মূল্য!

অরিন্দম চেয়ারটিতে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। সত্যি, ছেলেটা যে এতদূর অধঃপাতে গেছে তা কিন্তু তিনিও ভাবতে পারেননি, আজ আটমাস পরে বাড়ি ফিরে পুত্রবধূর মুখ দেখে প্রথম বুঝতে পারলেন। প্রথম যখন ওর সম্বন্ধে নানা কথা কানে আসে তিনি বিশেষ আমলে আনেননি, প্রথম বয়সে ও-রকম একটু হ'য়েই থাকে, অতি সুবোধ বালক হওয়াটাও কিছু কাজের কথা নয়। তিনিও ভেবেছিলেন—আন্তরিক-ভাবেই ভেবেছিলেন—যে বিয়ে করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তাঁর নিজের বেলায় তো তা-ই হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা ছিলো তাঁর প্রচুর প্রাণশক্তিরই উপচে-পড়া, এত বেশি উচ্ছলতা একটিমাত্র স্রোতে আবদ্ধ থাকতে চাইতো না; কিন্তু একটা সময় এলো যখন

তাঁর শরীর-মনের সমস্ত বাসনা কামনা ভালোবাসা, যা-কিছু আছে মানুষের, সব তীব্রবেগে ছুটলো এক হৈমন্তীকে লক্ষ্য ক'রে, আজও সে-জোয়ারে একেবারে ভাটা পড়েনি। কিন্তু সে-প্রাণশক্তি অরুণের কোথায়, তা থাকলে কি আর ল্যাজ-গুটোনো কুকুরের মতো চুপিচুপি বাড়ি আসে, আবার বেরিয়ে যায়! কাদায় না-গড়ালে ও বাঁচতে পারে না, এমন অবস্থায় ও নিজেকে এনেছে। এমন নিদারুণ একটা ভুল হ'য়ে গেলো, আর তো কারো কিছু হ'লো না, মাঝখান থেকে একটা জীবন অকারণে ছারে-খারে গেলো। তবু ভাগ্যিস ছেলেটা হয়েছে!

এতক্ষণে অরিন্দম বলবার আর-একটা কথা খুঁজে পেলেন।

'নাতি দেখবার জন্যেই তো ছুটে এলুম এতদূর থেকে! দর্শনী কী এনেছি জানো, উজ্জ্বলা? মোহর, খাঁটি সোনার মোহর। তাও একটা নয়, দুটো নয়, তিনটেও নয়, চারটে! চুপি-চুপি বলি তোমাকে, যদি দর কষাকষি করো, আরো কিছু আদায় করতে পারবে,' ব'লে অরিন্দম উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

কিন্তু উজ্জ্বলার জবাব শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন তিনি।—'মিছি-মিছি এতগুলো টাকা খরচ করলেন। কী হবে ও-সব দিয়ে?'

পরের মুহূর্তেই অরিন্দমের সন্দেহ হ'লো উজ্জ্বলার এ-কথা বলার কারণ আছে, অরুণ এসে হয়তো নির্বিঘ্নে মোহরগুলো হাতিয়ে নেবে। তাঁর মনে পড়লো বিয়ের সময় রমাপতিবাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন মেয়েকে—জামাইকেই দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই টাকার ব্যাপারে অরিন্দমবাবুর ঘোরতর আপত্তি ছিলো ব'লে অগত্যা রফা হয়েছিলো যে উনি উজ্জ্বলার নামে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট্ ক'রে দেবেন—বাপ মেয়েকে টাকা দেবে, এর উপর কারু তো কিছু বলবার নেই। সেই পাঁচ হাজার টাকা তাঁর ছেলের লাম্পট্যের মাশুল জোগাতে-

জোগাতে হয়তো এই দেড় বছরেই প্রায় তলায় এসে ঠেকেছে এ-কথা ভেবে অরিন্দমের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো।

'শোনো, উজ্জ্বলা, একটা কথা জিগেস করি। তোমার বাবা যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন সেটা—' এ-পর্যন্ত ব'লেই অরিন্দম থামলেম, কথাটা কী ক'রে শেষ করবেন ভেবে পেলেম না।

কিন্তু উজ্জ্বলা সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দিলো, 'সে-টাকার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। সেটা মা নিয়েছেন।'

'তোমার মা?' অরিন্দম একটু অবাক হ'য়েই জিগেস করলেন।

'না; মা মহামায়া!'

এ-কথা শোনবার জন্যে অরিন্দম মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না, কথা বলতে গিয়ে মনে হ'লো গলা শুকিয়ে গেছে, জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন।

'সব টাকা?'

'হ্যাঁ, সব টাকা। আমার নামেই তো ছিলো। আমি লিখে দিয়েছি।'

'কেন, হঠাৎ এটা করতে গেল কেন?'

'মা বললেন, তাই করলাম।'

শেষোক্ত মা যে হৈমন্তী তা অরিন্দম আন্দাজে বুঝে নিলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো—এটা হৈমন্তী ভালো কাজ করেনি।

উজ্জ্বলা যেন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, 'আশ্রমের আরো ঘর বাড়ানো দরকার; সেইজন্যে ওঁরা চাঁদা তুলছেন। মা আমার টাকা নিতে চাননি কিছুতেই—'(ইনি হলেন মহামায়া, অরিন্দম মনে-মনে বললেন)—'আমি নিজে গিয়ে তাঁর পায়ে রেখে এসেছি। আমার তো টাকার কোনো দরকার নেই—তাছাড়া আমার হাতে থাকলে টাকাটা হয়তো নষ্টও হয়ে যেতো।'

শেষের কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে অরিন্দমের দেরি হ'লো না। তিনি যা আশঙ্কা করছিলেন তা হয়নি বটে, কিন্তু যা হয়েছে তাতেও তিনি খুশি হ'তে পারলেন না। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এই এক মা পেয়ে বসেছে হৈমন্তী। আচ্ছা—বাড়িতে কাজকর্ম কিছু নেই, স্বামীও থাকে বিদেশে, কিছু-একটা নিয়ে সময় তো কাটাতে হবে—মুখ-বদ্‌লানো হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকেই না-হয় ভজলো কিছুদিন, কারো তো আর ক্ষতি হচ্ছে না কিছু—এইভাবেই অরিন্দম প্রথম থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলেন। এতে তাঁর সায় ছিল না, কিন্তু অমতও ছিলো না; বাপ যেমন মৃদু হেসে ছেলের একটা বাজে খেয়ালকেও প্রশ্রয় দেয়, তেমনি তিনি স্ত্রীর এই নতুন শখকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া স্ত্রীর কি ছেলেমেয়ের কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অভ্যেসই তাঁর নেই, তার কারণ তাঁর দুর্বলতা নয়, তাঁর অপার স্নেহশীলতা। মানুষটা সত্যি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল···হয়তো হৈমন্তীর কথাই ঠিক, ছেলের ব'খে যাবার জন্য তিনিই দায়ী। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে যাদবপুরে এক গরিব বামুনের নিঃসন্তান বৌ, পাড়ার গিন্নিদের ফাই-ফরমাস খেটে চালটা কলাটা ঘরে আনতে যার আপত্তি ছিলো না, সে নাকি আসলে স্ত্রীলোকই নয়, সাক্ষাৎ রাধা ও পার্বতীর মিলিত অবতার। কথাটা শুনে অরিন্দম অবশ্য হো-হো ক'রে হেসেছিলেন, প্রথমটায় হৈমন্তীও মন্দ হাসেননি। কিন্তু সুদূর যাদবপুরেও এই রাধা-পার্বতীর একটি দুটি ক'রে ভক্ত জুটতে লাগলো—সব অবতারেরই জুটে থাকে—তাঁর নতুন নাম হ'লো মা-মহামায়া, এবং কলকাতার শহরে, এমনকি কলকাতার বাইরেও, বেশ ছোটোখাটো একটি চাঞ্চল্যের তিনি কেন্দ্র হ'য়ে উঠলেন। উত্তর কলকাতা বনেদি—অর্থাৎ একশো বছর আগেকার গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া ব্রাহ্ম এবং আধা-হিন্দু-আধা-ব্রাহ্ম সমাজের পীঠস্থান, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার

মতো আর্থিক সচ্ছলতা যাঁদের ছিলো, ঈশ্বরে বিশ্বাস টলবার কোনো কারণ যাঁদের জীবনে ঘটেনি, তা তিনি যীশুই হোন কি কেষ্টঠাকুরই হোন কি একমেবাদ্বিতীয়মই হোন, হুতোম প্যাঁচা আসমানে ব'সে যাদের নক্সা উড়োতেন, সে-সমাজের প'চে-গ'লে যেটুকু বাকি আছে তা সতী-শবের বিভিন্ন অঙ্গের মতো বাগবাজার-শ্যামবাজারেরই নানা তীর্থে ছিটোনো। পুরুতের টিকির প্রতিপত্তি এখনো যেটুকু আছে ও-অঞ্চলেই। দক্ষিণ কলকাতা নতুন ও আধুনিক, বাইরের চাল-চলনটা ধোপদুরস্ত, ভিতরে কিছু থাক আর না-ই থাক ; ন'টা বাজতেই স্যুট-পরা কেরানিরা উর্ধ্বশ্বাসে ট্র্যাম ধরতে ছোটে, বিকেলবেলা নানা রং-এর নানা ঢং-এর মেয়েতে রাস্তা গিশগিশ করে—হঠাৎ মনে হয়, পূর্ববঙ্গীয় বর্বরদের আক্রমণে খাশ কলকাতা বুঝি একেবারে লোপাট হ'য়ে গেলো। কিন্তু, বাইরের এ-সব চটক সত্ত্বেও, ভক্তির ব্যাপারে দক্ষিণ কলকাতা যে কারো চেয়ে খাটো নয়, তা প্রমাণ হ'লো মা-মহামায়ার ব্যাপারে। আসলে দক্ষিণীরা ধর্মকে বেশ একটু মডন রংদার ক'রে নিয়েছে—গানটি বাজনাটি থাকবে, মোটরবিহারও বাদ যাবে না, ফুলের বাগানওলা আশ্রমে ঝকঝকে চকচকে পেটেন্ট স্টোনের মেঝেতেই না-হয় ব'সে পড়া গেলো, কাপড় নোংরা হবার ভয় নেই—আর যা-ই বলো না, গেরুয়াতে ফর্সা লোককে ভারি মানায়। আমরা কি সে-রকম ব্যাকওঅর্ড নাকি যে পুজুরি বামুন দেখলেই ঢিপঢিপ পেন্নাম করবো—ছি! সাক্ষাৎ সিদ্ধপুরুষ না হ'লে (তিনি অবশ্য নারীও হতে পারেন) আমরা কাছে ঘেঁষিনে। এই তো ছাখো, মা-মহামায়াকে প্রথম চিনলো কে, জগতের লোককে চিনিয়েই বা দিলে কে—এই বালিগঞ্জই। বালিগঞ্জে যখন মা-মহামায়ার খ্যাতির পারা দিন দিন চড়ছে, তখন পাশের বাড়ির সবজজের গিন্নির সঙ্গে হৈমন্তী একদিন গেলেন—নেহাৎই কৌতূহল মেটাতে, এবং সেজন্য

তাকে বেশি দোষ দেয়া যায় না। ফিরে যখন এলেন, অরিন্দম দু'একটা হাসি-ঠাট্টা করবার চেষ্টা করলেন, ও-পক্ষ থেকে বিশেষ সায় পেলেন না। কয়েকদিন বাদে হৈমন্তী আবার গেলেন। তারপর রীতিমতো ঘন-ঘন যাওয়া ধরলেন। অরিন্দম বুঝলেন, নেশা লেগেছে। ছেলে-বয়েসের নেশা কেটে যায়, কিন্তু বুড়োবয়েসের নতুন নেশা সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে, এ-কথা জেনেও অরিন্দম স্ত্রীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না। যদি ওর ভালো লাগে, করুক না একটু পাগলামি। বরং স্ত্রীর অনুরোধে 'মা'-র জন্য দু'একটা উপহারও কিনলেন—ভক্তদের ইচ্ছা তিনি দুর্গাপ্রতিমার মতোই সালঙ্কারা হন, এবং তাঁর অঙ্গস্পর্শে ধন্য হবে যে-অলঙ্কার, তার কি আর যেমন-তেমন হ'লে চলে! মা অবশ্য ওদের এ-সব ছেলেমানষি দেখে হাসেন, ও-গুলোর দিকে চেয়েও গ্যাখেন না; শুধু মাসে একবার, পূর্ণিমার দিন তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীবেশে দেখা দেন—ভক্তদের চোখ সেদিন সার্থক হয়, কোনো-কোনো মেয়ের চোখ অমন অপূর্ব বেশভূষা দেখে হয়তো ঝলসেও যায়।

হৈমন্তী আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে মা-র প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠলেন—সব-জজগিন্নি তাতে এতদূর ঈর্ষান্বিত হলেন যে মনের ভাব লুকোবার শক্তি পর্যন্ত তাঁর রইলো না। কর্তাটি মনে-প্রাণে সবজজ; যেখানে দেড় পয়সা খরচ করলে চলে সেখানে দু'পয়সা খরচ করা তাঁর পেনাল কোডে লেখে না; পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে তিনি যে-বাড়িটি করেছেন তার প্রতিটি ইঁটের দাম টেন্ পর্সেণ্ট ইণ্টরেস্ট সমেত ভাড়াটের কাছ থেকে আদায় ক'রে নেন—মাসের পয়লা তারিখে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটের দরজায় তাঁর টোকা পড়ে, জলের পাম্প তিনবারের জায়গায় চার বার ছাড়তে হ'লে হুলুস্থুল বেধে যায়; ছ'মাসের কনট্র্যাক্ট ছাড়া তিনি ভাড়াটে নেন না (তার মধ্যে গবর্নমেণ্ট সর্ভেণ্টস্, অর্থাৎ সরকারি গোলামরা প্রেফারেন্স পায়), কারণ ভাড়াটেরা ছ'মাস শেষ হ'লেই প্রাণ

নিয়ে চম্পট দেয়, একজন শুধু নর্ভস ব্রেকডাউনে মারা গিয়েছিলো। সুতরাং গিন্নিঠাকরুন মাত্র সাঁইত্রিশ বর্ষীয়া তৃতীয়পক্ষীয়া হ'য়েও হৈমন্তীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কেন? হৈমন্তীর প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে চললো, তারপর মা একদিন সশরীরে তাদের এই দশ নম্বর অশোক রোড়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত। সেদিন জজগিন্নির দূর থেকে বুক ফেটেছিলো, আর অরিন্দমের সাধারণ একটা যুবতী মেয়ের পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু প্রণাম তিনি করেছিলেন—স্ত্রীকে খুশি করবার জন্য।

তার কয়েকদিন পরেই তিনি নাগপুরে বদলি হয়ে গেলেন; আর হৈমন্তী নিষ্কণ্টক হয়ে দ্রুতবেগে ভক্তির চরম চূড়োয় এসে পৌঁছলেন। কয়েকমাস পর-পর অরিন্দম কলকাতায় আসেন, আর স্ত্রীর আশ্চর্য উন্নতি দেখে অবাক হয়ে যান। সঙ্গে-সঙ্গে মা মহামায়ার উন্নতিটাও উপেক্ষা করবার নয়। মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে অসংখ্য ভক্ত তাঁর, প্রিয় ভক্তরা সকলেই মোটরারোহী। দেখতে-দেখতে দশ বিঘে জমি নিয়ে তাঁর আশ্রম তৈরি হলো—পুরোনো টিনের ঘরটির এক মাইলেরই মধ্যে—অরিন্দম বাড়িটি দেখে যথেষ্ট তারিফ করেছেন মনে-মনে, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের একটা স্পেশল ওঅর্ড হলে এত সুন্দর বাড়িটি মানাতো—ওখানে নাকি সর্বদাই বেড্-এর টানাটানি। শনিবার বিকেলে গড়েহাট রোড দিয়ে যত গাড়ি যোধপুর ক্লা[illegible] দিকে যায়, তার দ্বিগুণ গাড়ি যায় মায়া-মন্দিরের দিকে। চাকু[illegible] সুবিধের জন্য প্রতি শনিবারেই বিশেষ-একটা ব্যাপার থাকে, আর এই সমস্ত ব্যাপারটির কর্মকর্তা হচ্ছেন তিনি, যিনি মায়ের ছেলেপুলে থাকলে তাদের বাবা হতেন—অনেক ভক্ত তাঁকে বাবা-মহাদেব ব'লেও ডাকেন: কিন্তু মা-মহামায়ার পাশেই বাবা-মহাদেব জাঁকিয়ে ওঠা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়, সেই জন্যে তাঁর পুরোনো নাম ভট্চায ঠাকুরই চলতি।

স্ত্রীলোকটিকে অরিন্দম অবশ্য দু'একবার দেখেই বুঝে নিয়েছেন। তার মধ্যে অলৌকিক শুধু তার মোহিনীশক্তি। মানুষটার স্বাভাবিক আকর্ষণ যে কী তীব্র তা তার সাপের মতো চোখের দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়। ইস্পাতের মতো অমন ঠাণ্ডা আর ধারালো চাউনি অরিন্দম কখনো দেখেননি। রূপ আছে, কিন্তু সে-রূপ চেঁচিয়ে নিজেকে জাহির করে না, নিঃশব্দে টেনে নেয়। কথাবার্তা উজ্জ্বল কিন্তু শান্ত; প্রতিটি আচরণে, ব্যবহারে একটি নিটোল ব্যক্তিত্বের নিখুঁত ভারসাম্য। যাদবপুরের জঙ্গলে এক মূর্খ গরিব বামুনের সঙ্গে জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে এমন একটি দুর্লভ ব্যক্তিত্ব মানুষটা কোথায় পেলো? তা মানুষের ভিতরে তো কত গুণই থাকে, অনুকূল অবস্থা না-পেলে ফোটে না। এ-ধরনের মানুষের খোঁজ পেলে লোকে তার কাছে ভিড় করবেই। মনে হয়, এর কথা শুনলে, এর কাছে থাকলে বুঝি শান্তি পাওয়া যাবে। সংসারের সব মানুষের মনেই একটা-না-একটা দুঃখ কি ক্ষোভ কি অতৃপ্তি আছে (যদিও হৈমন্তীর যে কী দুঃখ, অরিন্দম তা ভেবে পান না—এক, ছেলেটা মানুষ হ'লো না, এই যা); সংসারে বারে-বারেই আশা ভাঙে, কাজেই একেবারেই অভঙ্গুর কোনো আশার ছলনাও যদি কেউ সামনে ধরে, তার জন্যে চড়া দাম দিতে অনেকেই রাজি। স্ত্রীলোকটি উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নেই; এবং মানুষ আকর্ষণ করবার এই ক্ষমতা নিয়ে ভিন্ন পটভূমিতে জন্মালে ইনি এমনই উঁচুদরের একজন গণিকা কি গোয়েন্দা হ'তে পারতেন যে এঁর নাম হয়তো ইতিহাসের পাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতো। (অবশ্য এ-কথা অরিন্দম নিজের মনেই ভাবেন, ভুলেও কখনো মুখে উচ্চারণ করেন না।) নেহাৎই নিরক্ষর ব'লে, তাছাড়া এর চেয়ে বড়ো কোনো পেশার ভারতবর্ষে বিশেষ সুযোগও নেই ব'লে, ইনি কটাক্ষে যুদ্ধ জয় না ক'রে, কি বাঁকা হেসে রাজা-রাজড়ার চোখের ঘুম কেড়ে

না নিয়ে মা-মহামায়া রূপে দেখা দিয়েছেন। তা লাভের দিক থেকে এ-পেশাও মন্দ নয়। মায়া-মন্দির বাড়িটিতে নাকি চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে—কে বলে হিন্দুধর্মের আর জোর নেই! এই মোটা অঙ্কের কতটুকু অংশ তাঁর নিজের পকেট থেকে এসেছে, সেটা হিসেব করবার চেষ্টা ক'রে অরিন্দমের অনেক নীরস মুহূর্তে আমোদের আমেজ লেগেছে। মাসে সাতশো ক'রে টাকা পাঠান, তাতেও নাকি হৈমন্তীর কুলোয় না। গেলো তিন মাস ধ'রে বেশিই পাঠাচ্ছেন—কোনো মাসে হাজার, কোনো মাসে বারো শো। যা বাকি থাকে, তাতে তাঁর নিজের খরচ চলে না, ধার-টার করতে হয়। সে যা-ই হোক, বেঁচে যদ্দিন আছেন, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না—লোকে তো কত রকম বাজে খরচই করে, হৈমন্তীও না-হয় কিছু করলো। কিন্তু উজ্জ্বলার এই টাকাটা এমন ক'রে বিলিয়ে দেয়া ভালো হয়নি—ন্যায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে সমস্ত টাকা অরিন্দমের এক্ষুনি ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

উজ্জ্বলার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে অরিন্দম বললেন, 'তুমিও আশ্রমে যাও-টাও নাকি মাঝে-মাঝে।'

মিনি এতক্ষণ চুপ ক'রে এক কোণে ব'সে ছিলো, হঠাৎ উজ্জ্বলার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। বৌদি বড়ো সরল মানুষ, সব কথা এখন ব'লে না দেয়। সে আর বৌদি যে 'মা'-র ছবির সামনে ব'সে রোজ দু'বেলা জপতপ করে এ-কথা শুনলে বাবা যে-মন্তব্য করবেন তা কল্পনা করতেও মিনির গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাবা বুড়ো হ'তে চললেন, কিন্তু জীবনের একটা দিক তাঁর কাছে অন্ধ গলি হ'য়েই রইলো। তাঁর মতে এ-সমস্তই বুজরুকি। এক-এক সময় বাবার কথা ভেবে মিনির দস্তুরমতো করুণা হয়। আধ্যাত্মিকতার ছিটেফোঁটা নেই তাঁর মধ্যে, কিছুই তিনি আমলে আনেন না, কিছুই

বিশ্বাস করেন না, কেবল হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন। সারাটা জীবন স্থখের গোলামি ক'রেই তাঁর কাটলো (কথাটা তার মা প্রায়ই বলেন)। কিন্তু তাঁর দিকে একবার মন ফেরাতে পারলে সে গভীর শান্তিতে জীবন ভ'রে যায়, তিনি তার কী জানেন ? সেই শান্তির পরিমণ্ডলে বাবাকে একবার টেনে আনতে পারলে মিনির অন্তরের গভীরতম ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়। কিন্তু সে-চেষ্টা করতেও তার সাহস হয় না। তর্কে ও বিদ্রূপে দু' মিনিটে তিনি তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন— কিন্তু তর্ক ক'রে তো কিছু হয় না, যুক্তি হ'লো শয়তানের কারখানার কলকব্জা (এটা মা-মহামায়ার কথা), বিশ্বাস করতে হয়, নিজেকে নিঃশেষে, নিঃসঙ্কোচে দিতে হয়, তবেই পাওয়া যায়। মিনি নিঃশেষে, নিঃসঙ্কোচে নিজেকে দিয়েছে। জীবনের পথ বেছে নিয়েছে সে ; এই অল্প বয়েসেই যে সে চরম পথের সন্ধান পেয়েছে এ তার মহা সৌভাগ্য। মা বলেন, ঠিকই বলেন, সংসার তো নরক। দাদাকে দেখে-দেখে এ-ধারণা তার আরো দৃঢ়ই হয়েছে। বৌদির জীবনটা একবার ভাবো তো—মা-মহামায়ার দয়া না হ'লে কী নিয়ে বাঁচতো ও ? তার, মিনির আর বিবাহে প্রবৃত্তি নেই। স্বামী, সংসার, ছেলেপুলে, এ-সব ভাবতে তার গা বমি-বমি করে। মনে-মনে তার ধারণা, পুরুষ জাতটা এখনো ঠিক মানুষ হ'য়ে ওঠেনি, প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের সঙ্গেই তার বেশী বেশি মিল। এটা মিনির মন-গড়া কথা নয়, এর পিছনে তার অভিজ্ঞতা আছে। বছর দুই আগে নিরঞ্জন বোস তাদের বাড়িতে ঘন-ঘন যাতায়াত করতো। লম্বা দেখতে, কোঁকড়া চুল, চাপা পাৎলা ঠোঁট। ভালো টেনিস খেলতো। একদিন নিজের ঘরে একলা ব'সে মিনি একটা কাগজের উপর লিখেছিলো, মিসেস নিরঞ্জন বোস, তারপর অনেকক্ষণ সেই লেখাটার দিকে তাকিয়ে ছিলো, সে-কথা মনে পড়লে মিনি এখন শীতের রাত্তিরেও ঘেমে ওঠে।

উঃ, সে খুব বেঁচে গেছে, নেহাৎই ঈশ্বরের দয়া না হ'লে সে এতদিনে··· বাকিটা মিনি মনে-মনেও ভাবতে পারে না। একদিন নিরঞ্জন লাহোর চ'লে গেলো চাকরি নিয়ে। প্রথম চিঠি মিনিই লিখেছিলো। রাত্তিরে শোবার আগে নীল রং-এর কাগজের চার পাতা ভ'রে ফেলেছিলো তার সুন্দর হাতের লেখায়। দ্রুত জবাব এলো সে-চিঠির। কিছুদিন চললো এ-রকম, তারপর নিরঞ্জনের (নামটাও মিনির এখন মুখে আনতে ইচ্ছে করে না) চিঠি আকারে হ্রস্ব ও সংখ্যায় স্বল্প হ'য়ে এলো, তারপর চিঠির স্রোত বন্ধ। একদিন খবর পাওয়া গেলো লাহোরের এক রেস্তোরাঁয় প্রকাশ্যে ব'সে নিরঞ্জন বোস এক পঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে মদ খাচ্ছে। মেয়েটার খাটো চুল, গোলাপের মতো রং, —আর রং-মাখা ঠোঁটে সিগারেট। (যিনি খবরটা দিয়েছিলেন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, সুতরাং ভুল হবার কিছু নেই।) তারপর অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, নিরঞ্জন সম্প্রতি নাকি কলকাতায় এসেছে কিন্তু অবশ্য ও দেখা করতে না-আসাতেই মিনি সুখী, অমন ইতরপ্রকৃতির জানোয়ারের মুখও সে আর দেখতে চায় না। একদিন চিঠিগুলো সব পোড়াতে গিয়েছিলো—কী মনে ক'রে আবার রেখে দিলে, বোধ হয় পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হ'লো না।

এতেও যার সমস্ত পুরুষ জাতটার উপরেই ঘেন্না ধ'রে না যায়, তাকে তুমি কী বলবে? না, মিনি আর বিয়ে করবে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, এই যৌবন, সে ঈশ্বরকে দেবে। এমন ভাগ্য ক'টা লোকের হয়! সংসারের জাঁতা বেশির ভাগ লোকের সমস্ত রস যখন বের ক'রে নিয়েছে, তখন বুড়ো বয়েসের ছিবড়ে তারা দিতে যায় ঈশ্বরকে! সাংসারিক পাঁকের মধ্যে মিনি ফুটবে ভক্তির চিরকমল—ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। তার মা তো বলেন—'ছেলেবয়েসে বাপ-মা বিয়ে

দিয়েছিলেন, তখন কি আর কিছু বুঝতুম—যদি বুঝতুম, তাহ'লে কি আর বিয়ে করি! আমার মা তো আর তোর মা-র মতো ছিলেন না—মেয়ের বিয়ে-বিয়ে ক'রে খেপে গিয়েছিলেন!' বাস্তবিক, মিনির মতো মা ক'জনের হয়! মেয়েদের বিয়ের কথা মাসান্তেও একবার মনে হয় না, ভক্তির ভরা নদী এ-সব তুচ্ছ সাংসারিক চিন্তা বিষ্ঠার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মিনিও বুঝতে শিখেছে যে সংসারটাই নরক, কুড়ি বছরেই তাই সে সত্যের পথে ব্রতচারিণী।

মিনির ঐ চকিত দৃষ্টি অরিন্দমের চোখে ধরা প'ড়ে গেলো। ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন। তাঁর কপালের উপর তিনটে মোটা-মোটা রেখা ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেলো। হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো নিজের বাড়িতে তিনি একজন বাইরের লোক। তাঁকে বলবার কথা এদের যা আছে, লুকোবার জিনিস আছে তার বেশি। উজ্জ্বলা যে জবাব দিলে, 'যাই মাঝে-মাঝে মা-র সঙ্গে', কথাটা ভালো ক'রে তাঁর কানেও গেলো না। এরা যেন সুরঙ্গের জীব, গুপ্ত স্রোতে চলেছে এদের জীবন, তাঁর সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সুন্দর সাজানো অ্যাশ-ট্রে উপেক্ষা ক'রে সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে তিনি উঠলেন।—'যাই, স্নান ক'রে আসি।'

এমন সময় বুলি ঢুকলো ঘরে। যেমন কিনা চৈত্রের বিকেলে দক্ষিণের বন্ধ জানলা হঠাৎ খুললে দমকা হাওয়া ঢুকে চমক লাগায়। তার কাঁধে, তার দু' হাতে, তার মাথায় রং-বেরং-এর শাড়ি; খুশি উপচে পড়ছে তার কণ্ঠে ছোটো-ছোটো অদ্ভুত চীৎকারে। দৌড়ে সে এলো বাবার কাছে, শাড়িগুলো ঝুপ্ ক'রে একটা চেয়ারের উপর ফেলে ব'লে উঠলো, 'বলো, কোনটা কার?'

অরিন্দম বললেন, 'যার যেটা পছন্দ।'

বুলি বললে, 'আমার সব ক'টাই পছন্দ।'

'উহুঁ, সে হবে না—একটা বেছে নিতে হবে।'

বুলি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'যাঃ—আমি একটাও চাই না।'

অরিন্দম হেসে বললেন, 'বুলি, তুই এতক্ষণ কী করলি রে? আমার সব জিনিস ঘাঁটলি বুঝি ব'সে-ব'সে?'

'ঘাঁটলে কী হয়?'

'কী আবার হয়—আবার গুছোতে হয়।'

বুলি মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'ব'য়ে গেছে আমার গুছোতে, বাহাদুর রাখবে সব ঠিক ক'রে।'

'ওঃ, আপনি বুঝি একেবারে লণ্ডভণ্ড অবাক কাণ্ড ক'রে এসেছেন?' হাসিতে উজ্জ্বল চোখে অরিন্দম তাকালেন বুলির দিকে।

বুলি কিন্তু হাসলো না, গম্ভীর মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তাহ'লে ভুলে গেছো?'

অরিন্দম অবাক হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'কী আবার ভুললাম? কখন ভুললাম?'

'সেবারে যাবার সময় কী ব'লে গিয়েছিলে মনে নেই?'

কথাটা বুলি এমন একটা ছেলেমানষি স্বরে বললে যে হঠাৎ তিন-বছরের বুলিকে মনে প'ড়ে গিয়ে অরিন্দমের বুকের ভিতরটা মুহূর্তের জন্য মুচড়িয়ে উঠলো। বুলিই তাঁর জীবনের শেষ শিশু। ও বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বাড়ি একদম চুপচাপ একদম ভদ্র হ'য়ে গেছে। এবার অরুণের ছেলেটা আবার যদি হৈ-হুল্লোড় ফিরিয়ে আনে। বারো বছর পরে এ-বাড়ি আবার জমজমাট হ'য়ে উঠবে। ছেলেপুলে অরিন্দম যে-রকম ভালোবাসেন সেটা একটু অদ্ভুতই, তাও আজ ব'লে নয়, তাঁর যৌবন থেকেই। ছাব্বিশ বছর আগে অরুণের যেদিন জন্ম হ'লো, সেদিন থেকেই। কিংবা তারো ন'মাস আগে থেকে, যেদিন তিনি খবরটা শুনলেন। এ-বিষয়ে তিনি হয়তো একটু

অসাধারণই। নয়তো যুবক পিতা আবার শিশুকে ভালোবাসে কবে! স্নেহের চেয়ে ঈর্ষা হয় প্রবল, বাৎসল্য ছাপিয়ে ওঠে আক্রোশ। নোংরা, নির্বোধ, বিচ্ছিরি একটা মাংসপিণ্ড, সে এলো আমাদের সুখের কালাপাহাড় হ'য়ে, নীরন্ধ্র দাম্পত্যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ! আর এই বিচ্ছেদরচনার যন্ত্রী আমি নিজেই, ভালোবাসাই ভালোবাসার শত্রুকে ডেকে আনলো। হায়রে, এই তো আমাদের প্রেম, প্রতারক প্রকৃতির একটা কৌশল মাত্র, ফাঁকি দিয়ে সে সৃষ্টিরক্ষার কাজটুকু আদায় ক'রে নেয়, নেয় নিষ্ঠুর সাম্যতায় রাজার, মজুরের, কুকুরের, মাকড়শার, মশার, গাছের, ঘাসের কাছ থেকে, এদিকে আমরা শিহরিত বিকম্পিত রোমাঞ্চিত উচ্ছ্বসিত উল্লসিত। ব্যাপার কী? প্রেম। আসলে আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস, অন্ধ, নিষ্ক্রিয় আজ্ঞাবহ, এ-কথা শুনতে কেমন লাগে? তফাৎ শুধু এই যে পার্থিব মনিবের আজ্ঞাপালন দুঃখের, প্রকৃতির ফরমাস খাটতে আনন্দের উন্মাদনা। অতল প্রতারণা সেইজন্যেই! এ-সব চিন্তা যুবকের হৃদয়কে মথিত করবে, যদি সুতিয়া স্ত্রী তার প্রণয়িনীই হয়। শিশু যে বিচ্ছেদ আনে না, বরং একটি উজ্জ্বল সেতুই রচনা করে, দম্পতীকে পরস্পরের আরো বেশি কাছে নিয়ে আসে, শরীর ছাড়িয়েও অন্য একটি সম্পর্ক স্থাপন করবার সাহায্য করে, এ-কথা উপলব্ধি করতে-করতে অনেক বছর তার কেটে যায়। প্রৌঢ়ের সন্তান তাই বাপের আদর বেশি পায়, এবং সন্তানের সন্তান যে অন্ধ, উদ্দাম স্নেহ ভোগ করে, নিজের পুত্রকন্যার ভাগ্যে তা কখনো জুটতেই পারে না। বুড়ো বয়সে সকলেই শিশু ভালোবাসে, স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদটাও আর থাকে না, উদাসীন পুরুষ স্ত্রীলোকের মতোই স্নেহে বোকা বনে। এ-ও প্রকৃতির একটা কৌশল; জীবনের প্রতি আমাদের অমর প্রেমেরই একটা চিহ্ন। জীবনের গাছ থেকে খ'সে পড়বার সময় যাদের এসেছে, নতুন পাতাগুলিকে

তারাই অভিনন্দন জানায়; যেহেতু মৃত্যু হাঁ ক'রে আছে, সেইজন্যেই এই সপ্রাণ পুতুলগুলিকে জীবনের খেলাঘরে ভিড় করতে দেখে তাদের আনন্দের সীমা থাকে না।...কিন্তু নাতির মুখ দেখা পর্যন্ত অরিন্দমের অপেক্ষা করতে হয়নি, নিজের ছেলেপুলে সম্বন্ধেই তাঁর অশেষ উৎসাহ। হয়তো তাঁর উচ্ছৃঙ্খল যৌবনই তাঁর মনটাকে ভাবালু ক'রে তুলেছিলো, বাৎসল্য এসেছিলো সহজে। যদিও দেখতে-শুনতে অমন জাঁদরেল, স্বভাব তাঁর অনেকটা স্ত্রীলোকের মতো; নিজের পরিবার তাঁর জীবনের কেন্দ্র। নিজের বাড়ি তাঁর একমাত্র লীলাভূমি; গার্হস্থ্যই যার একমাত্র নৈপুণ্য, সেই মেয়ের মতোই বাড়ির বাইরে তিনি বড়োই অসম্পূর্ণ। বন্ধু-বান্ধব বলতে তাঁর বিশেষ-কেউ নেই; কাজের ও সামাজিকতার বিবিধ উপলক্ষ্যে অনাত্মীয়ের সঙ্গে, বিদেশীর সঙ্গে যেটুকু মেলামেশা না-করলেই নয়, সেটুকুতেই নিজের উপর তাঁর যথেষ্ট জুলুম হ'তো। বরং জংলি মফঃস্বলের ডাকবাংলোয় তিনি আরাম পেতেন, যদিও চাকরির দায়ে স্বগৃহ থেকে আবশ্যিক নির্বাসনের কষ্ট মন থেকে সম্পূর্ণ দূর তাঁর কখনোই হ'তো না। আর পাঁচটি বছর কোনোরকমে কাটলেই চাকরির মেয়াদ ফুরোবে, নাতি-নাৎনিদের (আশা করা যায় তৃতীয় পুরুষের সংখ্যা ততদিনে আরো বাড়বে) বিনি-মাইনের এবং সব-সময়ের চাকর হ'তে পারবেন, এর চেয়ে বড়ো সুখের আশা এখন তাঁর মনে আর কিছু নেই। অরুণের ছেলে হবার খবর তাঁকে রোমাঞ্চিত করেছিলো। ছোটো শিশু তিনি নাড়াচাড়া করেন নি কতকাল। বুলিটাও শেষ পর্যন্ত দস্তুরমতো বড়ো হ'য়ে উঠলো, শাড়ি-পরা মহিলা। তাঁর প্রতিটি ছেলেমেয়ের প্রথম তিনটি বছর তাঁর জীবনের মস্ত সুখের সময়। তাঁর ঠাকুরদার মতো, তাঁরও যদি আঠারোটি ছেলেমেয়ে হ'তো, তিনি একটুও দুঃখিত হতেন না, বরঞ্চ তাঁর জীবনটা বোধ হয় চিরন্তন উৎসব হ'য়ে উঠতো। তাঁর

মনের গভীরতম ইচ্ছাটিই তো এই—তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তাঁর উপর অফুরন্ত দাবি খাটিয়ে তাঁকে একেবারে ফতুর ক'রে দিক। কিন্তু, এ-বিষয়ে সম্প্রতি ভাগ্য তাঁর ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে। অরুণ বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গেই গেছে দূরে স'রে; সে বদখেয়াল মেটাবার জন্যে মা-র বাক্স থেকে টাকা চুরি করে, কিন্তু বাপের কাছে কখনো একটা সিকিও চায় না, বোধ হয় তাতে তার আত্মসম্মানে বাধে! স্ত্রী ঝুঁকেছেন ধর্মের দিকে, নিজের নাকি তাঁর আর কোনো প্রয়োজন নেই, তবে মা-র জন্য···সে আলাদা কথা। মিনি বেচারা হঠাৎ ভারি গম্ভীর হ'য়ে গেছে, সংসারের ব্যাপার 'বুঝতে' শিখেছে, হয়তো কোন্‌দিন বাপের কাছে 'কৃতজ্ঞ' হ'তেও শিখবে, বলা যায় না। বুলিটাই তবু যাহোক্ এখনো ছেলেমানুষ আছে, যদিও বেশিদিন আর থাকবে না, তা জানা কথাই।

'কী বলেছিলে মনে নেই, বাবা?'

'কী আনবো বলেছিলাম, বল্ তো? চিতাবাঘের দুটো বাচ্চা বুঝি?'

বিচিত্র শাড়িগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ফেলে বুলি মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো, 'ছাই!'

'তবে বুঝি একটা সবুজ কাকাতুয়া?'

'উহুঁ।'

'হাঁ—এবারে ঠিক মনে পড়েছে। একটা ময়ূর—না?'

'আনোনি যখন তখন আর ব'লে লাভ কী; কিচ্ছু মনে থাকে না তোমার। বাবা, তোমার নাগপুরের জঙ্গলে অনেক ময়ূর বুঝি?'

'আছে ময়ূর।'

'আর হরিণ?'

'হরিণও আছে।'

'এর পরের বার আমার জন্যে একটা ময়ূর আর একটা হরিণ নিয়ে

এসো—কেমন ? এই বাগানে ওরা থাকবে—কী সুন্দর হবে ভাবো তো !'

'খুবই সুন্দর হবে।'

বুলি ধুপ্ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে [illegible]

'ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
আমার পোষা হরিণে আ[illegible]রে যেমন ভাব,
তেমনি ভাব শালব[illegible]র মহুয়ায়—'

'কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদী কোথায় ?' একটু দূ[illegible]র থেকে অরিন্দম প্রশ্ন করলেন।

মিনি হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'কী বিচ্ছিরি অ[illegible] তুই বুলি, শাড়িগুলো সব মেঝেয় ছড়ালি কেন ?' ব'লেই সে নিচু [illegible]য় শাড়িগুলো তুলে গুছিয়ে রাখতে আরম্ভ করলো, একটু পরে উজ্জ্বলাও এলো তাকে সাহায্য করতে। এতক্ষণ সে যে চুপ ক'রে, দাঁড়িয়ে ছিলো, তার ভঙ্গিটিতে ঠিক যেন গোরুর অচেতন আত্ম-ত্যাগ ও অপার সহিষ্ণুতা।

'থাক্ না বৌদি, আমিই রাখছি ঠিক ক'রে।'

উজ্জ্বলা কোনো কথা বললে না, কাজে বিরতও হ'লো না। সে এ-বাড়ির বৌ, কাজ না করলে তাকে মানায় না, সম্ভব হ'লে এ-বাড়ির সব কাজ ছিনিয়ে নিয়ে তারই একলার সব করা উচিত, [illegible] বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধটুকু ছাড়া তার মুখে বা হাতের ভঙ্গিতে আর [illegible] প্রকাশ পেলো না।

'এত শাড়ি কেন এনেছো, বাবা ?' জিজ্ঞেস করলে মিনি।

'এত আর কোথায় ? তোদের তিনজনের জন্য দু'খানা ক'রে, আর তোর মার জন্যে একখানা। মাঝখানে একবার বোম্বাই গিয়েছিলুম, সেখানে এগুলো কিনেছি। পছন্দ হয় তো তোদের ?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে মিনি বললে, 'মা-র কোন্‌খানা ?'

'তোরা পছন্দ ক'রে নিয়ে যেখানা বাকি থাকে।'

মিনি মনে-মনে একটু হাসলো। এ-সব রংচঙে জমকালো শাড়ি পরবার বয়েস মা-র কি আর আছে! তার নিজেরই তো, দু' বছর আগে যতটা লাগতো, এখন আর সাজগোজ ততটা ভালো লাগে না। ভূষণে শরীর সাজায় কারা? যারা শরীর দিয়ে মন ভোলাতে চায়। মা-মহামায়া এই করুন, নিজের শরীরের এত বড়ো অমার্যাদা করবার কথা তার মাথায় কখনোই যেন না আসে।

শিশুর খেলার পুতুল মা যেমন যত্নে তুলে রাখেন, তেমনি সহাস্য উদাসীনতায় মিনি শাড়িগুলো ভাঁজ ক'রে রাখলো।

বুলি এতক্ষণ রানির মতো ব'সে বোনের ও বৌদির কাজ লক্ষ্য করছিলো, এইবার ভাঁজ করা শাড়িগুলো একখানা-একখানা ক'রে কোলে নিয়ে আস্তে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, 'কই, কোনটা কার বললে না তো, বাবা।'

'বললুম তো, যার যেটা পছন্দ।'

'বাঃ রে, আমার যে সব ক'টা পছন্দ।'

এই সূত্রে একটা তুমুল কলহ আশঙ্কা ক'রে অরিন্দম বললেন, 'এখন রেখে দে ওগুলো, তোর মা এসে যাকে যেটা দেবার দেবেন।'

বুলি ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, 'ওঃ! সেই আশায় থাকো তুমি। তুমি কি ভেবেছো মা এ-সব শাড়ি ছুঁয়েও দেখবেন?'

অরিন্দম অবাক হ'য়ে বললেন, 'কেন, ছুঁয়ে না-দেখবার কী!'

বুলিকে লক্ষ্য ক'রে মিনি যে-রোষদৃষ্টি হানলে তা একেবারেই ব্যর্থ হ'লো। 'জানো না বুঝি!' বুলি ব'লে উঠলো, 'মা যে আজকাল সন্নেসিনি হয়েছেন!

'ও, তাই নাকি!' হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অরিন্দম; মিনির কানে সে-হাসি রীতিমতো অশ্লীল শোনালো।

২

শেষ পর্যন্ত অরিন্দম উঠলেন, গেলেন বাথরুমের দিকে। বাথসল্ট মেশানো সুগন্ধি স্নানের জল তাঁর তৈরি, প্রসাধনের উপকরণ সারি-সারি সাজানো, ঠিক জায়গায় কাপড়, তোয়ালে ভাঁজ করা। বিদেশে, একেবারে একা, বাহাদুরকে ছাড়া তাঁর চলতো কেমন ক'রে? বাহাদুর শুধু যে তাঁর সব কাজ ক'রে দেয় তা নয়, অন্য কাউকে করতে দেয় না, অন্য-কেউ করতে এলে অপমানিত বোধ করে। এই দু'বছর প্রভুর সঙ্গে একা-একা থেকে লোকটার বেআদবিও কিছু বেড়েছে। এর পর হৈমন্তীকে নিয়ে যখন কর্মস্থলে যাবেন, ব্যাটা হয়তো দস্তুরমতো হিংসে করবে। এমনিতেই হৈমন্তী আর এই আধ-বুড়ো নেপালির মধ্যে একটা চাপা, নির্বাক বৈরীভাব অরিন্দম যেন থেকে-থেকে টের পান।

কাপড়চোপড় খুলে তিনি টবে নামলেন; জল তাঁর সমস্ত শরীরে যেন আদরের হাত বুলিয়ে গেলো। মানুষটা কিছু বিলাসী। সাবান ব্যবহার করেন, তার এক কেকের দাম আড়াই টাকা। ছেলেবেলা থেকে কখনো অভাবের মুখ ছাখেননি, টাকা বস্তুটা তাই তাঁর কাছে তুচ্ছ। শুধু নিজের পরিবারের নয়, সমস্ত দেশেরই আপেক্ষিক সচ্ছলতার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন। এই বেকার-হাহাকার তখন ঘরে-ঘরে ছিলো না। তাঁর নজরটাই, তাই, অন্যরকম, এবং আজকালকার মতে, ভ্রান্ত। আজকালকার একটি 'শিক্ষিত যুবক' দেড়শো টাকার একটা চাকরি পেলে ব'র্তে'ও যায়, আবার সেই সঙ্গে দেড়শো টাকার

হিমা তাকে কিছু বর্বরও করে তোলে; আর যাঁদের আয়ের অঙ্কটা
াঝারি রকমেরও মোটা তাঁরা এতই গরম হ'য়ে থাকেন যে সাঁড়াশি
দিয়েও ছোঁয়া যায় কি না যায়। অরিন্দম আস্ত একটা ইম্পিরিয়ল চাকরিতে
এমনভাবে ঢুকেছিলেন যেন পুরোনো চটিজোড়ায় পা ঢোকাচ্ছেন, এ
যে একান্তই তাঁর প্রাপ্য এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ কখনো তাঁর মনে
উঁকি দেয়নি। স্বাভাবিক উদারতা ও ভোগলিপ্সার সঙ্গে এই নিশ্চিন্ত
প্রশান্ত মেজাজ যুক্ত হ'য়ে টাকাকড়ি বিষয়ে তাঁকে অগাধ দরাজ ক'রে
তুলেছিলো। পয়সা করতে তিনি কখনো চাননি, ভোগ করতেই
চেয়েছেন। কখনো শেয়ার কেনেননি, জমির বেচা-কেনা করেননি,
চাকরিতে ঠেলে-ঠুলে উন্নতির চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত হননি; সব জিনিসই সহজে
নিয়েছেন, ভবিষ্যতের চিন্তায় মুখের চামড়ার ঘুমোনো রেখাগুলিকে
জাগিয়ে তোলেননি। আয়ের অনুপাতে, তাই, সঞ্চয় তাঁর সামান্যই;
তবে নিজের বেহিসেবি স্বভাব স্মরণ ক'রে প্রাণপণে লাইফ-ইনশিওর
ক'রে গেছেন। পলিসিগুলোর টাকা পাবারও সময় প্রায় হ'য়ে এলো।
কী হবে অত টাকা দিয়ে? পেন্‌শন তো থাকবে। হৈমন্তীকে নিয়ে
পৃথিবীভ্রমণে বেরোবেন, যাবেন টাহিটি, হনলুলু, বালি, ইজিপ্ট,
ইরান—ইওরোপেও যাবেন, যদিও ইওরোপ তাঁর মনকে বিশেষ টানে
না। ভারতবর্ষে সরকারি কাজ করবার একটা কুফল তাঁর উপর
হয়েছিলো—শাদা চামড়ার মানুষকে কোনোদিন তিনি বিশেষ ভালো
চোখে দেখতে পারেননি।

মাথার উপর ঝরনা খুলে দিয়ে তিনি সজোরে গা রগড়াতে লাগলেন।
…যদি ম'রে যান, তাহ'লে অবশ্য টাকাগুলো হৈমন্তীর লাগবে। মৃত্যুর
কথা মনে হওয়ায় তাঁর হাসি পেলো। অসম্ভব—এখনো তাঁর অসুরের
মতো শরীর। নিজের নগ্ন শরীরের উপর বেশ একটু তৃপ্তির সঙ্গেই
তিনি চোখ বুলিয়ে গেলেন। এমন সুগঠিত উদর বাঙালির মধ্যে

অল্পই দেখা যায়। কোনো রোগ এখনো তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারেনি গরিবের রোগও না, বড়োলোকের রোগও না। না, তিনি মরবেন না কিন্তু পেন্‌শন নিয়ে এই কলকাতাকে বিদায়। ময়ূরাক্ষী নদী কোথায় কোথায় শালবনে আর মহুয়ায়, আলো আর ছায়ায়, হরিণে আর ময়ূরে মেলামেশা? সাঁওতাল পরগনার কোনো অখ্যাত পল্লীতে লাল টালির ছাদের একটি বাড়ি করলে কেমন হয়? হঠাৎ একদিন মিনি আসবে, আসবে বুলি, সঙ্গে কয়েকটি খুদে-খুদে গোল মুখের মানুষ যে-কোনো একদিন বিকেলে কলকাতায় অরুণকে চমকে দেয়া— হয়তো তক্ষুনি বেরুচ্ছে বৌমাকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে সকলে একসঙ্গে থাকাই সুখের হ'তো সন্দেহ নেই, কিন্তু মেয়েরা তো যাবেই আলাদা হ'য়ে, আর এ-বয়েসে ছেলেকে আর মায়ায় জড়িয়ে লাভ কী? যে যে-ভাবে ভালো থাকে, তা-ই তো ভালো।

এমন সময় হঠাৎ অরিন্দমের মনে পড়লো যে তাঁর ছেলে মানুষ হয়নি, আর মেয়ে দুটি এখনো অবিবাহিত। টব থেকে নেমে ধবধবে তোয়ালে দিয়ে গা শুকোতে-শুকোতে তিনি ভাবলেন—আর দেরি না। এই ছুটি ফুরোবার আগেই মিনির বিয়ের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মেয়েটা কেমন যেন শুকনো হ'য়ে যাচ্ছে, এখন বিয়ে না হ'লে আর চলে না।

পিঙ্ক রঙের ডোরা-কাটা পাজামার উপর হলদে সিল্কের ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে তিনি স্নানের ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁকে দেখে মিনি ছোট্ট একটু হাসি চেপে গেলো। বাস্তবিক, বাবার আর কোনো পরিবর্তন হ'লো না! সাজগোজের বাহার সমানে বজায় রেখে চলেছেন। মা যখন স্নানের পরে কালো পাড়ের শাদা সাড়িটি পরেন, কী সুন্দর তাঁকে দেখায়, মনে হয় তিনি যেন কত দুর্লভ, তাঁর মুখশ্রী বুঝি অন্য-কোনো জগতের। মা বাবার এই মূলগত বৈপরীত্যের কথা

ভবে মিনি মাঝে-মাঝে রীতিমতো বিচলিত বোধ করে। কেমন ক'রে জীবনের এতগুলো বছর মা কাটালেন, আর এখনই বা কী করবেন তিনি? অতীতে হয়তো দু'জনের মধ্যে অনেক বিরোধের ঝড় ব'য়ে গেছে—সে-ইতিহাস মিনি কি কোনোদিনই জানবে না? হয়তো মা শেষ পর্যন্ত এই স্থূল, ভোগাসক্ত, সরল মানুষটাকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন, হৃদয়ের দিক থেকে বাবা এতই ভালো যে তাঁকে ভালো না-বাসা বুঝি সম্ভবও নয়। মস্ত খামখেয়ালি ছেলেমানুষ, শিশুর মতোই জীবনের মোটা প্রয়োজনগুলি মিটলেই খুশি, এ-ধরনের মানুষের কোথায় যেন একটা আকর্ষণও আছে, শ্রদ্ধা অনধিগম্য হ'লেও স্নেহের দরজা তারা খোলা পায়। মিনির নিজেরই তো এক-এক সময় মনে হয়, বাবার চাইতে তার বয়েস অনেক বেশি; বাবার উদ্বেল, উচ্ছ্বাসী ভাবটা সে নীরবে সহ্য করে, ভালোই লাগে মোটের উপর।

বাবাকে খাওয়াতে যে ভালো লাগে, সে-বিষয়ে অন্তত কোনোই সন্দেহ নেই। কী উৎসাহ নিয়ে তিনি খেলেন, কী নির্লজ্জ রকম শব্দ ক'রে, কী অকপট আনন্দে চুমুক দিলেন চায়ের পেয়ালায়! 'আর একখানা কটলেট খাও বাবা, লজ্জা কোরো না।...কেক দিই আর-একটু?' মিনি মুচকি হাসলো। আহারের পরিমাণও তাঁর প্রচুর। এ-ধরনের খাওয়া দেখতে ভালো লাগে, ঠিকই, আবার ঈষৎ বিতৃষ্ণাও হয়। ঠিক যেন রুচিসঙ্গত নয়। খাবার সময় বাবার সামনে যদি একখানা আয়না রাখা যেতো, তাহ'লে হয়তো অঙ্গভঙ্গিগুলি তিনি কম করতে শিখতেন। জঙ্গলের বাঘ কি রাস্তার কুকুর যে-ভাবে খায়, সভ্য মানুষের সে-ভাবে খাবার কোনো দরকার নেই; কোনো শত্রু তার খাওয়া কেড়ে নেবে না, পরের দিন খাওয়া জুটবে কি না জুটবে এ-অনিশ্চয়তাও তার নেই।

'সন্দেশ তো খেলে না, বাবা।'

'নাঃ, আর না।'

চায়ের শেষ পেয়ালাটি সামনে নিয়ে অরিন্দম চেয়ারে হেলান দি একটা সিগারেট ধরালেন।—'বুলি, তুই আর-কিছু খাবি ?'

বুলি বাঁকা হেসে বললে, 'থাক, এখন আর জিগেস করতে হবে না তোমার পেট ভরেছে তো, তাহ'লেই হয়।'

বাপের ঔদরিকতা তাদের মধ্যে একটা কায়েমি ঠাট্টা, দী নিঃসঙ্গতার পরে এটা বড়োই মধুর লাগলো অরিন্দমের। হে বললেন, 'তা তোমরা যার যা খুশি খেলেই তো পারে আমি কি বারণ করছি ? মিনি, তুই তো কিছুই খেলিনে আর উজ্জ্বলা ?'

'এই তো খাচ্ছি,' ব'লে মিনি আধ পেয়ালা ঢেলে নিলে, আ তার সঙ্গে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কেক। উজ্জ্বলা নিলে শুধু চা। তার দিে তাকিয়ে অরিন্দম বললেন, 'উজ্জ্বলা, তোমার শরীর তো একেবারে ভালো যাচ্ছে না।'

চায়ের পেয়ালায় নাক ডুবিয়ে রইলো উজ্জ্বলা, কিছু বললে ন 'অরুণ কি এখনো ফেরেনি ?' কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে অরিন চুপ ক'রে গেলেন। এর কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, যা হব হবে ব'লে আর ফেলে রাখা যায় না। কোনো রকম জটিলত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে অরিন্দম কোনো-কালেও নেই. কোনো সমস তিনি সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করেন। আধুনিক নভেলও তিনি পড়া পারেন না—হয় ডিটেকটিভ নভেল, নয় সেই পুরোনো ডিকেন্স ডিকেন্সের মোটা-মোটা ছাঁচে-ঢালা মানুষগুলোর মধ্যে তিনি আরামে নিঃশ্বাস ফেলেন, সত্যিকার মানুষের যে ওর চেয়ে জটিল হওয়া সম্ভ এমন সন্দেহ কদাচ তাঁর মনে উঁকি দেয় না। তাঁর ধারণা, জীবন স্বতঃই সোজা, নিজেদের বোকামি কি ন্যাকামির জন্যই তা বাঁকা হ'

ওঠে ; আর তাই, গল্পে কি সত্য ঘটনায়, যেখানেই তিনি দ্যাখেন মানুষ এমন-কোনো কারণে নিজেকে অসুখী ক'রে তুলছে, সামান্য একটু সহজ বুদ্ধি খাটালেই যার প্রতিকার হয়, সেখানে তাঁর ধৈর্য একেবারেই ভেঙে পড়ে ; যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজন মেটবার পরেও মানুষ যে দুঃখ পায়, সেটা, তাঁর মতে, মনের একটা বিকার মাত্র, তা ছাড়া কিছু না। অরুণের ব্যাপারে তাই তিনি বিচলিত হননি, শুধু বিরক্ত হয়েছেন ; যেমন কিনা, যেদিন জরুরি চিঠি আসবার কথা সেদিন ডাকের দেরি হ'লে আমরা বিরক্ত হই। নিজের জীবনের কারবারে অরিন্দম যে মোটামুটি একটা হিসেব দাঁড় করিয়েছেন, তার মধ্যে অরুণ একটা প্রকাণ্ড গরমিল। ছেলেটাকে ধ'রে চাবকে দিলেই হয়তো সব ঠিক হ'য়ে যায়···কিন্তু সত্যিই কি হয় ? অরিন্দমের মতো মানুষ, যাঁর মধ্যে পশু-প্রাণ প্রবল, তাঁর পক্ষে জঙ্গলের অন্ধকারে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ানো তত কঠিন নয়, জীবনের প্রধান বিপদগুলোও হয়তো তিনি সহজে সামলে উঠতে পারেন, কিন্তু নিজের ছেলে যখন তাঁর হিসেবমতো না চ'লে বেঁকে বসে, তখন তিনি যেন অথই জলে পড়েন, কী করবেন ভেবে পান না। দুশ্চিন্তা করা একেবারেই তাঁর ধাতে নেই ; কোনো বিষয় নিয়ে একটানা বেশিক্ষণ ভাবতে তিনি অক্ষম। তিনি কাজের লোক, ভাবের মানুষ নন। কোনো কাজ করা যখন দরকার, সে-কাজ কঠিন হ'লেও তিনি পেছ-পা হবেন না, কিন্তু ভেবে-ভেবে যদি কর্তব্য আবিষ্কার করতে হয়, তখন তিনি অসহায়। অরুণকে নিয়ে এখন কী করি ? এ-প্রশ্ন বারে-বারেই তাঁর মনে একটা নিরুত্তর, নিষ্ফল আবর্ত সৃষ্টি ক'রে মিলিয়ে গেলো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে তিনি মনে-মনে বললেন, 'দেখবো ওর সঙ্গে একবার কথা ব'লে।' কী-কথা বলবেন, কথা ব'লেও কোনো ফল হবে কিনা, এ-সব প্রশ্ন তিনি একেবারেই এড়িয়ে গেলেন,

করেনি, কানেও তোলেনি তার অর্ধ-স্ফুট প্রতিবাদ, বোধ হয় সেই রাগেই, কে জানে, সে পুরোনো অভ্যেসগুলো বজায় রেখে প্রায়ই রাত কাটিয়ে আসছে বাইরে। এ-ঘরটিতে আগে থাকতো মিনি আর বুলি, এখন দু' বোনের দুটি খাট গেছে পাশের ঘরে, রমাপতিবাবুর পয়সায় কেনা আসবাবপত্রে ঘরটি ঠাসা। প্রকাণ্ড মেহগেনি খাট, চিকচিকে বার্নিশে আলো পড়লে চোখ ধাঁধায়, তিনদিকে আয়না-ওলা ড্রেসিং টেবিল, যা সত্যি বলতে সিনেমার অভিনেত্রীকেই মানায়, কাপড় রাখবার আধুনিকতম দেরাজ একটি রেডিও সেট মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে ঘরের শোভা বাড়িয়েছে; জানলার ধারে একটি ড্রয়িং রুম স্যুইটও বাদ যায়নি। মেয়ের বিয়েতে রমাপতিবাবু দরাজ হাতেই টাকা ঢেলেছিলেন। একজন যুবককে মুগ্ধ করবার সমস্ত উপকরণই আছে এখানে; কিন্তু অরুণ মুগ্ধ হ'লো না। এমন অনেক দম্পতি আছে নিশ্চয়ই, যারা এ-রকম একটি ঘরে থাকতে পেলে জীবন ধন্য মনে করবে; কিন্তু এই ঘরটি বাসা দিয়েছে শুধু অস্পষ্ট, আড়ষ্ট একটি বিষাদপ্রতিমাকে, আর সম্প্রতি নির্বোধ, নিশ্চেতন, স্বেচ্ছাচারী একটি শিশুকে। বেড়া-দেয়া ছোট্ট খাটে (এ-ও রমাপতিবাবুর উপহার) এই অমৃতের পুত্রটি সুন্দর একটি রঙিন কাঁথা গায়ে দিয়ে (উজ্জ্বলার মা নিজের হাতে শেলাই ক'রে বারো খানা কাঁথা দিয়েছিলেন) ঘুমুচ্ছে। খাটের পাশেই ঝুলছে দোলনা; যে-নেপালিনী মেঝের উপর ব'সে ছিলো তার পাহারায়, অরিন্দমকে এগিয়ে আসতে দেখে সে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো।

কাঁথার বাইরে ছোট্ট একটি মুখে ফুটে রয়েছে, গ্যাটাপার্চার পুতুলের মতো রং, চুল কালো, নাকটা অনির্ণেয়, কান দুটো স্বচ্ছ ও টকটকে লাল। অরিন্দম ওর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, 'বাঃ, এই যে আমাদের টাট্টু ঘোড়া! রূপ তো হয়েছে খুব। বড়ো হ'য়ে কত মেয়ের যে মাথা ঘোরাবে তার ইয়ত্তাই নেই!'

বুলি খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, 'মা কী বলেন জানো, বাবা? বলেন, "মুখের ছাঁদটা দেখছি ঠাকুরদার মতোই। স্বভাবটা স-রকম না হ'লেই বাঁচি!" কেন বাবা, তোমার স্বভাব কি মন্দ?'

'তোরাই জানিস।'

বুলি গম্ভীরভাবে বললে, 'আমার তো তোমাকে খুব ভালোই লাগে। টাটু তোমার মতো হ'লে বেশ হয়।'

বোধ হয় কথাবার্তার আওয়াজেই শিশুর ঘুম গেলো ভেঙে। চোখ মেলে সে তাকালো, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে এমন মনে হ'লো না যে এই পৃথিবীর আলো দেখে সে খুশি হয়েছে। তার চোখ গভীর কালো, তা ঠিক; আর কালোর মাঝখানে মণি দুটি নতুন আলপিনের মাথার মতো চিকচিকে, তবু যেন পুতুলের কাচে-গড়া চোখের মতোই তার তাকানো, তাতে আনন্দ নেই, কোনো ব্যঞ্জনা নেই। সোজা সামনের দিকে সে তাকালো, যেন আশে-পাশে কিছুই দেখবার নেই, যেন শরীরটাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে মুচড়িয়ে নতুন দৃষ্টি-কোণ উদ্ভাবনই পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রথম উপায় নয়। বড়োই শান্ত সে, বড়ো বেশি শান্ত। অরিন্দম শিশুর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, হাসলেন তার দিকে তাকিয়ে, আরো দু' একটা মুখভঙ্গি ক'রে গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজও বা'র করলেন, কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না, স'রে এলো না শিশুর চোখের দৃষ্টি, তার গম্ভীর মুখে ফুটলো না হাসির রেখা। সে যেন পূর্বপুরুষের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মেছে, কিছুই তাকে বিস্মিত করে না। অরিন্দম অনভ্যস্ত হাতে অতি সাবধানে তাকে কোলে নিলেন, এত হালকা সে, ন্যাকড়ার একটি পুঁটলি। তার ছোট্ট লাল মুঠিতে অরিন্দম গুঁজে দিলেন চারটি মোহর, এ হাতে দুটো, ও হাতে দুটো, ঠুং-ঠুং ক'রে মেঝেতে আওয়াজ হ'লো, উজ্জলা সঙ্গে-সঙ্গে মোহর ক'টি তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধলো।

তারপর হঠাৎ শিশু কাঁদতে শুরু করলো।

প্রথমে ক্ষীণস্বরে চিঁ চিঁ সুরে, তারপর আর-একটু জোরে, তারপর প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে লাল গুহার মতো মুখের ভিতরটা সম্পূর্ণ দেখিয়ে, কান্না ওর ক্রমেই চড়তে লাগলো। নেপালিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওকে তুলে নিলে অরিন্দমের কোল থেকে, দোলনায় শুইয়ে ঠেলা দিতে-দিতে গুনগুন ক'রে যে-গান করতে লাগলো তার মর্ম এই যে খোকা তুমি যদি এখন চুপ না করো তাহ'লে মা-র খাওয়া হবে না, আর মা-র খাওয়া না হ'লে তুমি খাবে কী?

'উজ্জ্বলা, ও অত কাঁদছে কেন?'

'ও ও-রকম কাঁদেই।' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলে উজ্জ্বলা।

'কাঁদেই? কাঁদে কেন?'

'তা তো জানি না।'

উজ্জ্বলার এই জবাবটা কিছু বোকার মতোই হলো। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার দায় গেছে, এমনি তার ভাব।

'ওর বয়েস না কত হ'লো, উজ্জ্বলা?'

'এই তো তিন মাস প্রায়।'

'আমার মনে হচ্ছে ও যেন সে-রকম বাড়েনি।'

হঠাৎ উজ্জ্বলার মুখে একটা ছায়া পড়লো। সে কি তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে? সে জানে যে এ-বাড়িতে তার কোনো মূল্য না-থাকলেও পুত্র তার অমূল্য, ও এই বাড়ির, তার শ্বশুরের বংশধর সে, পরের মেয়ে, অনিবার্য উপায় মাত্র। যে-গুরু ভার তার উপর এসে পড়েছে, সে কি তার অযোগ্য ব'লে পরিচিত হবে? তাহ'লে আর এ-বাড়িতে তার অস্তিত্বের সার্থকতা কী? ঈষৎ ঢোক গিলে সে বললে, 'আমি তো কোনো অযত্ন করিনে।'

না, অরিন্দম ভাবলেন, উজ্জ্বলা কোনো অযত্ন করে না। ঘড়ির

নাটায়-কাঁটায় ছেলের পরিচর্যা করে সে। তার মধ্যে অবহেলা নেই, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, বিরক্তি নেই ; সে নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য সেবাদাসী। তার স্বামী যদি আজ হঠাৎ রুগ্ন হ'য়ে ঘরে আবদ্ধ হয়, তাহ'লে এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই মেয়ে হবে সেবার দৃষ্টান্তস্থল। যে-মেয়ের ভালোবাসবার ইচ্ছা ব্যর্থ হ'লো, সে-ই যে হবে পরম সেবাপরায়ণ, এ তো জানা কথা। বিনা প্রেমে সঞ্জাত, বিনা স্নেহে লালিত, এর কান্না বোধ হয় তার জন্মের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

'ওর কি কোনো অসুখ ?' অরিন্দম জিজ্ঞেস করলেন।

না, উজ্জ্বলা জানালে, কোনো অসুখ নয় ; জন্ম থেকেই ও রকম, কেমন যেন রোগা, বাড় বড্ড কম।

'ডাক্তার দেখিয়েছিলে ?'

উজ্জ্বলা মাথা নাড়লো। যে-কথা সে বললে না সেটা এই যে ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছে তার ছিলো, কিন্তু হৈমন্তী এ-বিষয়ে বিশেষ কোনো গরজ করেননি। আয়া রেখে দিয়েই হৈমন্তী নিশ্চিন্ত ; ছেলেটাকে ভালো ক'রে ছুঁয়েও দ্যাখেননি বোধ হয়। সত্যি বলতে, এ সব ব্যাপারে মন দেবার সময়ই নেই তাঁর। মায়া-মন্দিরের ঘরের দেয়ালে একটি ছবি টাঙানো হ'লে সে-উপলক্ষ্যেও তাঁর ডাক পড়ে। আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, হয় তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ, নয় স্নানান্তে কালো-পেড়ে শাড়ি প'রে আলগোছে ঘুরে বেড়ান—আর মাঝে-মাঝে বাড়ির তিনটি তরুণীকে ডেকে ধর্মের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেন। মিনি কি বুলি যদি কোনোদিন খোকাকে কোলে ক'রে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছে, তিনি তক্ষুনি বলেছেন, 'নিয়ে যা ওকে আমার কাছ থেকে। আর আমার মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।' বুলি বুঝি একদিন ব'লেছিলো, 'মায়া বাড়লেই তো ভালো, মা, খুব বেশি মায়া হ'লে তুমিও মহামায়া হ'য়ে যাবে', তার জন্যে মা এমন প্রচণ্ড ধমক

দিয়েছিলেন যে, বুলি সত্যি-সত্যি কেঁদেই ফেলেছিলো। এই ধরো না, জীবমাত্রেই যে এক ও অবিনশ্বর আত্মা থেকে সম্ভূত হ'য়ে সেই একই অবিনশ্বর আত্মায় লয় পায়, এ-কথা হৈমন্তী যখন আধো-বোজা চোখে পাৎলা ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে ব্যাখ্যা করছেন, তখন, তাঁর কথার মাঝখানে এ-কথা কি বলা চলে, 'খোকা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, মা, একবার ডাক্তার দেখালে হয় না?' না, উজ্জ্বলা, ভেবে দেখেছে, বলা চলে না। সুতরাং সে চেষ্টা করেছে যতদূর সম্ভব ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়িয়ে দিতে; দু' বেলা একটি সুন্দরী স্ত্রীলোকের ছবির সামনে চোখ বুজে ব'সে মনে-মনে বলেছে 'মা-মহামায়া, আমাকে শান্তি দাও, আমাকে শান্তি দাও।' আর নিজেকে নিজে শিখিয়েছে যে সুখদুঃখ কিছু নয়, শান্তিই চরম, আর সেই শান্তির দিকে রোজ একটু-একটু ক'রে সে এগোচ্ছে।

'ডাক্তার দেখানো উচিত ছিলো। আর, খোকা কেমন আছে সে-বিষয়ে আমাকেও তো কিছু জানাওনি তোমরা।'

উজ্জ্বলা মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

অরিন্দম আবার বললেন, 'চিঠিপত্র তো বুলি ছাড়া কেউ লেখেই না আজকাল। ও ছেলেমানুষ—নিজের বুদ্ধিতে ও যেমন আসে তা-ই লেখে।'

বুলি বললে, 'আমি তো তোমাকে সব খবরই দিই বাবা। টিপ্সি-র একদিন ঠ্যাং মচ্কে গেলো সে-কথাও লিখেছিলাম। বেচারার কী কুঁই-কুঁই কান্না। আমি ভাবলুম বুঝি খোঁড়াই হ'য়ে গেলো ও মা, দু'দিন পরেই দেখি দিব্যি তিড়িং-তিড়িং লাফাচ্ছে। না বৌদি, তোমার ছেলে বড্ড কাঁদুনে হয়েছে, একবার শুরু করলে আর থামে না।'

অরিন্দম বললেন, 'নিশ্চয়ই ওর কোনো অসুখ, সেইজন্যেই বাড়ে

না। কাল সকালেই নীরদ ডাক্তারকে ফোন ক'রে দেবো। তোমরা যে কেমন—এতদিন কেউ একটু খেয়াল করোনি।'

উজ্জ্বলা ক্ষীণস্বরে বললে, 'আমার কোনো দোষ নেই, বাবা।'

'আমি কি বলেছি যে তোমার দোষ? তা তোমার নিজের শরীরও তো ভালো দেখছিনে—কয়েকদিন গিয়ে মা-র কাছে থেকে এলেও তো পারো।'

উজ্জ্বলা চুপ ক'রে রইলো।

'খুব ইচ্ছে করছে মা-র কাছে যেতে, না? কেমন আছেন তাঁরা সব? তোমার বাবা?'

'ভালো আছেন।'

'তাঁরা তো শুনলুম আমার আগেই এসে নাতি দেখে গেছেন।

'হ্যাঁ, মা-বাবা এসেছিলেন একবার।'

'চিঠিপত্র পাও?'

'হ্যাঁ, মা প্রায়ই চিঠি লেখেন। বাবা সেদিন লিখেছেন, আপনি কি একবার যাবেন তাঁদের ওখানে? নাগপুরের পথেই তো পড়ে।'

'হ্যাঁ, যাবো বইকি, নিশ্চয়ই যাবো। অনেকদিন পরে আবার টাটানগরও দেখা হবে। এবার ফেরবার পথেই নামবো ওখানে। তোমাকেও নিয়ে যাবো, উজ্জ্বলা; যদ্দিন খুশি থেকে এসো।'

'আমিও যাবো, বাবা, তোমার সঙ্গে,' বললে বুলি।

'বেশ তো। শুধু টাটানগরে কেন, নাগপুরেই চল্ না।···উজ্জ্বলা, বললুম বটে যদ্দিন খুশি থেকে এসো, কিন্তু আমার কথায় খুব বেশি বিশ্বাস কোরো না। ভাবছি, এবার তোমার শাশুড়িকে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে। একা-একা আর ভালো লাগে না। তুমি পারবে না ওদের দু' বোনকে নিয়ে থাকতে? এ সংসার তো এখন থেকে তোমার হাতেই।'

কথাটা শেষ ক'রে অরিন্দম অনুভব করলেন এ নেহাৎই ফাঁকা বুলি, এ-আলোচনার প্রধান পাত্র যার হওয়া উচিত, সে-ই এতে অনুপস্থিত। পুত্রবধূর সামনে অরুণের নাম উচ্চারণ করতেও অরিন্দমের যেন দ্বিধা। নাগপুর ছাড়বার সময় তিনি মনে-মনে স্থির করেছিলেন যে এই নির্জন বনবাস আর না, হৈমন্তীকে নিয়েই ফিরবেন এবারে, কিন্তু বাড়ি এসে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনুমান করতে পারলেন যে তাঁর এই সামান্য সংকল্প পূর্ণ হবার পথে বাধা অনেক। ভেবেছিলেন ছেলের বিয়ে দিলেই সমস্যা ঘুচবে, হৈমন্তী আর কলকাতায় ব'সে থাকতে বাধ্য হবেন না, কিন্তু এখন দেখছেন ছেলের বিয়ে দিয়ে সমস্যা আরো বেশি জটিল হ'য়ে উঠলো। নিচের ঠোঁট কামড়ে তিনি একটু পায়চারি করলেন প্রশস্ত ঘরে, একটু দাঁড়ালেন জানলার ধারে, বাইরে আকাশ-লাল-ডোরাকাটা, আর পশ্চিমে রক্তের জঙ্গলে সূর্য এইমাত্র হারিয়ে গেলো। কলকাতায় বর্ষার সন্ধ্যা বরাবরই তাঁর বড়ো ভালো লাগে; শহরের অনির্ণেয় দুঃখ আর কদর্যতার উপর প্রতিদিন সূর্যাস্তের জলন্ত আঙুল যখন পড়ে, মুহূর্তে তার চেহারা বদলে যায়, রাস্তা, যান, ভিড়, সারি-সারি উঁচু-উঁচু বাড়ি—নিঃসীম গোলাপি আভায় সব সমগ্র, অশরীরী অস্থায়ী, অপরূপ হ'য়ে ওঠে। আর তারপর ধোঁয়াহীন, স্বচ্ছ রাত্রি, নিরিবিলি পথে গ্যাসের শান্ত সবুজ চোখ।...যাক্, বাড়ি ফিরেছেন তিনি, তাঁর নিজের বাড়িতে, সব চেয়ে যাদের ভালোবাসেন তাদের মধ্যে, কলকাতার লাল আকাশ ঘরের দেয়ালে ছায়া ফেলেছে, কিছু ভাববেন না তিনি, ভেবে কী হবে—বয়স পঞ্চাশের উপর, স্বাস্থ্য ভালো, প্রিয়জন সকলেই কাছে, পয়সার ভাবনা নেই, এর চেয়ে আরাম, এর বেশি সুখ আর কী হ'তে পারে?

'বাবা, তুমি যখন এলে, টপ্‌সি কোথায় ছিলো বলো তো?

'কোথায় রে?'

'বাঃ, বেড়াতে গিয়েছিলো ছট্টুলালের সঙ্গে। ঐ দ্যাখো, আসছে। তোমার সাড়া একবার পেলে আর রক্ষে নেই। তুমি তো একবার ওর কথা জিজ্ঞেসও করলে না, বাবা।'

'তাই তো—ভারি ভুল হ'য়ে গেছে।'

'হ্যাঁ বাবা, তোমরা ঐরকমই। চোখের আড়াল হ'লেই মনের আড়াল। আমি যখন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবো, আমাকেও হয়তো ভুলে যাবে।'

অরিন্দম ছোটো মেয়ের গালে একটা টোকা মেরে বললেন, 'পাগলি।'

৩

খুব কড়া পাকের আনকোরা একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস নিয়ে অরিন্দম বসলেন ইজি-চেয়ারে, দক্ষিণের বারান্দায়। বাহাদুর এসে সবুজ শেড-দেয়া টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো; হাতের কাছে ছোটো টেবিলে রইলো সিগারেটের টিন, দেশলাই, হাঁ-করা নরমুণ্ডের আকারে একটি রুপোর ছাইদান। কিন্তু সেই ধাতব মুখগহ্বরে ছাই জ'মে উঠলো না, কারণ একটির বেশি দুটি সিগারেট ধরাবার সময় অরিন্দম পেলেন না। গল্পটি সত্যি জমজমাট। পাতার পর পাতা ওল্টানো হ'তে লাগলো, ঘড়ির কাঁটা একবার সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরে এলো, তারপর হঠাৎ একবার পাতা ওল্টাতে গিয়ে হাত-ঘড়িতে চোখ প'ড়ে তিনি দেখলেন আটটা বেজে গেছে। হৈমন্তীর এতক্ষণে ফেরা উচিত। সপ্তম পরিচ্ছেদে তৃতীয় হত্যা শেষ হ'লো; একবার এর উপর একবার ওর উপর সন্দেহ ফেলে লেখক পাঠকের মনকে ভুকি-নাচন নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন, অরিন্দম বই বন্ধ ক'রে সিগারেট ধরালেন। সত্যি, হৈমন্তীর এখন ফেরা উচিত—কী যে করে এতক্ষণ ও-সব বাজে জায়গায়! হৈমন্তীর মতো স্ত্রীলোক, যার যেমন বুদ্ধি, তেমনি ভোগপ্রিয়তা সে যে কখনো ধর্মের ভড়ং-এ ভুলবে, অরিন্দম তা কল্পনাও করতে পারেননি। স্ত্রী হিসেবে তাকে অতুলনীয় ব'লেই তিনি জানতেন, কারণ হৈমন্তী সেই জাতের মেয়ে যে সর্বদাই সুখী। নিজে সুখী হ'লে অন্যকে সুখী করা সোজা। স্বামীর জীবনে সুখের বন্যা নিয়ে এসেছিলো সে। সবটাই তার সহজ ছিলো না, নরম মোমের মতো ছিলো না সে, যাকে স্বামীর

ইচ্ছার আঙুল যেমন খুশি রূপ দিতে পারে। তার স্বভাবটা ছিলো উদ্ধত, আত্ম-বিলাসী, তাই সংঘাত বেধেছে পদে-পদে, অরিন্দম এক এক সময় ধৈর্য হারিয়েছেন—কিন্তু তা-ই যদি না হ'তো, তাহ'লে কি এত ধার আসতো জীবনে! নিজের ইচ্ছার কোনো ব্যতিক্রম হ'লে হৈমন্তী রাগ করেছে, ঝড় তুলেছে, কিন্তু কখনো মুখ মলিন করেনি, এ-কথা কখনো বলেনি, 'কিচ্ছু ভালো লাগে না!' প্রাণের লীলায় সে উচ্ছল, সে জীবন্ত প্রণয়প্রতিমা, তার কণ্ঠে, তার কটাক্ষে, তার হাজার সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে দিন-রাত্রি ভরপুর; একটি মুহূর্ত নেই যা মন্থর কি শ্রান্ত কি উদাসীন। ক্রমে অরিন্দম শিখলেন স্ত্রীর মেজাজকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে, অজস্র প্রশ্রয় পেয়ে হৈমন্তীর খেয়াল দিনে-দিনে আরো বেশি রঙিন হ'য়ে উঠতে লাগলো। অগাধ উৎসাহে, অফুরন্ত প্রত্যাশায় ও পূর্ণতায় এমনি ক'রে তিরিশ বছর কাটলো। এখন বার্ধক্য আসছে পলে-পলে, নিঃশব্দ পা ফেলে। 'বুড়ো হ'য়ে গেলাম', অরিন্দম মনে-মনে বললেন, 'কিন্তু বুড়ো হবার আনন্দই কি কম!' এমন হাত-পা ছড়ানো, চুপচাপ নিশ্চিন্ত আরাম তো যৌবনে ভোগ করা যায় না। তখন কেবলই মনে হয়, সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, কিছু একটা করা দরকার। আর এখন নষ্ট করবার মতো প্রচুর সময় আছে হাতে; এখন আর ভবিষ্যৎ নেই, তাই ভাবনাও নেই। কিন্তু সত্যি কি আমরা এতই বুড়ো হ'য়ে গেছি যে আমি আজ আসবো জেনেও হৈমন্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো, আর যদি বা গেলো এখনো ফিরছে না, কেন এখনো ফিরছে না!

মনে হ'লো কার যেন পায়ের শব্দ। অরিন্দম চোখ তুলে তাকালেন—কই, কিচ্ছু না। সমস্ত বাড়িটা চুপচাপ, নির্জীব, এ-বাড়িতে যে মানুষ থাকে বাইরে থেকে তা যেন বোঝবার উপায় নেই। দোতলার ঘরগুলি সবই অন্ধকার, ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে উজ্জ্বলা নিজেও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনি তো সংসারি করছে,

কিন্তু বুলিরও যে কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই এটাই আশ্চর্য। ও, ঐ বুড়ো মাষ্টারটা এসেছে নিশ্চয়ই, হৈমন্তীর পুষ্যি, বুলিকে পড়াচ্ছে। বুড়ো এক মূর্খ বৈষ্ণব, চৈতন্য-চরিতামৃত ছাড়া জীবনে কোনো বই মন দিয়ে পড়েনি, সব জিনিসই ভুল শেখায়, বাংলা বানান সুদ্ধ, তবু হৈমন্তী তাকে মাসে-মাসে পঁচিশটা ক'রে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কারণ লোকটা মা-মা ব'লে সব সময়ই হাত কচলায় আর মাঝে-মাঝে কীর্তন গায়, যদিও তার গলায় কীর্তন গাইবার আন্দাজও স্বর নেই। ওকে এবার তাড়াতে হবে, অন্তত বুলিকে উদ্ধার করতেই হবে ওর হাত থেকে।

অরিন্দম ডিটেকটিভ নভেলটি আবার তুলে নিলেন, কিন্তু একবার চিড়-খাওয়া গল্প চট ক'রে আর জমলো না। তৃতীয় হত ব্যক্তিটি মাত্র সাতদিন আগে ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে নিয়েছিলো, এই পর্যন্ত প'ড়ে অরিন্দমের আবার মনে হ'লো যে বাড়িটা সত্যি বড়ো চুপচাপ ঠেকছে। তিনি একটু কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলেন কোনোদিক থেকে কোনো শব্দ আসছে কিনা, কিন্তু রান্নাঘরের অঞ্চল থেকে দু' একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ছাড়া সবই চুপ। তাঁর বাড়িটি বালিগঞ্জের যে-অঞ্চলে সেখানে এখনো বাড়ির ঘেঁষাঘেঁষি শুরু হয়নি, রাস্তাটি নিরিবিলি, দক্ষিণে ফাঁকা মাঠে এলোমেলো গাছগুলো সোজা চ'লে গেছে লেক পর্যন্ত, যদিও তাদের আয়ু আর বেশিদিন নেই—পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ ফাঁকা মাঠ হবে মধ্যবিত্তের নতুনতম উপনিবেশ, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। এখনো এ-অঞ্চলের গ্রাম্য আনাড়ি ভাব কিছু বজায় আছে, সাড়ে আটটাতেই মনে হয় কত রাত। মাঝে-মাঝে শোনা যায় রাসবিহারী এভিনিউর ট্র্যামের ক্ষীণ গোঙানি, হঠাৎ একটা গাড়ির হর্ন রাত্রিকে চমকে দেয়।

বইটা এখন আর এগোবে না, অরিন্দম আলো নিবিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনায় মস্ত একটি সবুজ চতুষ্কোণ বারান্দার মেঝেতে ফুটে উঠলো। আরে, আকাশে চাঁদ রয়েছে দেখছি। ও, হ্যাঁ, মিনি তো বলেছিলো আজ একাদশী। পরশু নাগপুরে চাঁদ দেখেছিলেন, কাল রাত্রে• রেলগাড়ির জানলা দিয়েও তাঁর চোখে পড়েছিলো, তবু আজ যেন চাঁদ তাঁর চোখে নতুন ঠেকলো। বেশ বোঝা যায়, সে আরো একটু ভরেছে। আজ হু-হু হাওয়া; সমস্ত আকাশ যেন গতিশীল; ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের সঙ্গে বাজি রেখে চাঁদ প্রাণপণে দৌড়চ্ছে—কোথায় পালাবে সে? শুধু, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে যে-ফিকে নীল আকাশ এখানে-ওখানে ফুটে রয়েছে, তা হ্রদের মতো শান্ত, আর দূরের দল-বাঁধা গাছগুলি স্থবির ঘন-নীল। আশ্চর্য, সমস্ত রাত্রিটি প্রায় সিনেমার জ্যোছনার মতোই নীল।

অরিন্দমের হঠাৎ মনে পড়লো একবার পদ্মার বুকে হাউসবোটে অনেক দিন তাঁরা কাটিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের এমন কোনো রম্য জনপদ নেই যা তাঁরা দ্যাখেননি, কিন্তু সমস্ত দেশের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সেই নদী আর আকাশ আর বালুচরই যে অরিন্দমের মনে গভীরতম ছায়া ফেলে' গেছে তার কারণ কি শুধু এই যে তখন তিনি আর হৈমন্তী নব বিবাহিত? তিরিশ বছর পরেও আজ মনে হচ্ছে যেন অমন নির্লজ্জ জ্যোছনা আর কখনো তাঁর চোখে পড়লো না। চাঁদ কি তখন আরো উজ্জ্বল ছিলো, না কি তাঁর বয়েস ছিলো কম? তখন শরৎকাল; নদী কূলে-কূলে ভরা, কাশবনে হাওয়া, বাঁশবন জলে নুয়ে পড়া, শুকনো চরে বকের হাঁসের সারসের ভিড়, বিলের পাখিরা শীতের বাসার খোঁজে উড়ে চলে, জলে কাঁপে ছায়া, ছল্‌ছল্‌ জল, কখনো নৌকো চলে কখনো থামে, নামো এই গ্রামে, আজ দেখছি হাটবার। অন্ধকার, ঘাটের নৌকোগুলোয় আলো জ্বলা, জলের তলায় তাদের ছায়া আঁকাবাঁকা লাল সাপের মতো, হঠাৎ আকাশ লাল, আগুন লাগলো

নাকি? না, না, এ কী! চাঁদ উঠলো যে, স'রে গেলো কালো কাপড়, আলোর ফেরিওলা পথে বেরুলো, আর সারা রাত ভ'রে পাখিদের চ্যাঁচামেচি ডাকাডাকি।

হৈমন্তী এই নদী, এই আকাশ আর কাশবন আর ধূ-ধূ হলুদ বালুচর, এ-ও হৈমন্তী। সে রান্না চাপিয়েছে, নাইতে নেমে গান ধরেছে, বিকেলের আলোয় চুপ ক'রে বই পড়ছে, ভোরবেলা শূন্য চরে নেমে জুতো ছুঁড়ে ফেলে' দিয়েছে দৌড়—এই চরেই যে কুমির ডিম পাড়ে সে-কথা একদম ভুলে গিয়ে। একদিন যেতে-যেতে সত্যি তাঁরা দেখলেন একটা কুমির মড়ার মতো প'ড়ে আছে চরে। অরিন্দম গুলি ছুঁড়লেন, কিন্তু লাগলো না, কুমীর চমকে উঠে টুপ ক'রে জলে ডুবে গেলো, আর কোথা থেকে এক ঝাঁক পাখি কিচকিচ করতে-করতে উঠলো আকাশে। অগত্যা সেই নিরীহ পাখিই গোটাকতক নামালেন, রাত্তিরে রোস্ট। রক্তমাখা পাখি দেখে হৈমন্তীর কান্না পেতো, কিন্তু রান্না করতো যত্নে, আহারেও অরুচি ছিলো না। শেষ পর্যন্ত হৈমন্তীও শিখেছিলো ছর্‌রা ছুঁড়ে পাখি নামাতে—আর সেবার যখন তাঁরা মোটরে ছোটোনাগপুর চ'ষে ফিরছিলেন, একবার এই বঙ্গললনার হাতে একটি হরিণ-শিশুও প্রাণ হারিয়েছিলো। আর মোটর চালাতেই কি তার উৎসাহ কম!—একবার বেঁকে বসলো রাঁচি থেকে নেতেরহাট নিজেই চালিয়ে নেবে। অরুণ তখন দু' বছরের। পাহাড়ি পথের মোড়ে হঠাৎ ছবির মতো একটি ডাকবাংলো দেখা দেয়—কী সুন্দর, থামো, এখানে থাকবো আজ। পাহাড় আর কাঁকর আর জঙ্গলের দেশে যত ডাকবাংলো আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে, তার মধ্যে এমন একটিও প্রায় নেই যেখানে তাঁরা কয়েক ঘণ্টা অন্তত না কাটিয়েছেন। সেবারে নতুন গাড়ি কিনে পুরো শীতটাই তাঁরা হৈ হৈ ক'রে বেড়ালেন; অরিন্দমের মাঝে-মাঝে একটু ক্লান্ত লাগতো, কিন্তু

হৈমন্তী অফুরন্ত ফুর্তির ফোয়ারা। যেমন তার উদ্যম তেমনি তার নিপুণতা, চলো বলতেই পাঁচ মিনিটে মোটঘাট বেঁধে প্রস্তুত। অরিন্দমের সরকারি সফরেও হৈমন্তী সঙ্গে যেতে ছাড়তো না, যদিও অনেক সময় এমন জায়গায় যেতো হ'তো, যেখানে পানীয় জল দুর্লভ; কিংবা যেখানে দশ মাইলের মধ্যে সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই, সপ্তাহের রসদ ঘাড়ে ক'রে নিতে হয় টেনে। একবার দারজিলিং থেকে গেলেন সিকিম, হৈমন্তী অরুণ আর মিনিকে (তখন মিনি বছর দেড়েকের) তার মার জিম্মায় রেখে চাপলো ঘোড়ায়, তার সেই ব্রিচেস-পরা মূর্তি মনে করতে এখনো মজা লাগে। শিকারের দুর্গম পথে তাঁবুতে কত রাত কেটেছে তাঁদের, নাকে ঘাসের গন্ধ, চারদিকে থমথমে অন্ধকার। ধরমশালায়, সরাইখানায়, রেল-স্টেশনের নৈর্ব্যক্তিক, আরামহীন ওয়েটিংরুমে, বিচিত্র অপরিচিত পরিবেশে, বিদেশী ভাষার অনভ্যস্ত ব্যঞ্জন-গুঞ্জনের মধ্যে অনেক ভোর হয়েছে, অনেক সন্ধ্যা নেমেছে। অসুবিধে ছিলো অগুনতি, তার চেয়েও বেশি ছিলো আনন্দ। দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ পার হ'য়ে আজ তাঁরা দু'জনে যেখানে এসে পৌঁচেছেন সেখানে আসন্ন বার্ধক্যের গভীর পূর্ণতা। তিরিশ বছর বয়সে কতদিন ভেবেছেন—হায়রে, আমিও তো একদিন বুড়ো হ'বো। অথচ আজ পঞ্চাশের উপরে এসে—কই, একটুও তো খারাপ লাগছে না বাঁচতে। কিছুই এখনো বিস্বাদ হয়নি, জীবন এখনো তীব্রভাবে উপভোগ্য। মানুষের জীবনটা আসলে বড্ড ছোটো।

আশে-পাশের মেঘ স'রে গিয়ে চাঁদটা হঠাৎ আরো বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, অরিন্দমের দিকে সে যেন অসভ্যের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পূর্ণিমার আগে চাঁদের আকারটা ঠিক স্ত্রীলোকের স্তনের মতো দেখায়—একটু পরে এক টুকরো হালকা মেঘ এসে যখন তার খানিকটা ঢেকে দিলো, অরিন্দম যেন একটু স্বস্তি বোধ করলেন।

একটা সিগারেট নেবার জন্য খাড়া হ'য়ে বসতেই তাঁর চোখে পড়লো সিঁড়ির ধারে অস্পষ্ট একটা মূর্তি।

'কে, অরুণ?'

অরুণ চট্‌ ক'রে ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিলো, থমকে দাঁড়ালো।

'অরুণ।'

আস্তে-আস্তে অরুণ এগিয়ে এলো।

'আলোটা জ্বাল্‌।'

অরুণ দেয়ালে হাত দিলে, জ্ব'লে উঠলো আলো জ্যোছনাকে শুষে নিয়ে।

'বোস', যে-মোড়াটায় অরিন্দম পা রেখেছিলেন সেটা এগিয়ে দিলেন ছেলের দিকে।

কিন্তু অরুণ বসলো না, মুখেও কিছু বললে না, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্য কিছু বলবার আগে অরিন্দম ভালো ক'রে ছেলের দিকে তাকালেন। খুবই ছেলেমানুষ। চব্বিশও হয়নি। মুখে কাঁচা বয়েসের আভা এখনো জ্বলজ্বল করছে—এ-বয়েসটা এতই সুন্দর যে ওর লাম্পট্যকে পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। কিন্তু এ-ভাবেই যদি ও চলে, তাহ'লে আর পাঁচ বছরের মধ্যেই এ-মুখ হবে স্থূলতার ছবি। এখনই ওর থুত্‌নিটা কেমন যেন একটু ঝুলে পড়ছে। না কি এ অরিন্দমেরই চোখের ভুল? কিন্তু ও যে মোটা হ'য়ে যাচ্ছে এতে তো আর ভুল নেই।

'তুই বড্ড মোটা হ'য়ে যাচ্ছিস, অরুণ।'

অরুণ কিছু বললে না, চোখ তুলেও তাকালো না।

'দিনে খুব ঘুমোস বুঝি?'

'কই, না তো।'

বাপের কাছ থেকে পালাতে পারলে অরুণ বাঁচে। যতদিন ও

ইস্কুলে পড়তো বাপের সঙ্গে ছিলো ওর ভীষণ ভাব। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই ও স'রে যেতে লাগলো দূরে —তারপর এখন তো এমন হয়েছে যে বাপের সঙ্গে চোখাচোখি না-হ'লেই খুশি হয়। কেন এমন হয়? বাপকে মূঢ় ভাবে ভাবুক, কিন্তু ছেলেগুলো এমন মূঢ় কেন হয় যে বাপকে শত্রু ভাবে? মেয়েরা তো এমন হয় না। বিবাহ তাদের জীবনে আমূল বিপ্লব আনে, তবু—না কি সেইজন্যেই?—বাপ-মার সঙ্গে তাদের বন্ধুতা দিনে-দিনে আরো গাঢ় হয়। স্বভাবতই একটু বেশি সন্তানবৎসল, ছেলের এই দূরত্বে অরিন্দম মনে কষ্ট পান। মা-র সঙ্গে ভাব থাকলেও হ'তো—বেশির ভাগ ছেলেরই তা-ই থাকে। কিন্তু এবার এসে অরিন্দম বাড়ির হাব-ভাব যা দেখছেন, মা-র সঙ্গে ছেলের বিশেষ দেখাশোনা হয় ব'লেও তো মনে হয় না। হঠাৎ অরিন্দমের মনে হ'লো যে অরুণেরও হয়তো বাড়ির বিরুদ্ধে অনেক নালিশ আছে, এবং সেগুলো নেহাৎ অন্যায্যও নয়। কথাটা ভেবে অবাক লাগলো তাঁর।

'একটু এক্সারসাইজ করলেও তো পারিস। নয়তো দু'দিন পরেই ভুঁড়ি বেরোবে যে।'

অরুণের মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠলো।

'এম. এটা পড়লি না কেন?'

'কী হ'তো প'ড়ে?'

'সময় তো কাটতো।'

'শুধু এইজন্যেই?'

'সময়টা ভালোভাবে কাটানোই তো মস্ত লাভ।'

অরুণ কিছু বললে না। যে দু'একটা কথা সে বলেছে, তাও যেন সে বলতে চায়নি, তার ভিতর থেকে কেউ ঝেঁকে-ঝেঁকে বা'র ক'রে দিয়েছে।

'তাহ'লে একটা কাজ-কর্মই কিছু কর।'

'কাজ কোথায়?'

'আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

'বেশ।'

অরুণ এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন চ'লে যাবে। পাছে সে সত্যি চ'লে যায়, অরিন্দম তাড়াতাড়ি আর-একটা কথা পাড়লেন, 'খোকার তো দেখছি অসুখ।'

'খোকা কে?'

'কে? তোর ছেলে।'

'ও—কমল।'

'কমল নামটা যদি তোর পছন্দ হয়, তবে তা-ই। আমি নাম রেখেছি টাটু। এখন কথাটা হচ্ছে, ওর অসুখ।'

'তা-ই নাকি?'

'আমার মনে হয় অনেকদিন ধ'রেই ওর অসুখ, এতদিন যে তোরা কেউ কিছু খেয়াল করিসনি, তাতে অবাক হচ্ছি।'

'ওর মা তো রয়েছে।'

'বৌমা ছেলেমানুষ—সে কী বোঝে?'

'বুড়োমানুষটা কে? আমি?'

অরিন্দম মুচকি হেসে বললেন, 'তা বাপ যখন হয়েছো, ঠিক গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলবে না।'

অরুণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর, প্রায় মিনিটখানেক পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বললে, 'তোমরাই বিয়ে দিয়েছো, তোমরাই দেখবে।'

'ও, তুই তা-ই ভেবেছিস।'

'তা-ই যদি না হবে তাহ'লে কি আর এত অল্প বয়েসে তোমরা আমার বিয়ে দিতে।'

ও, এ-ই তাহ'লে অরুণের মনের কথা। চব্বিশ বছর বয়সে বিবাহিত ভদ্রলোক এবং সন্তানের পিতা হ'তে তার ভালো লাগছে না, এবং এ-ও ঠিক যে স্ত্রীপুত্র তার ঘাড়ের উপর চাপানো হয়েছে—আমরাই চাপিয়েছি, অরিন্দম ভাবলেন। তা বিয়ে তো করতোই, না-হয় দু'দিন আগেই করেছে। ছেলে উচ্ছন্নে যাচ্ছিলো, তার মতিগতি ফেরাবার জন্যেই এত তাড়া। মহামায়া বলেছিলেন—ছেলের বিয়ে দাও, তাহ'লেই ও-সব সেরে যাবে; এর উপর আর কথা কী—হৈমন্তী তক্ষুনি মেয়ের খোঁজ করতে লাগলেন। ছেলের প্রতি কি অন্যায় করেছেন তাঁরা? কিন্তু একে অন্যায় বলা কি ন্যাকামি নয়—উজ্জ্বলা দেখতে ভালো, গুণও তার অনেক, বৌ নিয়ে অসঙ্গতরকম নাচানাচি করাই তার উচিত ছিলো। আর তাছাড়া সত্যি যদি ওর এতই আপত্তি তাহ'লে সেটা মুখ ফুটে বললে না কেন, কেন বিয়ে করলে? হাজার হোক, কচি খোকা তো আর নয়।

'অল্প বয়েসে বিয়ে করা তো ভালোই। আজকাল বেশির ভাগ ছেলে টাকার টানাটানিতে সেটা পারে না, তোর তো আর সে ভাবনা নেই।'

'আমার টাকা কোথায়?'

কথাটা শুনে অরিন্দমের একটু রাগ হ'লো। এইটুকু বয়েসে কত টাকা ও বদখেয়ালে উড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, আবার বলে কিনা টাকা কোথায়! আস্ত শুয়োর! হঠাৎ রাগের ঝোঁকে ব'লে উঠলেন, 'ওঃ, এ-বিষয়ে তো খুব টনটনে জ্ঞান দেখছি! এ-ও কি আর মনে-মনে না ভাবিস যে বাবা এখন মরলেই ভালো, টাকাগুলো আমার হাতে আসে। আশা নেই, অরুণ, আশা নেই, আমি আরো অনেকদিন বাঁচবো।'

অরুণ শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে সরালো, তারপর

আস্তে হেঁটে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো ঘরের অন্ধকারে। অরিন্দম বাধা দিলেন না, ওর বিলীয়মান পিঠের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন এ-সব ঝকমারি আর ভালো লাগে না; একবার সরকারি কাজে ইস্তফা দিতে পারলেই হয়, তারপর ছুটি, ছুটি, সাঁওতাল পরগনায় ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।...কিন্তু তার আগে অনেক যে বাকি, মেয়ে দুটোর বিয়ে আর অরুণকে একটা কাজে-কর্মে বসিয়ে দেয়া দরকার, নয়তো ও মানুষ হবে না। ওর জন্যে এমন-কোনো কাজ খুঁজতে হবে, যাতে বিশেষ কোনো দক্ষতার দরকার করে না, শুধু ভালো চেহারা আর বড়ো-চাকুরে বাপের জোরেই যেখানে কাটবে। আর আজকাল বাংলা দেশে যোগ্যতার চেয়ে বাপের জোরই বড়ো এ-কথা কে না জানে! অন্যায়, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-অন্যায় দূর করবার ক্ষমতা যখন আমার নেই, তখন এ থেকে যে সুবিধেটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তা-ই বা নেবো না কেন?

তাঁর কোন-কোন প্রতিপত্তিশীল বন্ধুকে ধরলে অরুণকে একটা ভদ্রগোছের কাজে ঢোকানো যেতে পারে, অরিন্দম মনে-মনে তার হিসেব করছেন, এমন সময় এই গবেষণার উপলক্ষ্যকে আবার বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। অরুণেরই দুর্ভাগ্য, নিচে নামবার সিঁড়ি ঐ বারান্দা পার হ'য়েই। বাবা আজ আসছেন, এ-খবর তার জানা ছিলো, কিন্তু সে আশা করেছিলো এ-সময়ে তিনি হয় বা থাকবেন না, নয় নিজের ঘরে থাকবেন, সে অলক্ষিতে এসে অলক্ষিতে আবার বেরিয়ে যেতে পারবে। দলের লোকরা অপেক্ষা করছে চৌরঙ্গির রেস্তোরাঁয়, ফুর্তির খরচ জোটাতে সে বাড়ি এসেছিলো। টিপিটিপি ঘরে ঢুকে দেখেছে উজ্জ্বলা ঘুমিয়ে; আলো জেলে, তার আঁচল থেকে আলমারির চাবি খসাতে গিয়ে আঁচলে আবিষ্কার করেছে চারটি স্বর্ণমুদ্রা, মুহূর্ত-কাল দ্বিধা ক'রে সে মোহর ক'টি পকেটস্থ করেছে—পকেটে থাক্ না, খরচ না-করলেই হ'লো, ঠিক এনে ফিরিয়ে দেবো। আলমারি খুলে

সেখানে বিশেষ কিছু পায়নি, শাড়ির ভাঁজের তলায় সামান্য একটি দশ টাকার নোট, তা ওটাকেও অগ্রাহ্য করা গেলো না। এ-সমস্ত টাকাই সে ধার নিচ্ছে বাড়ির কাছ থেকে। তার পানশালার এক বন্ধু মস্ত বিজনেসম্যান, তার সাহায্যে খুব শিগগিরই তার বেশ বড়োরকমের একটা ব্যবসা ফাঁদবার মৎলব—কথাবার্তা প্রায় ঠিক হ'য়ে গেছে। ব্যবসাটা একবার ফেঁপে উঠলেই হয়, তখন এই সমস্ত টাকাই সে ফিরিয়ে দেবে, সুদসুদ্ধ। টাকা রোজগার করতে পারছে না ব'লেই না সে আজ অপদার্থ অমানুষ; আসুক একবার টাকা হাতে, তখন এই তাকেই সবাই ধন্য-ধন্য করবে। ছোঃ! কে-ই বা মদ না খায়, আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তিই বা কে না করে! যত সব মস্ত নাম-ডাকওলা বড়ো-বড়ো লোক, তাঁরা?

সবই হ'লো, কিন্তু বাবা ঐ বারান্দায় ব'সে-ব'সে করছেন কী? বাড়ি ঢুকতেই একেবারে তাঁর মুখোমুখি প'ড়ে যাবে এটা অরুণ ভাবতেও পারেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে সে ছোটোখাটো একটি দৌড় দিলে সোজা সিঁড়ির দিকে, কিন্তু যা আশঙ্কা করেছিলো, তা-ই হ'লো। বাবা তাকে ডাকলেন। সে থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু এগিয়ে এলো না।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

অরুণ মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'বেড়াতে যাচ্ছি একটু।'

'এই তো বাড়ি ফিরলি। শুনলুম সারাদিন বাড়ি ছিলি না; কোথায় থাকিস, করিস কী?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে অরুণ সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

অরিন্দম একটু চড়া গলায় হাঁক দিলেন, 'শোন্।'

অরুণ দাঁড়ালো।

'এদিকে আয়।'

অরুণ কয়েক পা এগোলো।

'এখন তো খাওয়ার সময়, এখন আবার বেরুচ্ছিস কেন?'

'এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে, বাড়িতে খাবো না', সোজা মেঝের দিকে তাকিয়ে অরুণ বললে। ছেলেটা মিথ্যুক, অরিন্দম ভাবলেন। আর অরুণ মনে-মনে বললে, বাবাও তো শুনি ছেলেবয়েসে কম ওড়েননি, এখনো তো পেগ-টেগ দিব্যি চলে। আমাকে বাগে পেয়ে আমার উপর খবরদারি! আমিও আমার ছেলেকে শাসনের চোটে অস্থির ক'রে তুলবো, যাক না দু'দিন।

'তুই নাকি মোটে বাড়িতেই থাকিস্ না?'

অরুণ মনে-মনে ভাবলে যে বাবা যখন সবই জানেন তখন খামকা আর এ-সব কথা তুলছেন কেন? স্রেফ সময় নষ্ট। আর বানিয়ে-বানিয়ে কতগুলো বাজে কথা বলতে কারই বা ভালো লাগে!

'এখানে-ওখানে যাই। কাজকর্মের চেষ্টা করি।'

'রাত্তিরে?'

কেমন! বড়ো না ভেবেছিলে বিয়ে দিয়েই শেকল পরাবে! এখন কেমন! কথাটা ভাবতে অরুণের এতই মজা লাগলো যে উপরের ঠোঁটটা একটুখানি বেঁকে গেলো পর্যন্ত।

'রাত্তিরে তো বাড়িই থাকি—এক-আধদিন ফিরতে দেরি হয়, সিনেমায় যাই-টাই।' এমন সরলভাবে অরুণ বললে কথাটা যে অরিন্দমের প্রায় বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হ'লো। এই নির্দোষ ভালোমানুষির ছদ্মবেশ অতল প্রবঞ্চনা লুকিয়ে রেখেছে ... ও চব্বিশ বছরের এক যুবকের মধ্যে, এ-দৃশ্য চোখে দেখলে মানবা...ত্রের উপরেই ঘেন্না ধ'রে যায়।

অরিন্দম ছেলের চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'তোমার প্রত্যেকটি কথা মিথ্যে। তোমার ইতরামো অনেক সহ্য করেছি—এবার আমি তোমাকে মজুত ক'রে ছাড়বো।'

লাল হ'য়ে উঠলো অরুণের মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জুতো দিয়ে আস্তে মেঝেটা ঠুকতে লাগলো। একটু পরে স্পষ্ট গলায় বললে, 'আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। আমি যাই।'

অরিন্দম জ্ব'লে উঠে বললেন, 'হবে না তোমার যাওয়া। আমি বলছি তুমি এখন বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না।'

অরুণ মুখ তুলে তাকালো, সে-মুখ পাথরের মতো।—'আমাকে যেতেই হবে।'

'কক্‌খনো না। এখন যদি তুমি বাড়ি থেকে বেরোও, এ-বাড়িতে আর তুমি ফিরতে পারবে না, এই আমি ব'লে দিলাম।'

'বেশ, তা-ই হবে', ব'লে অরুণ ঘাড় বেঁকিয়ে তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। পকেটে তার চারটি স্বর্ণমুদ্রা, রেস্তোরাঁয় বড়োলোক বন্ধু, কিসের অভাব তার?

নিচে ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে দেখে সে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলো, 'হ্যালো, অরুণ!'

ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে সে একটু অবাকই হ'লো। এ-বাড়ি সে আজ শেষবারের মতো ছেড়ে যাচ্ছে, এ-কথা ভাবতে সে ভিতরে-ভিতরে দারুণ উত্তেজিত বোধ করছিলো; নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে সে বললে, 'এ কী! নিরঞ্জন? এতদিন পরে!'

'এই তো এলুম।'

'তারপর? কী খবর? লাহোরে ছিলে না?'

'সেখান থেকে এক ধাক্কায় বর্মা। মাঝে কিছুদিন কলকাতায় বিশ্রাম।'

'ও, তুমি বর্মা যাচ্ছো।'

'হ্যাঁ; চীন-সীমান্তের কাছাকাছি কোথায় নাকি নতুন একটা তেলের খনি বেরিয়েছে—কোম্পানি দিলে সেখানে ঠেলে।'

'তার মানে বেশ বড়োরকমের একটা লিফ্‌ট্ পেয়েছো? কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স।'

নিজের আর্থিক সচ্ছলতা দেখাবার জন্যে নিরঞ্জন পকেট থেকে দামি সিগারেটের টিন বা'র ক'রে বন্ধুর সামনে ধরলে। তারপর দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠি অরুণের মুখের দিকে এগিয়ে বললে, 'তোমরা সব কেমন আছো?'

'ঠিক জানি না—বোধ হয় ভালোই,' ব'লে অরুণ দাঁত বা'র ক'রে হাসলো। 'তুমি কতক্ষণ এসেছো?'

'এই তো মিনিট দশেক হবে।'

'একাই ব'সে আছো?'

'অপেক্ষা করছিলাম—কারো না কারো দেখা পাবোই।'

অরুণ খুব সরলভাবে বললে, 'বোসো তুমি—মিনিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি

'তুমি—তুমি বেরুচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই, আমাকে একটু বেরুতেই হচ্ছে, কিছু মনে কোরো ন আছো তো কিছুদিন কলকাতায়?'

'টেনে-টুনে মাসখানেক।'

'তোমার কাকার বাড়িতেই আছো?'

'নাঃ, একটা হোটেলেই উঠলাম—পার্ক হোটেল। কোম্পানি থে যখন খরচ পাওয়াই যাচ্ছে! এসো না একদিন। সাতাশ নম্বর ঘর

'যাবো। ...আচ্ছা, আজ আমার একটু তাড় াছে, আ দেখা হবে।' ভিতরের দরজার দিকে দু'পা এ...য়েই অরুণ হ থমকে দাঁড়ালো। তারপর ব্যস্তভাবে ফিরে এসে একটু নিচু গ বললে, 'বাই দি ওয়ে, নিরঞ্জন, তোমার কাছে টাকা আছে?'

প্রশ্নটা শুনে নিরঞ্জন হয়তো একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো, কিন্তু সে-ভাবটা ফুটতে দিলে না। জিজ্ঞেস করলে, 'এখন? আমার সঙ্গে

অরুণ মাথা নাড়লো।

'কত টাকা?'

অরুণ একটু ভেবে বললে, 'পঞ্চাশ?'

'অত তো হবে না।'

অরুণ ভুরু কুঁচকে বললে, 'গোটা কুড়ি?'

'তা হবে।'

'কুড়িটা টাকা এখন আমায় দিতে তোমার কি অসুবিধে হবে?'

'আরে না—অসুবিধে কিসের!' নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বেশ বৃহৎ আকারের একটি মনি-ব্যাগ বার করলো পকেট থেকে।

'কালই তোমায় ফেরৎ দিয়ে আসবো—সকালের দিকে থাকো তো?'

'কী আশ্চর্য, এত তাড়া কিসের!'

নোট দুটো পকেটে ভ'রে অরুণ বললে, 'ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখাটা হ'লো। মুশকিল হয়েছে কী জানো, একটা লোকের আজকে আমাকে দু'শো টাকা পেমেন্ট ক'রে যাবার কথা—সে এলোই না। ছুটছি এখন তার ওখানে—আর বলো কেন ভাই, বিজনেস-এর যা ঝকমারি!'

'তাহ'লে ব্যবসাই ধরলে?'

'কী আর করি, বলো, তোমার মতো তুখোড় ছেলে তো আর নই যে ফস্ ক'রে একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলবো। এ-সব বিষয়ে কথা আছে তোমার সঙ্গে—পরে হবে। আচ্ছা, চলি এখন। দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মিথ্যে বলার রীতিমতো একটা নেশা আছে, একবার শুরু হ'লে আর থামতে চায় না, বোধ হয় তারই ঝোঁকে চ'লে যেতে-যেতে নেহাৎ অকারণে অরুণ বললে, 'কাল সকালেই যাবো তোমার ওখানে।'

মিনিকে পাওয়া গেলো খাবার ঘরে, টেবিলে ফুলের তোড়া সাজাচ্ছে। অরুণ পিছন থেকে আস্তে ডাকলে, 'মিনি।'

'দাদা!' মিনি রীতিমতো চমকে ফিরে তাকালো।

অরুণ দ্রুতস্বরে বললে, 'তুই একটু বসবার ঘরে যা—নিরঞ্জন এসেছে।'

'কে?' মিনির গলাটা একটু কেঁপে গেলো কি?

'নিরঞ্জন—নিরঞ্জন বোস—বুঝেছিস এবার?'

'সে—সে এসেছে কেন?'

'বাঃ, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে আসতে নেই?'

'তা তোমার বন্ধু তুমি গিয়ে ব'সে গল্প করো। আমি পারবো না যেতে।'

'আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি যে।'

'এখন বেরুচ্ছ?'

অরুণ হেসে বললে, 'হ্যাঁ, বেরুচ্ছি। এ-বাড়িতে আর ফিরবো না।'

'কী যে যা-তা সব বলো! দাদা, একটা কথা রাখো—আজ তুমি কোথাও আর না গেলে। বাবা যে-ক'দিন আছেন—'

'নে, চুপ কর্। নিরঞ্জন অনেকক্ষণ ব'সে আছে কিন্তু।'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—'

'সত্যি বলছি, ওকে আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে অভদ্রতা হবে। তুই যা।'

পরের মুহূর্তে মিনি তাকিয়ে দেখলো, দাদা তার অদৃশ্য

তোড়াটা এতক্ষণ তার হাতেই ধরা ছিলো, সেটা ফুলদানিতে নামিয়ে রেখে সে একটু অপেক্ষা করলো। কান দুটো তার ঈষৎ গরম লাগছে। চাকর দিয়ে ব'লে পাঠাবে দিদিমণি ব্যস্ত আছেন, বাবু চ'লে যেতে পারেন। দাদা যদি বেরুলোই ওকে নিয়ে বেরুলেই

তো পারতো। আর কেমন ভদ্রলোক—একা ঘরে চুপ ক'রে ব'সেই আছে—আমি কি ওর সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য? ও কেন এসেছে আবার, আর কি আমি ভুলবো ওর ছলনায়! দু' বছর আগে নিরঞ্জন যে-মিনিকে দেখেছিলো এখন যে সে-মানুষই আর নেই। ইতিমধ্যে মা-মহামায়ার আশ্রয় পেয়েছে সে, তার অন্তর এখন কত উন্নত, কত পবিত্র! মিনি চেষ্টা করলো মহামায়ার মুখের দিব্য দীপ্তি মনে আনতে আর তার কল্পনা যাতে ব্যাহত না হয়, বোধ হয় সেইজন্যেই ঢুকলো গিয়ে বাথরুমে। সেখানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চেষ্টা করলো মা-কে দেখতে (শোনা যায়, সঙ্কটের সময় ভক্তদের তিনি এইভাবে দেখা দেন), কিন্তু মিনির অহমিকাই নিশ্চয়ই এখনো দূর হয়নি, তাই পারদ-মাখানো কাচ তার নিজের প্রতিমূর্তিই ফিরিয়ে দিলে। চুলের উপর সে একবার আঙুল বুলিয়ে গেলো (এ-বাথরুমটায় আবার চিরুনি নেই), আঁচলটা বুকের উপর দিয়ে দু'তিনবার টেনে ঠিক ক'রে দিলে—তারপর হঠাৎ এক সময় দেখলে সে ড্রয়িংরুমের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই নিরঞ্জন বোস। তফাতের মধ্যে পঞ্জাবি জলবায়ুতে স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়েছে, মুখটা ভরা-ভরা, রংটা লালচে। আর ঐ পঞ্জাবি মেয়েটা—সে কেমন দেখতে?

নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।—'কেমন আছেন?'

এ-প্রশ্নের উত্তরে মিনি একটুখানি মাথা নাড়লো, আর কিছু না। নির্বোধ নিরঞ্জন তবু আবার বললে, 'ভালো আছেন?'

এবারে মিনিকে কিছু বলতেই হ'লো: 'আপনাকে অনেকদিন পরে দেখছি।'

'এখানে যে ছিলুম না তা তো জানেন।'

মিনির মনে হ'লো কথাটা তাদের ক্ষীণায়ু (কিন্তু ভাগ্যিস ক্ষীণায়ু)

পত্রব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করছে। মুখে রং এলো তার, সেটা লুকোবার জন্যে মাথা নিচু করলে। নিরঞ্জনই আবার কথা বললে, 'কলকাতায় এসেছি মোটে শুক্রবার।'

মোটে! মিনি তো শুনেছিলো সে এসেছে অনেকদিন। ভুল শুনেছিলো? না কি মিথ্যে বলছে? পুরুষমানুষের নির্লজ্জতারই তো সীমা নেই।

'শুক্রবারে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আরো আগেই আসতুম, কিন্তু কোম্পানির কতগুলো কাজে—'

নিরঞ্জন কথাটা শেষ করলে না, মিনিও কিছু বললে না। ভারি সাহস তো নিরঞ্জনের, আগে আসেনি ব'লে আবার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে! ওর আসবার জন্যে বড়োই যেন ব্যস্ত আমরা! না-এলেই বাঁচতুম, এ-কথাটা ভদ্র ভাষায় শুনিয়ে দেয়া যায় না কি?

'দু' বছর পরে কলকাতায় এসে কী ভালোই লাগছে, নিতান্ত অযাচিতভাবে নিরঞ্জন বললে। তারপর ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি ক'রে, যেন তারই বাড়ি এবং মহিলাটিই অতিথি, এইভাবে বললে, 'আপনি বসুন না!'

মিনির হঠাৎ খেয়াল হ'লো, নিরঞ্জনকে সে বসতেও বলেনি। বুকের উপর দিয়ে অকারণে আর-একবার কাপড়টা টেনে দিয়ে বললে, 'আপনি বসুন।'

'আপনি না-বসলে আমি কেমন ক'রে বসি?'

'কেন?'

'বাঃ, একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি বসবো!'

'ভদ্রমহিলার সামনে সিগারেট খেতে বুঝি বাধা নেই?' মিনি বেশ কঠোরভাবেই বলতে চেষ্টা করলে কথাটা।

'তা তো আগেও খেতুম—ভুলে গেছেন ?'

'আপনার স্মরণশক্তি যতটা প্রখর, আমার ততটা নয়।'

'আপনার যদি অসুবিধে হয় না-হয় আর খাবো না।' নিরঞ্জন ফেলে দিলে সিগারেট, অবশ্যি এমনিও সেটি ফুরিয়ে এসেছিলো।

'না:, আমার অসুবিধে হয় ব'লে আপনি খাবেন না কেন ?'

'খাবো না তো বলিনি—আপনার সামনে খাবো না।'

'আপনি একেবারেই সিগারেট ছেড়ে দেবেন, এমন অসম্ভব কথা আমি তো ভাবিনি।' মিনির চোখের সামনে রং-মাখা একটি মুখ ফুটে উঠলো, চিত্রিত ঠোঁট চেপে ধরেছে সিগারেট, নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিচ্ছে। মিনি শুনেছে পঞ্জাবি মেয়েরা এমন সুন্দরী যে অনভ্যস্ত বাঙালি পুরুষের চোখ আর ফেরে না। আরো শুনেছে যে তাদের মধ্যে একটু যারা লেখাপড়া শিখেছে, বাঙালি যুবকদের উপরেই তাদের প্রচণ্ড ঝোঁক। নিরঞ্জন হয়তো মনে-মনে তাকে ঐ পঞ্জাবি মেয়েটার মতোই একজন ভাবছে এ-কথা ভাবতে সে সর্বান্তঃ-করণে শিউরে উঠলো।

একটু দ্বিধা ক'রে সে বললে, 'আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। বাবা আজই এসেছেন নাগপুর থেকে।'

'ও, আপনার বাবা এসেছেন। খুব আনন্দে আছেন তাহ'লে।'

'আনন্দে আপনিই বা কম আছেন কী!' মিনি না-ব'লে পারলে না।

'কেন বলুন তো ?'

মিনি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, 'চাকরি পেয়েছেন ভালো, তাছাড়া লাহোর তো বেশ ভালো জায়গাই শুনি।'

নিরঞ্জন একটু হেসে বললে, 'বলেন কী! আমি তো লাহোর ছাড়তে পেরে বেঁচেছি।'

'তার মানে—লাহোরে আর ফিরে যাচ্ছেন না ?'

'তাই ব'লে কি আর কলকাতায় থাকতে পারছি! ঘাড়ে ধ'রে পাঠাচ্ছে বর্মা।'

'বেশ তো—ভালোই তো!'

'বেশ তো মানে? আপনার কথা শুনে মনে হয় আমি কলকাতায় না-থাকলেই আপনি বাঁচেন।

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিনি হেসে ফেললো।—'তা নয়। বলছিলুম, নতুন-নতুন দেশ তো বেশ দেখা হ'য়ে যাচ্ছে আপনার।'

'তা হচ্ছে।—কিন্তু আপনি বসুন, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!'

'আমার অনেক কাজ রয়েছে যে।'

'একটু না-হয় বসলেন। তাতে খুব কি আপনার কাজের ক্ষতি হবে?'

মিনি একটা চেয়ারে আলগোছে এমনভাবে বসলো যেন এক্ষুনি আবার উঠবে। তার দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য ক'রে নিরঞ্জন বসলো বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রেই। সোজা মিনির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শেষটায় আপনিও কাজের লোক হ'য়ে উঠলেন!'

'তার মানে?' তীব্র স্বরে জবাব দিলে মিনি. 'আপনার কি ধারণা আমরা কোনো কাজের নই?

নিরঞ্জন একটু হেসে বললে, 'অন্য লোকের কথা জানিনে, কিন্তু আপনি যে একজন মস্ত কাজের লোক তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দু' মিনিট ব'সে গল্প করবার সময় নেই!'

নিরঞ্জনের কথাবার্তার এই চপল স্বর মিনির নব-জাগ্রত বিবেক খুবই অপছন্দ করলে, এবং ন্যায়ত এ-কথাই তার বলা উচিত ছিলো, 'সময় যে নেই তা যদি দেখতেই পাচ্ছেন তাহ'লে ব'সে আছেন কেন?' কিন্তু শেষের কথাটা শুনে সে হঠাৎ একটু হেসে ফেললো, এবং হেসে

ফেলে' এত লজ্জিত হ'লো যে অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো।

কিন্তু নিরঞ্জন কিছুই যেন লক্ষ্য করলে না। নিজের কথার জের টেনে বললে, 'এবার কলকাতায় এসে দেখছি, সবই বদ্‌লে গেছে। বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিলো, সকলেই ব্যস্ত। "কাজ আছে", এ ছাড়া কারো মুখে কথাই নেই। আড্ডার অভাবে হাঁপিয়ে উঠছি। একা-একা সিনেমা দেখে কত আর সময় কাটে বলুন!'

'ও, আড্ডার সন্ধানেই বুঝি এ-বাড়িতে আপনার পদার্পণ?'

'মৎলবটা সেইরকমই ছিলো; কিন্তু আমি আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই অরুণ গেলো বেরিয়ে, আর আপনার—'

'থামলেন যে?'

'আপনার ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিনে, সত্যি বলতে,' ব'লে নিরঞ্জন একটু হাসলো।

গভীর একটি লাল রং মিনির গাল থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। হাতের নখের সঙ্গে নখ ঘষতে-ঘষতে সে অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই নিরঞ্জন আবার বললে, 'অবশ্য উৎসাহের অপেক্ষাও আমি বিশেষ রাখিনে, তা এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। আমি একটু বেহায়া ধরনের মানুষ।...আচ্ছা, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম, এখন উঠি, কী বলেন?'

নিতান্ত চক্ষুলজ্জার তাড়নায় মিনি বলতে বাধ্য হ'লো, 'আর-একটু বসবেন না?'

'না, চলি এবার!' নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। এখন আর-কী বলা উচিত সে-কথা ভাবতে-ভাবতে মিনিও উঠলো। এমন সময় বুলির গলায় তীক্ষ্ণ ডাক শোনা গেলো, 'মিনি! মিনি!' আর পর মুহূর্তেই হাওয়ার একটা ঝাপটার মতো বুলি সে-ঘরে এসে ঢুকলো।

কিন্তু নিরঞ্জনকে দেখেই সে থমকে দাঁড়ালো।

—'কী, আমাকে চিনতে পারছো না?'

'আপনি নিরঞ্জনবাবু তো? কবে এলেন? কখন এলেন? যাচ্ছেন নাকি এখন?'

'তুমি তো দেখছি মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছ। দস্তুরমতো লেডি!'

'হ্যাঁ, সাবধানে কথা বলবেন আমার সঙ্গে। আচ্ছা, বলুন তো, চাঁদের গায়ে ও-দাগগুলো কিসের?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

'জানেন, পুরাকালে মানুষ যখন নিষ্পাপ ছিলো তখন চাঁদও ছিলো নির্মল। তারপর মানুষ তো ঘোর পাপী হয়ে উঠলো, আর সেই পাপে চাঁদ হ'লো কলঙ্কিত। আমার মাষ্টার মশাই এইমাত্র আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।'

মিনি কড়া স্বরে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঃ—খুব বিদ্যে হচ্ছে তোর দিন-দিন! বুড়ো মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা।'

'বাঃ, সত্যি তিনি বললেন যে! আমি জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা, মানুষের পাপ তো দিন-দিনই বাড়ছে, তাহ'লে চাঁদের তো এতদিনে একদম কালো হ'য়ে যাওয়া উচিত—তা হয় না কেন? তিনি বললেন, —ভগবান যুগে-যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে মানুষের পাপ হরণ করেন কিনা। ওঃ, ভাগ্যিস! নয়তো চাঁদ ক—বে পোড়া কাঠের মতো কালো হ'য়ে যেতো, জ্যোছনা আমরা আর দেখতে পেতুম না।'

বুলি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

মিনি বললে, 'তুই অসহ্য ফাজিল হ'য়ে উঠছিস, বুলি।'

'তোর কাছে তো আমি কথা বললেই ফাজলেমি লাগে। আচ্ছা, নিরঞ্জনবাবু, আপনি জানেন এ যুগের অবতার কে?'

'খুব কঠিন প্রশ্ন। অনেক ভেবে জবাব দিতে হবে।'

'এখন যাচ্ছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'বাঃ, আমি এলাম, আর অমনি চললেন। এতক্ষণ আমাকে ফেলে অনেক সব মজার-মজার গল্প করলেন তো আপনারা ? আবার কবে আসবেন ব'লে যান। দাদার ছেলে দেখবেন না ?'

'অরুণের ছেলে হয়েছে নাকি ? কবে হ'লো ?'

'তাও জানেন না ? তুই কোনো খবরই বলিসনি, মিনি, এতক্ষণ করছিলি কী ?'

'তুই বলবি ব'লেই সব বাকি রেখেছি।'

'হ্যাঁ, তা আর জানিনে ! দৈবাৎ এসে পড়লাম ব'লে, নয়তো আমি তো জানতুমও না যে নিরঞ্জনবাবু এসেছিলেন। মিনি, তোর কি উচিত ছিলো না আমাকে একটা খবর দেয়া ?'

'নে, আর ডেঁপোমি করিসনে।'

'উঃ কেন যে ছোটো হ'য়ে জন্মেছিলাম ! আর তাও তো তুই মোটে চার বছরের বড়ো। বিয়ের পরে তুই আমি সমান-সমান হ'য়ে যাবো, জানিস ?'

'নিরঞ্জনবাবু', অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামটা মিনির মুখে আনতে হ'লো, 'আপনি বোধ হয় বুলির অসভ্যতা দেখে স্তম্ভিত ? ও দিন-দিন জংলি হ'য়ে যাচ্ছে, কিসে যে শোধরাবে কিছু বুঝি না।'

'ওকে শোধরাবার ভার বুঝি আপনিই নিয়েছেন ?'

'কৃতকার্য যে হইনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'শুনলে তো বুলি, দিদি কী বলছেন। ভেবে-চিন্তে কথা বোলো এর পর থেকে।...এবার যাই।'

বুলি তাড়াতাড়ি বললে, 'আবার কবে আসবেন ব'লে গেলেন না ?'

'আসবো আর-একদিন।'

'না—আর-একদিন না। পরশু—পরশু আসবেন। পরশু আমার মাষ্টার মশাই আসবেন না—অনেক গল্প করা যাবে।'

নিরঞ্জন যাবার আগে মিনির মুখের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু মিনি কিছু বললে না, চোখ সরিয়ে নিলে।

'আর শুনুন', বুলি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'এ-যুগের অবতার কে সেটাও ভেবে রাখবেন।'

মিনি বললে, 'বুলি, একটা কথা শোন্।'

'কী কথা?'

'তুই এখন যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস—এ-সব পাগলামি এখন ছাড়।'

'যেমন?'

'সত্যি বলছি, তোকে আর এ-সব মানায় না। লোকে নিন্দে করবে।'

বুলি তার কড়ে আঙুলের নখ কামড়ে বললে, 'করবে নাকি?'

'তুই কি কিছুই বুঝিস না, বুলি?'

'তুমিই কি সব বোঝো?'

'আচ্ছা, তুই-ই বল্, ঐ ভদ্রলোকের সামনে ও-রকম চপলতা করাটা কি তোর ভালো হয়েছে? ভদ্রলোক কী ভাবলেন বল্ তো?'

'কে, নিরঞ্জনবাবু? আমাকে একটা জংলি ভেবে গেলেন—না?'

মিনি উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'সকলেই তোকে তা-ই ভা'বে, বুলি। সভ্য হ'য়ে চলতে না-শিখলে তোর উপায় হবে কী?'

বুলি চিন্তিতমুখে ঘন-ঘন নখ কামড়াতে লাগলো। একটু পরে বললে, 'আচ্ছা মিনি, ঠিক করে বল্ তো কোন্ কথাটা আমার জংলির মতো হয়েছে? সেই বিয়ের কথাটা, না?'

'তাহ'লে তো বুঝিসই।'

'তা ত্থাখ, কথাটা কিন্তু ঠিকই। বিয়ে হ'য়ে গেলে তুই কি এ-রকম আমাকে কথায়-কথায় শাসন করবি!'

'ঠিক হ'লেও এ-সব কথা বলতে নেই। আর তাছাড়া ঐ ভদ্র-লোককে তুই পরশু আবার আসতেই বা বললি কেন?'

'কাকে—নিরঞ্জনবাবুকে? কেন বলবো না?'

'ভালো শোনায় না।'

'কেন, ভালো শোনায় না কেন? আগে তো উনি প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়িতে, তুমিই তো ওঁকে কত আসতে বলেছো। বলোনি?'

মিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কী যেন, ভুলে গেছি।'

'হ্যাঁ—তুমি বলতে, আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর বলাই তো উচিত—নিরঞ্জনবাবু বেশ লোক।'

'তোর কাছে এখন জগতের সব লোকই বেশ।'

'তুই ছাড়া,' মিনির চুলে ছোট্ট একটা টান দিয়ে দৌড়ে পালালো বুলি।

দোতলার বারান্দায় অরুণ যে-আলো জ্বেলেছিলো তা আর নেবানো হয়নি। অরিন্দম জোর ক'রেই আবার মন বসালেন ডিটেকটিভ নভেলে, তবু কিছুক্ষণ পর-পরই তাঁর চোখ যেতে লাগলো ঘড়ির দিকে। ন'টা বাজলো, হৈমন্তীর অনুপস্থিতি ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠছে। কখন গেছে—এতক্ষণ যে কী করছে, আর ভালোই বা লাগে কী ক'রে এতক্ষণ? হৈমন্তী যদি এই গোয়েন্দা-গল্পের স্বামীঘাতক সুন্দরীর মতো হ'তো, তাহ'লে না-হয় মনে করা যেতো যে সে ইচ্ছে ক'রেই দেরি করছে, কেননা স্বামীর সঙ্গ তার পক্ষে বিষতুল্য। না, স্ত্রীর এই খেয়ালকে এত বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ভালো করেননি তিনি। এদিকে

খিদেও পেয়ে যাচ্ছে। একে তো অরুণের সঙ্গে এই কাণ্ড হ'লো, তার উপর খেতে যদি দেরি হয় তাহ'লে মেজাজ ঠিক রাখা তাঁর পক্ষে শক্ত হবে। গল্পটাই শেষ করা যাক্, যতক্ষণ হৈমন্তী না ফেরে।

'বাবা।'

বই থেকে চোখ তুলে অরিন্দম বললেন, 'কী রে, তোরা যে কেউ বাড়িতে আছিস তা তো মনেই হয় না।'

মিনি বললে, 'তুমি কি এখন খাবে ?'

'তোর মা এখনো ফিরছেন না কেন রে ?'

মিনি একটু ঢোঁক গিলে বললে, 'তাই তো, বড্ড দেরি হচ্ছে।'

'একবার ফোন কর্ না।'

'ওখানে ফোন নেই।'

'গাড়ির কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হ'লো না তো ?'

এবার অনেকটা হালকা স্বরে মিনি বললে, 'না, বাবা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। এমনিই দেরি হচ্ছে। তুমি খেয়ে নাও না। বুলি আর বৌদিও বসবে'খন।'

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোদের খিদে পেলে তোরা খা আমি পরে খাবো।'

'তোমার খিদে পায়নি, বাবা ?'

'আচ্ছা, মিনি, তোর মা আজকাল যা খুশি তাই করেন, না ?'

'যা খুশি মানে ?'

'এই ধর—যখন খুশি বেরিয়ে যান, যখন খুশি ফেরেন, তোদে সুবিধে-অসুবিধের কথা একবারও ভাবেন না ?'

'আমাদের তো কোনো অসুবিধে হয় না, বাবা।'

'তোদের না হ'তে পারে, আমার হয়। এই খিদের সময় কতক্ষ ব'সে থাকবো, বল্ তো ?'

'আমি তো বলছি, বাবা, তুমি খেয়ে নাও।'

'আমি এখানে থাকলে এ-সব বাড়াবাড়ি ওঁর চলতো না, তা ঠিক জানবি। ছাখ না—ঐ মায়া-মন্দিরে যাওয়াই ওঁর বন্ধ ক'রে দেবো।'

ঠিক এই কারণেই মিনি বাবাকে খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছিলো। খেয়ে নিলেই তাঁর মেজাজ ঠিক থাকতো, কোনো অশান্তি হ'তো না। মিনির ভয় হ'তে লাগলো মা বাড়ি ফিরেই একেবারে তোপের মুখে না পড়েন।